# ক্ষত

কল্লোল সেনগুপ্ত

কসমো স্ক্রিপ্ট প্রাইভেট লিমিটেড
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬২

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

প্রকাশক : কসমো স্ক্রিপ্ট প্রাইভেট লিমিটেড
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯

মুদ্রক : লিপিমালা প্রেস ২জি, নিলমনি মিত্র রো, কলিকাতা—২

ভাবি
হিচহাইকার
বরফের কফিন
উদয়পুরে মধ্যরাতে
কুঙ্কুমে গরল একফোঁটা
কায়রোর অভিশপ্ত ফুলদানী
দহনে বিষ দহনে বড় জ্বালা
রম্ভা খুন হলো

কলকাতা। জানুয়ারীর এক রবিবার। সকাল নটা পঞ্চাশ।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গাইনি-ডিপার্টমেন্ট। সাদা ড্রেস পরা স্থূলদেহী মাঝবয়সী নার্স ভদ্রমহিলা গটগট করে ভেতর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন। হাঁক দিলেন সজোরে—'গায়ত্রী সিংহের বাড়ি থেকে কে এসেছেন ?'

সামনের বেঞ্চে গুটিশুটি বসেছিল লীলা। সঙ্গে সঙ্গে উঠে এগিয়ে এল।

'তুমি !' নার্স ভদ্রমহিলা তাকালেন অবাক চোখে।

লীলার বয়স ষোল। ছোটখাটো পাতলা গড়ন। পরনে অতি সাধারণ শাড়ী। স্বাস্থ্য তেমন উজ্জ্বল নয়। তবে মুখশ্রীতে একটা স্নিগ্ধ আকর্ষণ আছে।

ডাগর কালো চোখে করুণ দৃষ্টি হেনে বলল, 'হ্যাঁ আমি।'

'গায়ত্রী সিংহ কে হন তোমার ?'

'মা।'

'তুমি নিয়ে যাবে মাকে ?'

'হ্যাঁ।'

'আর কেউ সঙ্গে আসে নি ?'

'না, তবে—' লীলা পিছন ফিরে তাকাল। বাইরের সিঁড়ির দিকে ব্যগ্র দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, 'কাকাবাবুর আসার কথা আছে।'

'কেন তোমার দাদা ? যে আসে রোজ ?'

'দাদার আজ একটা জরুরী কাজ আছে।'

তাই নাকি! অসুস্থ মাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাবে, তার চেয়ে জরুরী কাজ ?' বিদ্রূপের সুরে কথাটা বলে ভেতরে পা বাড়ালেন ভদ্রমহিলা। যেতে যেতে গম্ভীর সুরে বললেন, 'এস !'

লীলা একটু থতমত খেয়ে আড়ষ্ট পায়ে অনুসরণ করল তাঁকে।

পার্ক স্ট্রীট। সোয়াব ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর অফিস।

দোতলার বিশাল করিডরে জনা-পঞ্চাশেক যুবকের সমাবেশ। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে সব দাঁড়িয়ে। এদের মধ্যে মনীশ কোণের মোটা থামে পিঠ এলিয়ে গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন।

মনীশের বয়স চব্বিশ। পরনে পাটভাঙ্গা সাধারণ প্যান্ট শার্ট, সোয়েটার। মাঝারী লম্বা সপ্রতিভ চেহারা। শ্যামলা গায়ের রঙ। চোখ দুটো বেশ তীক্ষ্ণ। তবে এই মুহূর্তে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দৃষ্টিতে একটা ঝাপসা আনমনা ভাব এনে দিয়েছে।

প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে আরেকটি যুবক ঢুকল ভেতরে। মনীশের সমবয়সী। তবে ওর চেয়ে উচ্চতা কম। কিঞ্চিৎ ফরসা। স্বাস্থ্য মাঝারী। সে তাকাল এদিক ওদিক। তারপর হঠাৎ মনীশকে দেখে এগিয়ে এল।

'মনীশ—'

মনীশ চিন্তার রেশ ছিন্ন করে তাকাল ওর দিকে। ওর স্কুলের বন্ধু প্রবীর।

মৃদু হাসল মনীশ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুইও এসেছিস?'

'আসতে তো হবেই।' প্রবীর ম্লান হেসে সামনে এল। 'তোর সঙ্গে পরপর তিনটে ইন্টারভিউতে দেখা হল।'

'দেখা যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা এখনও করতে পারলি না?' মনীশের আন্তরিক অনুযোগের স্বর।

'তুইও পারছিস কোথায়?' প্রবীরের পাল্টা অনুযোগ, 'তুই আমার চেয়ে কত ব্রিলিয়ান্ট। এত ভালভাবে পাশ করলি—'

ম্লান হাসল মনীশ।

'আমাদের যে কী হবে?' প্রবীর চারপাশে তাকিয়ে হতাশ স্বরে বলল, 'সরকারী চাকরী সিল্ড্। যা-ও আছে তাতে রিজার্ভেশন। আর এদিকে লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার, টাফ কম্পিটিশন!'

সে মুহূর্তে সামনের একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল। একজন চাপরাসী কপাট দুটো ভালো করে খুলে বারান্দার দু-দিকে উঁকি মেরে আবার ঢুকে পড়ল ভেতরে।

কিছু যুবক এগিয়ে এল চারপাশ থেকে। সবার দৃষ্টি উন্মুক্ত দরজার দিকে। দরজার মুখে একপাশে টেবিলে একটা ফোন রাখা। তারপর সারি সারি চেয়ার টেবিল।

মনীশ ফোনের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তির স্বরে বলে উঠল, 'একটা যদি ফোন করতে পারতাম!'

'কাকে?' প্রবীর জিজ্ঞেস করল।

'হাসপাতালে, মেডিকেল কলেজে।' মনীশ চিন্তিত স্বরে বলল, 'মা'র আজ রিলিজ। আর আজ ঠিক এই সময়ে ইন্টারভিউটা পড়ল।'

'কি হয়েছে মাসীমার?'

মনীশ উত্তরটা দিতে গিয়ে এক মুহূর্ত থামল। সামলে নিল নিজেকে। বার বার ভাবতে ভাবতে কতবার যে কান্নাটা গুমরে উঠছে বুকে। বিমর্ষ স্বরে বলল, 'সারভাইকাল ক্যানসার।'

'কবে থেকে?' প্রবীর বিস্মিত। উদগ্রীব স্বরে বলল, 'আমি তো ছ'মাস আগেও গিয়েছি তোর বাড়ি।'

'গত সপ্তাহে ডিটেক্ট হয়েছে।' মনীশের চাপা রুদ্ধ স্বর, 'এই মেডিকেল কলেজেই। প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্ট করে আজ ওরা ছেড়ে দেবে।'

'তাহলে?' প্রবীর তাকাল। 'কখন যাবি?'

'লীনা গেছে।' মনীশ উত্তর দিল, 'কাকাবাবুও যাবেন পরে। তাহলেও ফোন করে জানতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম।'

'হায় মনীশ!' তীক্ষ্ন বিকৃত গলাটার সাথে সাথেই একটা জোর হাত পড়ল মনীশের পিঠে।

মনীশ চমকে তাকাল ঘুরে। পাশে অরবিন্দ সেন দাঁড়িয়ে। ওর কলেজের সহপাঠী।

'তুই!' মনীশ সত্যি অবাক—'এখানে'?

অরবিন্দের মাথায় বিটল্‌স্‌দের মত ঝাঁকড়া চুল। চোখে ফোটোক্রোমেটিক চশমা। একটা কাটা দাগ ডান চোখের নীচে অস্পষ্ট হলেও ওর লালচে ফরসা দেহের জন্য নজরে পড়ে।

একজিকিউটিভ স্যুট পরা দীর্ঘদেহী অরবিন্দ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'মাম্মি পাঠাল। শি র‍্যাদার ফোর্স'ড মি টু অ্যাপিয়র ইন দিস ইন্টারভিউ।—যাক কখন শুরু আর কখন শেষ হবে রে?'

'শুরু দশটায় হবার কথা।' মনীশ বলল, 'একঘন্টা অবজেক্টিভ টেস্ট। তারপর ভাইভা। কার কখন টার্ন দেখ্—!'

'অভজেকটিভ টেস্ট! মানে রিট্‌ন্?' অরবিন্দ মুখে বিরক্তি নিয়ে বলল, 'অল রাবিশ!—এক মিনিট! রঞ্জনাকে বলে আসি, দুপুরের আগে ছাড়া পাব না।'

বলেই অরবিন্দ দ্রুত পায়ে বাইরের দরজার দিকে পা বাড়াল।

প্রবীর হতচকিত দৃষ্টিতে এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল সব। অরবিন্দ চলে যেতে বলল, 'কে রে? তোর কলেজের বন্ধু?'

'বন্ধু ঠিক নয়।' মনীশ অস্ফুট স্বরে বলল, 'সহপাঠী।'

'রঞ্জনা কে?'

'ওর নতুন প্রেমিকা নিশ্চয়ই।' মনীশ নিরাসক্ত স্বরে বলল, 'আর কে হবে?'

অফিস ঘরের খোলা দরজা দিয়ে মধ্যবয়সী স্যুটবুট পরা একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তার হাতে দু-তিন প্রস্থ কাগজ।

'শুনুন। সাইলেন্স প্লিজ!' ভদ্রলোকের গম্ভীর ঘোষণায় বারান্দার চাপা গুঞ্জন বন্ধ হল। সবাই এগিয়ে এল তার দিকে।

'প্লিজ মেক এ কিউ!' ভদ্রলোক দুপাশে তাকিয়ে ঘোষণার স্বরেই বললেন, 'আমাদের চিঠি হাতে নিয়ে একে একে এই ঘরে আসুন!'

ভদ্রলোক ঢুকে পড়লেন ঘরে।

যুবকেরা দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগোলো। নিমেষে তৈরী হয়ে গেল একটা কিউ। মনীশ ও প্রবীর দাঁড়িয়ে পড়ল কিউতে। তার একটু পরেই অরবিন্দ ছুটতে ছুটতে দরজা দিয়ে ঢুকল ভেতরে।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মনীশ ও লীলার কাকাবাবু তখন এসে গেছেন। ভদ্রলোকের বয়স সত্তরের ওপর। বৃদ্ধ, তবে ছিপছিপে শরীরে শক্ত সমর্থ চেহারা।

মাঝবয়সী নার্স ভদ্রমহিলা তাঁকে ওষুধের ব্যবস্থাপত্র বোঝাচ্ছেন।

টেবিলের একপাশে কাকাবাবু ও লীলা দাঁড়িয়ে। আরেক পাশে চেয়ারে বসে দুজন নার্স। একজন সেই মাঝবয়সী। আরেকজন বয়স্কা।

মাঝবয়সী নার্স ওষুধপত্র সব বুঝিয়ে ব্যবস্থাপত্রটা এগিয়ে দিলেন কাকাবাবুর

দিকে। নির্দেশের স্বরে বললেন, 'পনেরো দিন পর রিপোর্ট'। রুগীকে নিয়ে আসতে হবে। এখন নিয়ে যেতে পারবেন তো?'

কাকাবাবু ব্যবস্থাপত্রটা হাতে নিয়ে ঘাড় হেলিয়ে হ্যাঁ জানালেন।

মাঝবয়সী নার্স ভদ্রমহিলা আবার নিরীক্ষণ করলেন দুজনকে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। একজন বৃদ্ধ, আরেকজন কিশোরী। বিড়বিড় করে বললেন, 'আশ্চর্য! আজকের দিনে ছেলে আসতে পারল না। এতই জরুরী কাজ?'

'হ্যাঁ মা, ভীষণ জরুরী কাজ।' বৃদ্ধ কাকাবাবু ঘাড় হেলিয়ে বললেন, 'তা না হলে ওই ছেলে মাকে নিতে আসবে না তা কি হয়?'

পাশের বয়স্কা নার্স মহিলা সমর্থনের সুরে বলে উঠলেন, 'তাই তো বলি! ছেলেকে এতদিন দেখলাম মায়ের কি সেবা করতে। আজ কি হল ওর?'

'চাকরী!' বৃদ্ধ কাকাবাবু মুখ করুণ করে বললেন, 'বেচারী হন্যে হয়ে চাকরী খুঁজছে। আজকে সেই জন্যেই আসতে পারে নি।'

মাঝবয়সী নার্স মহিলা লীলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাও দেখো, মা বোধহয় তৈরী হয়ে গেছেন।'

লীলা ভেতরে ওয়ার্ড-এর দিকে পা বাড়াল। কাকাবাবু বেঞ্চে গিয়ে বসলেন।

তার একটু পরেই লীলা মা'কে জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। লীলার হাতে কাপড়ের একটা বড় পুঁটলী। গায়ত্রীর হাতে ছোটো।

কাকাবাবু হন্তদন্ত হয়ে বেঞ্চ থেকে উঠে এগিয়ে গেলেন।

পঞ্চাশোর্ধ গায়ত্রীর পাংশু মুখ। রক্তহীন শীর্ণকায় চেহারা। চোখে-মুখে আতঙ্ক নিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল কাকাবাবুর দিকে।

'দাদা!' অস্ফুট স্বরে কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। মেয়ের সামনে কোনোমতে সংযত করল নিজেকে। অন্য সময় হলে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলত। ওর কি অসুখ হয়েছে, তার কি পরিণতি সবই বোঝে গায়ত্রী। এই নিয়ে যদিও স্পষ্ট করে অসুখ সম্বন্ধে কোনো কথা কেউ বলেনি তাকে। কিন্তু গায়ত্রী শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী।

চলো দিদি!' গায়ত্রীর হাত থেকে পুঁটলিটা নিয়ে কাকাবাবু সমবেদনায় আবৃত অন্তরঙ্গ স্বরে বললেন, 'আর কি, এবার বাড়ি গিয়ে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে।'

একটা ঢোক গিলে বেদনার স্রোতটাকে বুকের ভেতর নিবৃত্ত করে গায়ত্রী এগিয়ে গেল দুজনের সঙ্গে। ওর ডান হাত তখন আঁকড়ে আছে লীলাকে।

বড় হল ঘরে বিভিন্ন টেবিলে বসে পরীক্ষার্থীরা অবজেকটিভ টেস্ট দিতে ব্যস্ত। অরবিন্দর টেবিল মনীশের ঠিক সামনে। মনীশ একাগ্র মনে তার খাতায় উত্তর লিখে যাচ্ছে। তারই মধ্যে অরবিন্দ মাঝে-মাঝে পেছন ফিরে একের পর এক প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করছে ওকে। তাতে ভীষণ অসুবিধে বোধ করলেও মনীশ যতটা সম্ভব উত্তর বলে দিচ্ছে অরবিন্দকে।

শেষ পর্যন্ত সাড়ে এগারোটায় অবজেকটিভ টেস্ট শেষ হল। ইনভিজিলেটর-এর

দল সবার টেবিল থেকে দ্রুত কাগজের শিটগুলো সংগ্রহ করে নিলেন। ধীরে ধীরে যুবকেরা সব আবার বেরিয়ে এল বারান্দায়।

প্রবীর মনীশের পিছু পিছু বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল, 'কি রে কলেজের সহপাঠী তো অবস্থা নাজেহাল করে দিয়েছে তোর ?'

প্রবীরের মন্তব্যে মৃদু হাসল মনীশ। কিছু বলল না।

'তুই উত্তর করেছিস ভালো ?' প্রবীরের প্রশ্নে উৎকণ্ঠা।

মনীশের কিছু বলার আগেই অরবিন্দ এল ওদের মাঝে। হাতে দামী বিদেশী সিগারেটের খোলা প্যাকেট। একটা সিগারেট বের করে মুখে পুরে প্যাকেটটা সে এগিয়ে দিল মনীশের দিকে।

মনীশ মাথা নাড়ল—'না রে আমি খাই না।'

অরবিন্দ প্যাকেটটা এবার প্রবীরের দিকে এগিয়ে ধরল—'আপনি ?'

'আমিও তথৈবচ।' প্রবীর মৃদু হাসল।

প্যাকেটটা বন্ধ করে পকেটে ঢুকিয়ে অরবিন্দ মনীশের দিকে তাকাল। লাইটার বের করে মুখের সিগারেট ধরিয়ে দীর্ঘ একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে বলল, 'অল ডিসগাস্টিং মেথড্‌স্। অবজেকটিভ, ভাইভা। টেস্টস আফটার টেস্টস। অ্যামেরিকা কানাডায় এম্পলয়মেন্ট-য়ে এরকম সিস্টেম নেই।'

'সেখানে এদেশের মত ভয়াবহ বেকারীও নেই।' প্রবীর বলল।

'পপুলেশন চেক না করতে পারলে এই বেকারী থাকতে বাধ্য।' অরবিন্দ প্রবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওফ্ রাস্তা ঘাটে, চারপাশে মাছির মত লোক থিকথিক করে। ইজ ইট আ সিভিলাইজড কান্ট্রি ? যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ বেধে কিছু লোক যদি সাফ হয়ে যেত—'

এর উত্তরে প্রবীর যেন কি বলতে যাচ্ছিল, মনীশের চোখের ইশারায় থেমে গেল।

ধোঁয়ার আরেকটা দীর্ঘ কুণ্ডলী বিস্তার করে অরবিন্দ এবার মনীশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝলি, আমি স্টেটস্-এ যাবার খুব চেষ্টা করছি। মাম্মির জন্য এই ইন্টারভিউটা দিতে হল। মাম্মি আমাকে ছাড়তে চাইছে না। বাট আয় হ্যাভ টু গো। বিদেশে আমি যাবই। আয় অ্যাম বর্ন ফর ফরেন ল্যান্ড এ্যান্ড নট ফর দিস ড্যাম কান্ট্রি।'

'একস্‌কিউজ মি অরবিন্দ!' মনীশ ওর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে নম্র স্বরে বলল, 'আমি একটু নীচ থেকে আসছি। একটা জরুরী ফোন করতে হবে।'

'ফোনের জন্য নীচে যাবি ? হোয়াই ?' অরবিন্দ সামনের খোলা দরজার ভেতরে টেবিলের ফোনটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওই তো ফোন। গো অ্যান্ড ডায়াল। কে দেখছে ? সব ওদিকে বিজি।'

'না থাক। দেখি কোনো দোকান যদি খোলা পাই।' মনীশ পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে।

'চল্ আমিও একটু ঘুরে আসি।' প্রবীর এগোলো।

দু'জন বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

প্রবীর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, 'তোর সহপাঠী দেখছি এ রিপালসিভ ক্যারেক্টর। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

'অরবিন্দ চিরকালই ওরকম। উন্নাসিক।' মনীশ মৃদু স্বরে বলল, 'আমি সেজন্যই তোকে ওর সাথে তর্ক করতে বারণ করলাম।'

'আর তুই ওকে হেল্প করলি!'

'কেউ হেল্প চাইলে আমি না করতে পারি না।'

প্রবীর আর কিছু বলল না। কারণ মনীশের এই স্বভাবের সঙ্গে সে ভালভাবেই পরিচিত। স্কুল জীবনে প্রবীর দেখেছে, সহপাঠীদের প্রতি মনীশের সহানুভূতি সহযোগিতার মনোভাব কতটা তীব্র। শুধু স্কুলে নয়, রাস্তায় কি অন্য জায়গায় অপরিচিতদের প্রতিও মনীশের দরদী মনের পরিচয় সে পেয়েছে।

প্রবীর তাই মন থেকে ভালবাসে মনীশকে। উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণ কলকাতায় ওদের নতুন বাড়িতে চলে যাওয়ার পরেও যোগাযোগটা রেখেছে এখনও। ভিন্ন কলেজে পড়েও ওদের বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন আছে তাই।

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। পেছনের সীটে বসে কাকাবাবু, গায়ত্রী ও লীলা। গায়ত্রীর কোলে লীলার বাঁ হাত। হাতটা আঁকড়ে ধরে আছে গায়ত্রী।

মা ও মেয়েতে কথা হচ্ছে অবিরাম।

লীলা বলল, 'না মা কোনো কষ্টই হয়নি আমাদের। শুধু তুমি ছিলে না তাই ভীষণ খারাপ লাগত।'

'কি রান্না করেছিস এই কদিন?' গায়ত্রীর প্রশ্ন।

'সব। দাদা যা বাজার করে এনেছে। ডাল ভাত, কোনোদিন আলু-কুমড়োর তরকারী কোনোদিন বেগুন, একদিন পটল, শাকও করেছি দুদিন।'

'তাই নাকি? মাছ খাসনি?'

'কাকাবাবু নিয়ে এসেছিলেন একদিন।'

গায়ত্রী ঘুরে কাকাবাবুর দিকে উষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। কাকাবাবু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। গায়ত্রী মেয়ের দিকে ঘুরল আবার।

'দাদা ঠিকমত খেয়েছে রোজ?'

'জোর করে খাইয়েছি মা। রাতে দাদা খেতেই চায় না। বলে আজ আমার জন্য ভাত রাঁধিস না, আমি কি ছাড়ি? —জান মা, এই পনেরোদিন দাদা সারা রাত জেগে পড়েছে। আজকের ইন্টারভিউটার জন্য।'

গায়ত্রী একটা ঝোড়ো নিঃশ্বাস ছেড়ে তাকাল বাইরের দিকে। দুবছর হয়ে গেল মনীশ চাকরীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এখন পর্যন্ত একটাও যোগাড় করতে পারে নি। অথচ মনীশ পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, অনার্স গ্র্যাজুয়েট। যা দিনকাল এখন সামান্য ছোটোখাটো চাকরীও ওর কপালে জোটে না। মাস ছয়েক হল একটা প্রেসে পার্ট-টাইম কাজ করছে। কিন্তু একে ঠিক চাকরী বলা যায় না। মাইনে মাত্র দুশো টাকা। তাও যখন-তখন ছাঁটাই হয়ে যাবার ভয়। নিতান্ত সাময়িক নাকি কাজটা। আর আছে দু-একটা টিউশনি। সব নিয়ে মাসে চারশোর মত রোজগার। যতটুকু যা হয় সব মায়ের হাতে এসে সঁপে দেয়।

মনীশের এই জীবন-যুদ্ধের শুরু সেই স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর থেকে। তার চার বছর আগে মনীশের বাবার মৃত্যু হয়। তখন থেকেই মনীশ বুঝতে পেরেছে যে ওকে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। ছোটো বোন ও মায়ের ভার নিতে হবে কাঁধে। সেই দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত অবিরাম অমানুষিকভাবে করে চলেছে মনীশ। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য, গায়ত্রীর দুর্ভাগ্য, লীলার দুর্ভাগ্য, এখনো সে দাঁড়াতে পারেনি।

'মা তোমার কি হয়েছে ?' লীলা হঠাৎ পাশ থেকে মাকে দুহাতে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি দিনকে দিন এত দুর্বল হয়ে যাচ্ছ কেন ?'

'দুর্বলতা একটা অসুখ মা।' কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে জানলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে লীলার দিকে ঝুঁকে বললেন, 'এই অসুখ অনেকের হয়। তোর মা'র হয়েছে। আবার সেরে যাবে।'

'তাহলে, দাদা সেদিন মাঝরাতে উঠে এত কাঁদছিল কেন ?'

'কাঁদছিল !' গায়ত্রী সাবধান হল। জড়িয়ে ধরল লীলাকে। হেসে বলল, 'দূর বোকা ! আমার জন্য কাঁদবে কেন ? চাকরী-বাকরী হচ্ছে না তোর দাদার, তাই মাঝে-মাঝে কাঁদে ।'

'না মা !' লীলা মুখ তুলে গায়ত্রীর চোখে চোখ রেখে উদ্বেগের স্বরে বলল, 'গত শুক্রবার মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙতে দেখি, দাদা বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ভীষণ কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে শুধু তোমার কথা বলছে।'

গায়ত্রীর সারা শরীর মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে উঠল। গত শুক্রবার বায়োপ্সি রিপোর্টে ধরা পড়েছে যে ওর জরায়ুতে ক্যানসার। গায়ত্রী তখন হাসপাতালের খাটে চোখ বুজে শুয়েছিল। ও ঘুমোচ্ছে ভেবে ডাক্তার-নার্স রিপোর্ট নিয়ে কথা বলছিল তখন।

কাকাবাবু অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন। কি বলবেন বুঝতে পারছেন না।

গায়ত্রী লীলার চিবুকে হাত রেখে আদরের গাঢ় চাপ দিয়ে বলল, 'গত শুক্রবার হাসপাতালে আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবুরাও সেদিন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, তোর দাদা ঘাবড়াবে না ? তার দুদিনের মধ্যে আবার আমি ভাল হয়ে গেছি। এখন একেবারে বিপদ মুক্ত। তাই তো ছেড়ে দিল আমায়।'

কাকাবাবু আশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালেন লীলার দিকে। তারপর আরো ঝুঁকে বললেন,—'ছাড়বেই তো ? বাকীটুকু বাড়িতে চিকিৎসা হলেই ঠিক হয়ে যাবে। লীলা মাকে বলেছিস এর মধ্যে কটা গান শেখা হল তোর ?'

'কটা ?' গায়ত্রী মেয়েকে বুকে টেনে হাসি হাসি চোখে তাকালো।

'দুটো।' লীলা মায়ের বুকে মুখ গুঁজে বলল, 'জান মা, কাকাবাবু রোজ সন্ধে-বেলায় গান শেখাতে আসতেন।'

গায়ত্রী আবার কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে তাকাল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু এককালে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাল গাইয়ে ছিলেন। লীলা প্রতি রবিবার তার কাছে গিয়ে গান শেখে। কিন্তু এই ক'দিন বাড়িতে এসে তাঁর রোজ গান শেখানোর উদ্দেশ্য একটাই—গায়ত্রীর

অনুপস্থিতিতে লীলাকে সঙ্গ দেওয়া। কারণ ওই সময় মনীশও টিউশানির জন্য বাড়িতে থাকে না। সেটা ভালভাবেই বুঝতে পারে গায়ত্রী।

কাকাবাবু ওদের আত্মীয় নন। তবে সম্পর্কে আত্মীয়ের চেয়ে অনেক বেশী। মনীশের বাবাও খুব ভাল গান গাইতেন। সেই সূত্রে পরিচয়। তারপর স্নেহ ভালবাসায় সেই যে বাঁধা পড়ে গেছেন, এখন তিনিই ওদের অভিভাবক। একমাত্র কাছের জন। আর যারা প্রকৃত আত্মীয় ও এককালের বন্ধু ছিল তারা সবাই এখন দূরের। ভয়াবহ অভাবের বিপর্যয় যত গ্রাস করতে লাগল এই পরিবারকে ততই এরা তাদের স্মৃতি থেকে মুছে গেল ধীরে ধীরে।

ট্যাক্সি শেষ পর্যন্ত বেলেঘাটা মেন রোডের শেষ প্রান্তে এসে বাঁ দিকে বাঁক নিল। বাড়ির একেবারে কাছাকাছি এসে গেছে ওরা।

দুপুরে তিনটে নাগাদ মনীশ বাস থেকে নামল। কলকাতার স্টেট বাস কখনো পর পর দুটো আসে মাত্র কয়েক সেকেন্ড-এর ফারাকে। তারপর হয়ত একঘন্টা, আর তার পাত্তা নেই। আজ পার্ক স্ট্রীটে তাই হয়েছিল। চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়েও এই রুটের একমাত্র বাসটি পায়নি মনীশ। অথচ ইন্টারভিউ শেষে মনীশের তখন বাড়ি ফেরার কী ভীষণ তাড়া। মা হাসপাতাল থেকে ঠিক মত বাড়ি এল কিনা চিন্তাটা সকাল থেকে মাথায় দপদপ করছে। তখন হাসপাতালে ফোন করে কিছুই জানতে পারেনি মনীশ। একটা রং নাম্বারের পর অনেক চেষ্টায় লাইনটা যখন পাওয়া গেল গম্ভীর টেলিফোন অপারেটর বললেন—গাইনি ডিপার্টমেন্ট-এ নো রিপ্লাই, পরে ফোন করবেন। পরে ভাইভা টেস্ট ছিল আর ফোন করা হয়নি।

বাস স্টপ থেকে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাড়িতে এল মনীশ। দরজায় কড়া নাড়ল।

কপাট খুলে সামনে মা দাঁড়িয়ে।

'মা তুমি!' মনীশ মায়ের কোমর জাপটে সঙ্গে সঙ্গে তাকে খাট অব্দি টেনে উদগ্রীব কণ্ঠে বলল, 'তুমি উঠলে কেন? লীলা কোথায়?'

'লীলা ঘুমোচ্ছে। এই একটু আগে ঢুলতে ঢুলতে শুয়ে পড়ল।' গায়ত্রী ছেলের আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় খাটে বসে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন হল রে তোর ইন্টারভিউ?'

'আগে তুমি বল। হাসপাতাল ছেড়ে বাড়িতে এসে কেমন বোধ করছ এখন?'

'বাড়িতে এসে আমি অর্ধেক সুস্থ হয়ে গেছি বাবা।' গায়ত্রী ছেলের কাঁধে হাত দুটো রেখে ম্লান হেসে বলল, 'কি যে ভাল লাগছে এখন। তোদের মাঝে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম।—বল্ কেমন হল তোর ইন্টারভিউ?'

'ভাল।' মনীশ মায়ের পাশে বসে মাকে আরো গাঢ় হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'খুব ভালয়।'

'তোর কোন্ ইন্টারভিউ খারাপ হয়?' গায়ত্রী ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে ব্যথাতুর স্বরে বলল, 'কিন্তু শেষ ভাল আর হচ্ছে কোথায়?'

'না মা, আজকেরটা অনেক ভাল হয়েছে।' মনীশের স্বরে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস।

'তাই?' গায়ত্রীর মুখ খুশীতে ভরে উঠল। 'কি কোম্পানী রে? চাকরী কি?'

'কোম্পানীর নাম সোয়াৎ ইন্ডিয়া। এদের হলদিয়া আর হিমাচল প্রদেশে কারখানা আছে। এই চাকরীটা হিমাচল প্রদেশের। অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার।'

গায়ত্রী হাত দুটো জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'ঠাকুর যেন এবার তোর দিকে চোখ মেলে তাকান। এত জনের চাকরী হয়, ঠাকুর তোকে একটা জুটিয়ে দিচ্ছে না!'

'না মা কোথায় এত জনের চাকরী হচ্ছে।' মনীশ মৃদু প্রতিবাদ করল, 'ঘরে ঘরে খোঁজ নিয়ে দেখ কত বেকার।'

'তুই যে এ দু-বছর এতগুলো ইন্টারভিউ দিলি সেই চাকরীগুলো হচ্ছে না?' গায়ত্রী অভিযোগের সুরে বলল, 'তোকে বাদ দিয়ে কারো না কারো হচ্ছে তো?'

'তারা যোগ্য বলেই হচ্ছে।' মনীশ মাকে আলিঙ্গনমুক্ত করে খাট থেকে উঠে দাঁড়াল। ওর মুখে বিমর্ষতা, বিষাদের ছায়া। তবে মার দিকে ঘুরে ম্লান হেসে বলল, 'আমি বোধহয় যোগ্যতা দেখাতে পারছি না মা!'

'আমার বিশ্বাস হয় না।' গায়ত্রীর মুখে বেদনার অভিব্যক্তি। ক্ষোভ মিশ্রিত স্বরে বলল, 'সব ইন্টারভিউতেই তুই অযোগ্য হয়েছিস? তোর শিক্ষা তোর বুদ্ধি তোর অধ্যবসায় এত পরিশ্রম তার কোনো মূল্যই নেই?'

'হাত মুখ ধুয়ে আসি মা।' মনীশ মায়ের পিঠে হাতের মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'তুমি শুয়ে পড়।'

'আর আমায় শুতে বলিস না!' গায়ত্রী কিন্তু ক্লান্ত স্বরেই বলল কথাটা, 'হাসপাতালে পনেরো দিন শুয়ে শুয়ে আমার পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে। জামা-কাপড় ছেড়ে আয় তুই, তোর সঙ্গে গল্প করব। হাসপাতালে এই কদিন কত রকম লোকের সঙ্গে দেখা। কত মজার কথা আছে শুনবি না?'

হ্যাঁ আসছি মা—'

মনীশ পাশের ঘরের দরজা অব্দি চলে গিয়েছিল। গায়ত্রী হঠাৎ ডাকল, 'মনীশ শোন্—!'

'কি মা!' ফিরে এল মনীশ।

গায়ত্রী ওর দু-কাঁধে হাত রেখে চাপা স্বরে বলল, 'লীলাকে আমার অসুখ সম্বন্ধে কিছু বুঝতে দিবি না!'

'কি বুঝতে দেব না মা? কি হয়েছে তোমার?' মনীশের বুকের ভেতরটা আবার মুচড়ে উঠল। মায়ের দিকে ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

'না মানে– ' গায়ত্রী আর ধরা দিতে চাইল না। ছেলেকেও ধরতে চাইল না। সহজ সরল ভঙ্গিতে বলল, 'আমি এতদিন হাসপাতালে ছিলাম। লীলা ভীষণ ঘাবড়ে গেছে।

'কেন কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করছিল, কি হয়েছে আমার? দাদা এত মুষড়ে পড়েছে কেন? আমি জানি তোর মুষড়ে পড়ার কারণ কি শুধু আমি! চাকরী-বাকরী নেই তোর, সংসারের

এই অবস্থা। মাথার কি তোর ঠিক আছে। তবু লীলা ছোটো। জন্ম থেকেই দুঃখ দেখে আসছে। ওর সামনে তুই একটু সামলে-সুমলে থাকিস।'

শূন্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল মনীশ। মায়ের হাত দুটো ধ'রে কাঁধ থেকে নামিয়ে বলল, 'ঠিক আছে মা। তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্তে থাক।'

পাশের ঘরের দিকে আবার পা বাড়াল মনীশ। ধীর পায়ে ঢুকল ভিতরে।

লীলা এক কোণে ছোটো খাটের ওপর শুয়ে আছে। মনীশ নিঃশব্দে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। লীলা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আজ ভোর রাতে উঠে সব রান্না করে রেখেছিল সে। দাদা ইন্টারভিউতে যাবে আর মাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসতে হবে সেজন্য। সকালে খুব পরিশ্রম গেছে ওর ওপর। লীলার মুখের দিকে গাঢ় দৃষ্টিতে তাকাল মনীশ। ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে লীলাকে। অপূর্ব মাধুর্যে ভরা ছোট্টো মুখখানা কেমন যেন ভাঙ্গা-চোরা করুণ লাগছে এখন। লাগবে না ? বাড়ন্ত বয়স এখন লীলার। কিন্তু ভাল খাবার এক দানাও জোটে না ওর মুখে। দুধ মাছ-মাংস এ বাড়িতে কচিৎ কদাচিৎ আসে। তেমনি ওর পরিধানের হাল। তালি লাগানো একটা ফ্রক পড়ে আছে এখন। বাড়ি থেকে সারা বছরে নতুন ফ্রক পুজোতে একবারই পায় লীলা। আর বড় জোর একখানা কাকাবাবুই দেন। বাকী মাস কাটায় এর-ওর পুরোনো পোশাক সেলাই-টেলাই করে।

মনীশের চোখ চিকচিক করে উঠল। ছোটো বোনের দুঃখে। মনীশ নিজেও জ্ঞানাবস্থা থেকে দুঃখ দেখে আসছে এই বাড়িতে। কিন্তু ছোটো বোনের জীবনে যে কোনো আনন্দ নেই, আমোদ নেই, বৈচিত্র্য নেই সেই দুঃখ এখন ভীষণ ভাবে বেজে উঠছে বুকে।

মা বলেছে, লীলা নাকি দাদাকে মুষড়ে যেতে দেখে খুব চিন্তায় পড়েছে। মনীশ এখন থেকে সতর্ক হবে সাবধান হবে। লীলাকে কিছুতেই বুঝতে দেবে না, মা আর বেশী দিন নেই। এই দুঃখ মনীশের বুক যতই বিদীর্ণ করুক তার আঁচ সে ছোটো বোনের ওপর আসতে দেবে না। কিছুতেই না।

মনীশ ঘুমন্ত লীলার চুলে আলতো হাত বুলিয়ে জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে টেবিলের দিকে এগোলো।

জামার পকেট থেকে কাগজ-পত্র বের করে রাখল টেবিলের ওপর। ওপরেই ছিল আজকের ইন্টারভিউয়ের চিঠিটা। চিঠিটা হাতে তুলে নিল মনীশ। খুলে দেখল। দামী কাগজ দামী ছাপা। কোম্পানীর নামের নীচে তিনটে ঠিকানা। হেড অফিস কলকাতার। বাকী দুটো কারখানার। হলদিয়া আর তামিয়া। কোণে এক গাদা ফোন নাম্বার, টেলেক্স নাম্বার। বোঝাই যায় বেশ বড় কোম্পানী। হেড অফিসটাও তো আজ দেখল মনীশ। কি ঠাট-বাট! কত কেতা দুরস্ত! হবে কি এই অফিসে ওর চাকরী ? এবার শিকে ছিড়বে ওর ভাগ্যে ? মনীশের বুক শিরশির করে উঠল' আনন্দে না আশঙ্কায়, কে জানে। ইন্টারভিউটা আজ সত্যি খুব ভাল দিয়েছে মনীশ। অবজেকটিভ টেস্ট তো দারুণই হয়েছিল। ভাইভা'তেও মনে হয় ওর সব প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়েছে। ইন্টারভিউ বোর্ডের যে চীফ মাঝখানে বসেছিলেন তাঁর মাথা নাড়া দেখে সে বুঝতে পেরেছে। মনীশের দিকে সবশেষে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়েও ছিলেন তিনি।

ইন্টারভিউ লেটারটা আবার টেবিলের ওপর রেখে জামা ছাড়ল মনীশ। তারপর কলতলায় গেল হাত-মুখ ধুতে।

মনীশ পাশের ঘরে চলে যেতেই গায়ত্রী শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। ছেলেকে একটু আগে সে বলল, 'আর আমায় শুতে বলিস না।' কিন্তু সেটা ছিল মুখের কথা। নিজে যেন এখন কত সুস্থ তার নিছক প্রদর্শন মাত্র। আসলে ভেতরে ভেতরে গায়ত্রীর অবস্থা এখন সত্যি ভীষণ কাহিল। একটুতেই হাঁপিয়ে উঠছে। ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে শরীর। কিন্তু এখন যতটা সম্ভব ছেলেমেয়ের সামনে নিজেকে একটু সুস্থ দেখাতেই হবে। তা না হলে ওরা ভেঙে পড়বে খুব।

গায়ত্রীর চোখ আর্দ্র হয়ে উঠল। জমাট কান্নাটা ভেঙে পড়তে চাইছে বুক থেকে। প্রাণের সন্তানদের ছেড়ে ওকে চলে যেতে হবে অচিরে। তারপর? ওর অবর্তমানে কি হবে এই টুকু টুকু দুটো জীবনের? আর তো কেউ নেই ওদের। আপন জন বলতে মা বাদে শুধু আছেন ওই অনাত্মীয় কাকাবাবু। তিনিও এখন বৃদ্ধ। মনীশ যদি এর মধ্যে কোনো চাকরী পেত তাহলেও নিশ্চিন্ত থাকত মন।

ভাবতে ভাবতে ট্যাক্সিতে লীলার বলা কথাটা মনে পড়ে গেল। লীলা মাঝরাতে দাদাকে কাঁদতে দেখেছে। বাবার ছবির সামনে। গায়ত্রীর বুক হা হা করে উঠল।

সত্যি কি অভাগা এই ভাই-বোন দুটি। বাপকে হারাল ছোটোবেলায়। এখন এই বয়সে মাকেও হারাতে চলেছে। কি নিষ্ঠুর ঈশ্বর! কি নিষ্ঠুর এই প্রকৃতি! দুটি নিরীহ নিষ্পাপ জীবনের ওপর তোমরা এতটা নির্দয় হলে কেন? এত অভাব এত দুঃখ ঘিরে আছে ওদের। কে এখন বুকে আঁকড়ে সান্ত্বনা দেবে ওদের? শত বিপর্যয়ে একটু আশ্বাস একটু ভরসা পেতে কার কোলে এসে আছড়ে পড়বে ওরা? নিজেকে আর রুখতে পারল না গায়ত্রী। কান্নাটা ডুকরে বেরিয়ে এল বুক বেয়ে। উষ্ণ জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে চোখ থেকে। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল গায়ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে বালিশে মুখ গুঁজে কোনোমতে অস্ফুট শব্দটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করল।

গায়ত্রী উপুড় হয়ে বালিশে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে।

'মা—!'

লীলার গলা শুনে ভীষণ ভাবে চমকে উঠল গায়ত্রী। এক নিমেষে বালিশে চোখ মুছে ঘুরে তাকাল। হাসি মুখে বলল, 'কি রে! দাদা কোথায়?'

'দাদা এসেছে?' সদ্য ঘুম ভাঙ্গা চোখে কথাটা বলেই লীলা মায়ের মুখের দিকে গাঢ় দৃষ্টিতে তাকাল—'কি হয়েছে মা, তুমি কাঁদছ?'

'হুঁ্যা রে—' গায়ত্রী উঠে বসল। হাসতে হাসতে বলল, 'একটা বাজে স্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যে কাঁদছিলাম।'

'কি বাজে স্বপ্ন মা?'

'দুপুরের বাজে স্বপ্ন বলতে নেই। শোন্? বাড়িতে চিঁড়ে মুড়ি আছে? দাদা হাত-মুখ ধুতে গেছে। এলে কিছু খেতে দে।'

মনীশ ঢুকল ঘরে। গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'না এখন আমি কিছু খাব না।'

লীলা ঘুরে তাকাল; সেই ফাঁকে গায়ত্রী শাড়ীর আঁচলে দ্রুত মুখ ভাল করে মুছে মাথার এলোমেলো চুল ঠিক করে নিল।

লীলা জিজ্ঞেস করল, 'দাদা ইন্টারভিউ কেমন হল?'

ভাল—। মনীশ খুশী খুশী স্বরে বলল, 'খুব ভাল। শোন্ লীলা। আজ দুটো ভাল ঘটনা ঘটেছে। এক, আমার ইন্টারভিউ দুই, মা হাসপাতাল থেকে বাড়ি এসেছে। চল্ এই আনন্দে বাইরে ঘুরে আসি।'

'বাইরে কোথায় যাবি?' গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল।

'কেন? বেলেঘাটা লেক।' মনীশ বলল, 'তুমি আর লীলা রিকশায় চলো। আমি হেঁটে আসছি। ওখানে আমরা কিছুক্ষণ বসব।'

তোর টিউশনি?'

'সে তো ছ'টায়। আজ একটু দেরী করে যাব।'

'ঠিক আছে চল্।'

মা'র সম্মতি শুনে লীলা হাততালি দিয়ে উঠল। 'তাই চল, তাই চল! দাদা, তাহলে আমি তৈরী হয়ে নি? শাড়ী পরব কিন্তু?'

পর্!' মনীশ হেসে ঘাড় হেলিয়ে বলল।

'ঝাল মুড়ি খাওয়াবি তো?'

'হ্যাঁ খাওয়াব। আরেকটা জিনিস খাব। কী বল তো?'

'কী?'

'বলতে পারলি না? ফুচকা!'

'দারুণ! দারুণ!' লাফিয়ে নেচে উঠল লীলা। মার দিকে ঘুরে বলল, 'মা তুমি কোন শাড়ী পরবে। বলো আমি এনে দি!'

'দে একটা। আমার আবার কোন্ শাড়ী।' গায়ত্রী খাট থেকে নামতে নামতে বলল, 'আর শোন্ তুই সবুজ ঢাকাইটা পর।'

'অত ভাল শাড়ী!' লীলা পাশের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ঘুরে চোখ বিস্ফারিত করে তাকাল।

গায়ত্রী একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। কতদিন পর আমরা একসঙ্গে বেরোচ্ছি। কোথায় আর যাস্ তুই। আজকেই পর।'

'ঠিক আছে—!' লীলা ঢুকে পড়ল পাশের ঘরে।

মনীশ আগেই চলে গেছে।

গায়ত্রী একটু দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ল খাটে। দাঁড়াতে পারছে না। এত দুর্বল শরীর। এ মুহূর্তে ষোলো বছর আগের একটা দিনের কথা মনে পড়ছে। সেদিন ছিল গায়ত্রী ও মনীশের বাবা পরিতোষের দশম ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। সবুজ ঢাকাই শাড়ীটা সেই দিনই পরিতোষ অফিস থেকে ফিরে গায়ত্রীর হাতে দিয়ে পরতে বলেছিল। পরেছিল গায়ত্রী। তারপর আট বছরের মনীশ আর কোলে

এক বছরের লীলাকে নিয়ে ওরা গিয়েছিল পার্ক স্ট্রীটের একটা রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেতে। পরিতোষ ছিল সি ই এস সি'র অ্যাসিস্টেন্ট ইনজিনিয়ার। তখন ওদের সচ্ছল অবস্থা। রেস্তোরাঁয় সেদিন ওরা খেয়েছিল চিকেনের একটা ডিশ, তন্দুরী আর আইসক্রীম। এখনো মনে আছে গায়ত্রীর, এক বছরের মেয়ে লীলার মুখে এক ফোঁটা আইসক্রীম ঠেকিয়েছিল পরিতোষ। কচি জিব বুলিয়ে তাই খেয়েছিল লীলা। লীলার মুখে সেই প্রথম সেই শেষ ওই ধরনের অভিজাত খাবার। তার পরের দিন অফিস যাবার পথে জীপ অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছিল পরিতোষ।

আজ সামান্য ঝালমুড়ি আর ফুচকা খাওয়ার নাম শুনে যতটা আনন্দে লাফিয়ে উঠল লীলা ততটাই বেদনায় কাতর হয়ে উঠল গায়ত্রীর বুক লীলারই জন্যে।

সেদিন পুরো দেড় ঘন্টা ওরা কাটাল বেলেঘাটা লেকে। ভাই-বোন-মায়ে মিলে কত গল্প। গল্পের সাথে মাঝে-মাঝে চলেছে ঝালমুড়ি বাদাম। আর সবশেষে ভাই-বোনে মিলে ফুচকা। ওদের গল্পের বিষয় ছিল শুধু অতীত নিয়ে। ভবিষ্যৎ নিয়ে কারো কিছুই বলার নেই। কারণ গায়ত্রীর ভবিষ্যৎ বলতে নিঃসীম অন্ধকার। মনীশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আর লীলা ওর চারপাশে এমন কোনো পরিবেশ পায়নি যাতে ভবিষ্যৎ কল্পনা বা পরিকল্পনা করতে কোনো উৎসাহ পায়।

লীলা বাদাম খেতে খেতে একবার শুধু বলেছিল—দাদা, তুই এই চাকরীটা পেলে আমি কিন্তু কলেজে পড়ব।

মনীশ আগের মত আশা, ভরসা কিংবা উৎসাহের কোনো ইঙ্গিত দেয়নি। চুপ করে ছিল। কারণ মনীশ নিজেই বহুবার প্রত্যাশার জোয়ারে ভেসে হতাশার পাথরে আছাড় খেয়েছে। বছর খানেক আগে পর্যন্ত সে বলত চাকরী পেলে কি কি করবে। এখন আর বলে না। এসব কথা বললে ও দেখেছে হতাশার দুঃখটা আরো বেশামাল হয়ে ওঠে। নিজের দুঃখ তবু সামলানো যায়, কিন্তু লীলাকে আশা দিয়ে নিরাশ করা মাকে ভরসা দিয়ে হতাশ করার দুঃখ ওর কাছে দুর্বিষহ।

তবে লীলার দুঃখ ঘোচানোর ইচ্ছেটাকে এখনো মনীশ রূপকথার কাঁচের পাত্রে সুরক্ষিত জিয়ন কাঠির মত ওর মনের গোচরে জিইয়ে রেখেছে। লীলা এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। লীলা জানে ও পাশ করুক না করুক এটাই ওর মোটামুটি শেষ পরীক্ষা। বাবার সব সঞ্চয় মনীশের পড়াশোনাতে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন সংসার ধিক ধিক করে চলে মনীশের সামান্য রোজগার আর মায়ের সেলাই ও উলবোনার আয়ের সাহায্যে। তার থেকে কোনোমতে কিছু বাঁচিয়ে অনেক কষ্টে লীলাকে স্কুল ফাইনাল অব্দি নিয়ে আসা হয়েছে। এর পর, দিন চালানো যা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে আর ওকে পড়ানো কিছুতেই সম্ভব নয়। যদি না মনীশের কোনো চাকরী হয়।

লীলার ওইটুকুই সাধ ছিল। স্কুল ফাইনালের পর কলেজে পড়বে। কিন্তু দাদার চাকরী হচ্ছে না বলে ইদানিং সে এই নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করে না। মনীশ জানে লীলা আজ কথাটা হঠাৎ বলল আশার একটা আলো দেখতে পেয়ে। আলোটা মনীশই দেখিয়েছে। আজ ইন্টারভিউ ভাল হয়েছে জানিয়ে।

সন্ধ্যে ছ'টার একটু পর লেক থেকে উঠল ওরা।

সময়টা বেশ সুন্দর কাটল। বহুদিন পর বন্ধ শহরের চার দেয়ালের রুদ্ধ পরিবেশ ছেড়ে খোলা আকাশের নীচে। সব দুঃখ ক্লেশ ভুলে তিনজন হাসি-আনন্দে মেতে ছিল এতক্ষণ। শুধু শেষের দিকে লীলার ওই কথায় মনীশের মনটা একটু আনচান করে উঠল। 'দাদা, তুই এই চাকরীটা পেলে আমি কিন্তু কলেজে পড়ব।'

লীলা আর মাকে রিকশায় উঠিয়ে মনীশ ফুলবাগানের দিকে পা বাড়াল টিউশনির উদ্দেশ্যে।

তার ঠিক সাতদিন পর ফুলবাগানে আবার পড়াতে যেতেই ছাত্র দেবাশীষ বলল, 'মাস্টার মশাই, বাবা আপনাকে আজ দেখা করতে বলেছেন।'

'ফিরেছেন বাবা ?' মনীশ জিজ্ঞেস করল।

'না এখনো ফেরেননি।' দেবাশীষ বইপত্র টেবিলের ওপর নামাতে নামাতে বলল, 'আমাকে সকালে বলছিলেন।'

'ঠিক আছে আসুন দেখা করব।'

মনীশ পড়ানো শুরু করল। যদিও দেবাশীষের কথায় ওর বুক এখন একটু ঢিব ঢিব করছে। দেবাশীষের বাবা ইন্দ্রনাথবাবু কলেজে আইন পড়ান আর ওকালতিও করেন। তাঁর বহু পরিচিত বহু যোগাযোগ। মনীশ এমনিতে ভীষণ মুখচোরা। আত্মসম্মান বোধও ওর তীব্র। তবু গত সপ্তাহে যেদিন ওরা বেলেঘাটা লেকে গিয়েছিল সেদিনই সে ইন্দ্রনাথবাবুকে বলেছিল, সোয়াব কোম্পানীতে ওর ইন্টারভিউটা কেমন হয়েছে খোঁজ নেওয়া সম্ভব কিনা। ইন্দ্রনাথবাবু বলেছিলেন চেষ্টা করবেন।

সাড়ে আটটা নাগাদ ইন্দ্রনাথবাবু বাড়ি এসে গিয়েছিলেন। দেবাশীষকে পড়িয়ে মনীশ দেখা করল তাঁর সাথে।

'ভাল সংবাদ মনীশ।' ইন্দ্রনাথবাবু হেসে বললেন, 'সোয়াব কোম্পানীতে তোমার ইন্টারভিউ-এর রিপোর্ট পেলাম। তোমার তো দারুণ পারফরমেন্স। আমার সোর্স অবশ্য কোনো বিগ গাই নয়। সামান্য এক অফিসার। সে বলল মোটামুটি সিওর, চাকরীটা তুমিই পাচ্ছ।'

উত্তেজনায় মনীশের বুক শিরশির করে উঠল। কিছু বলতে পারল না। ইন্দ্রনাথ বাবুর দিকে হা করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

'কিন্তু আমার পক্ষে যে এটা দুঃসংবাদ।'

ইন্দ্রনাথবাবু কথাটা হাসিমুখে বললেও বুঝতে পারল না মনীশ। বরং থমকে ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকাল।

'শুনলাম চাকরীটা নাকি হিমাচল প্রদেশে।' ইন্দ্রনাথবাবু বললেন, 'আমার ছেলের তাহলে কি হবে! এত ভাল পড়াতে তুমি! পাব তোমার মত আর মাস্টার—?'

'ইয়ে মানে—' এতক্ষণ পর মনীশ প্রায় তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে বলল, 'চাকরীটা সত্যি আমার হবে কাকাবাবু ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ হবে। টেস্টে যখন ফার্স্ট হয়েছো, আর কার হবে,' ইন্দ্রনাথবাবু মনীশের

পিঠ চাপড়ে বললেন, 'যাও বাড়িতে গিয়ে মাকে খবরটা দাও। আর আমার ছেলের জন্য ঠিক তোমারই মত একজন মাস্টার যোগাড় কর, বুঝলে। আমিও খুব খুশী তোমার এই খবর পেয়ে।'

মনীশ নিজের খুশী সংযত করে নিচু হয়ে প্রণাম করতে গেল ইন্দ্রনাথবাবুকে। ইন্দ্রনাথবাবু তার আগেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন মনীশকে।

'তুমি আরো বড় হবে মনীশ। অনেক বড় হবে। ইন্দ্রনাথবাবু আন্তরিক স্বরে বলে উঠলেন, 'সত্যি কথা বলব, আমার ছেলে যদি তোমার মতো হ'তে পারে, তোমার ব্যবহার তোমার স্বভাব তোমার মানসিকতা পায়, তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত হব। সব দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত।'

টিউশনি শেষে ফুলবাগান থেকে বেলেঘাটা শর্ট-কাটে হেঁটে আসে মনীশ। খুব একটা কাছের পথ নয় কিন্তু পয়সা বাঁচানোর জন্য বাসে ওঠে না। আজ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ইন্দ্রনাথবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে উঠে পড়ল। বেলেঘাটা মেন রোডে এসে আবার আরেকটা বাস।

'মা—' ঘরে ঢুকে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল মনীশ। কোলে মুখ গুঁজে মুখ ঘষতে লাগল সজোরে।

'কি হল মনীশ?' গায়ত্রী থতমত খেয়ে ছেলের মুখ তুলে ধরল দুহাতে। মনীশের চোখে জল। জলভরা চোখে হাসিতে ভরিয়ে দিল সারা মুখ।

'মা—!' মনীশ মাকে বুক সমেত দুহাতে জড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বলল, 'চাকরীটা আমার হয়ে যাবে!'

'হয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, ইন্দ্রনাথকাকু খবর পেয়েছেন।' মনীশ উচ্ছল স্বরে বলে উঠল, 'আমি নাকি ইন্টারভিউতে ফার্স্ট হয়েছি।'

লীলা পাশের ঘরে পড়ছিল। ছুটে এল।

'দাদা! সত্যি?'

'হ্যাঁরে লীলা—!' মনীশ মায়ের কাছ থেকে উঠে এসে লীলার কোমর জাপটে শূন্যে তুলে ধরল ওকে—'তোর কলেজে পড়া হবে হবে হবে!'

গায়ত্রী তখন খাট থেকে নেমে ঘরের কোণে পুজোর ছোটো বেদীর কাছে গিয়ে মা লক্ষ্মীর ছবির সামনে জোড় হস্তে নত হয়ে বলছে, 'মা, এই ঘরে তোমার ঘটা করে পুজো দেব। মনীশের প্রথম মাইনে দিয়ে।'

লীলা দাদার আলিঙ্গন বন্ধ হয়ে শাড়ীর আঁচল দিয়ে মনীশের চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'দাদা তুই কাঁদছিলি?'

'হ্যাঁ রে আনন্দে কাঁদছিলাম। ভীষণ আনন্দে!' মনীশ হাসতে হাসতে বলল।

'আমি কিন্তু জানতাম তুই এই চাকরীটা পাবি।'

'কি করে?' মনীশ লীলার দিকে হেঁয়ালীর দৃষ্টিতে তাকাল।

'তুই যেদিন ইন্টারভিউ দিলি তার পরের দিন—' লীলা একটু থেমে বলল, 'আমার

স্কুলের পাশে পাখী নিয়ে যে এক জ্যোতিষী বসে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। পাখীটা যে কার্ড তুলেছিল তাতে লেখা ছিল—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।'

'সেখানে তো পয়সা লাগে!' মনীশ ভুরু কুঁচকে তাকাল।

হ্যাঁ। তুই জন্মদিনে আমায় এক টাকা দিয়েছিলি তার থেকে আট আনা বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।'

'দেখেছো মা!' মনীশ গায়ত্রীর দিকে ঘুরে নালিশের সুরে বলল, 'ওকে দিলাম কিছু খেতে পয়সা। ও তার অর্ধেক এক ভণ্ড জ্যোতিষীকে দিয়ে এল।'

'যাঃ ভণ্ড বলিস না—!' গায়ত্রী পুজোর বেদীর সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম সেরে উঠে এসে বলল 'ওই তো বলেছে, তোর চাকরী হবে!'

'আমার সব জানা আছে। ওই পাখীগুলো ট্রেনড। ইশারায় এমন উত্তর তুলবে খদ্দের যেন খুশী হয়ে বাড়ি ফেরে।' মনীশ রাগত স্বরে বলল, 'তাছাড়া ওকে মাত্র দিয়েছি এক টাকা তার অর্ধেক এভাবে খরচ করবে কেন?'

'ঠিক আছে। সামনের জন্মদিনে ওকে পঁচিশ টাকা দিস, হল তো!'

লীলাব চোখ বিস্ফারিত হল। পঁচিশ টাকা, সে তো অনেক!

মনীশ লীলাকে ছেড়ে এবার মাকে জড়িয়ে বলল, 'বেশ তাই দেবো!'

লীলাও এসে খুশীতে জড়িয়ে ধরল গায়ত্রীকে। বলল, 'আমি টাকা চাই না মা, দাদার চাকরী হোক।'

সোযাব কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মধ্যবয়সী সুধীন চক্রবর্তী গত কাল একটা ওভারসীজ ট্যুর সেবে কলকাতায় ফিবে এসেছেন। আজ প্রায় দু-সপ্তাহ পরে অফিসে যোগ দেবেন। তারই প্রস্তুতি চলছে তার বাংলোয়।

সকাল আটটা চল্লিশে ফোন বেজে উঠল বেড রুমে।

সুধীন চক্রবর্তী বাথরুম থেকে বেরিয়ে ড্রেসিং রুমের দিকে যাচ্ছিলেন, বিসিভারটা তুলে নিলেন কানে। 'হ্যালো!'

'হু ইজ স্পিকিং প্লিজ?' ওপারের প্রশ্ন।

'সুধীন চক্রবর্তী। হুম ডু ইয়ু ওয়ান্ট?'

'আপনাকেই চাইছি স্যার। আমি দিলীপ গুহরায় বলছি। চিনতে পারছেন '

'ও সিওর!, সুধীন চক্রবর্তী কেবিনেটে কনুই ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'বলুন কিছু খবর আছে ?'

গত সপ্তাহে আপনার ফাইল পুট আপ করেছি মিনিস্টার সাহেবের কাছে। উইথ অল রেকমেন্ডেশনস—তবে এদিকে আরো প্রোপোজাল জমা পড়েছে—'

'জানি। সে খবর আমি পেয়েছি। কিন্তু আমাদেরটা ডাউনস্ট্রীম প্রোজেক্ট। ওখানে আমাদেব অলরেডী এসটাবলিশমেন্ট আছে। ইট ইজ নট আওয়ার নিউ ভেঞ্চার অ্যাট অল—'

'বলতে হবে না, বলতে হবে না। আই হ্যাভ গন থ্রু এভরি পেপারস। মনে

হয় মিনিস্টারস রেফেভর উইল গো টু ইয়ু—বায় দি ম্যান মিঃ চক্রবর্তী, যে জন্য ফোন করছিলাম—'

'বলুন—!'

'আপনাদের একটা রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে? অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের?'

'হ্যাঁ, আমাদের হিমাচল প্রদেশের কারখানার জন্য।'

'মিনিস্টার সাহেবের একজন কেণ্ডিডেট আছে।'

'মিনিস্টার সাহেবের?'

'হ্যাঁ, এক দূর সম্পর্কের শালীর ছেলে। নামটা উনিই বলবেন। আমি শুধু আপনাকে প্রায়োর ইনফরমেশনটা দিলাম।'

'মিনিস্টাব সাহেব কি ফোন কববেন আমায়?'

'এ সব কথা কি ফোনে বলা যায় স্যার? আপনাকে একবার আসতে হবে। আই মিন ফাইলে উনি কতগুলো এনকোয়ারী করেছেন। সেই বিষয়েও কথা হয়ে যাবে, তখন—

'কখন আসব?'

'আজ সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে যদি আসেন।'

'ও, কে তাই আসব।'

'থ্যাঙ্ক ইয়ু স্যাব।'

সুধীন চক্রবর্তী ফোনের রিসিভার নামিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন স্থির হয়ে। প্রোজেক্ট নিয়ে মিনিস্টারের সঙ্গে আলোচনা করতে তিনি সব সময় প্রস্তুত, কিন্তু কোম্পানীর একটা রিক্রুটমেন্টে কেণ্ডিডেটের প্রস্তাবটা বড়ই বিব্রতকর।

তিনি ধীর পায়ে ড্রেসিং রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন।

একজন ক্যানসার স্পেশালিস্টের চেম্বার।

অ্যান্টি রুমে গায়ত্রীকে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন। টেবিলের সামনে তখন উদ্বিগ্ন মনীশ ও কাকাবাবু বসে। দুজনেরই উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি।

ডাক্তাববাবু নিজের চেয়ারে বসতে বসতে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে ওনাকে নিয়ে বাইরে যান।'

মনীশ ও কাকাবাবু চেয়ার থেকে উঠে অ্যান্টি রুমের দিকে এগোলো। গায়ত্রী তখন বেরিয়ে এসেছে।

'চলো দিদি—!' কাকাবাবু গায়ত্রীকে নিয়ে পা বাড়ালেন দরজার দিকে।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর মুখে প্রেসক্রিপশান লিখছেন। মনীশ মা ও কাকাবাবুকে দরজা অব্দি পৌঁছে ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসল।

ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন লিখে মুখ তুলে বললেন, 'হাসপাতালের লাইন অফ ট্রিটমেন্ট ঠিক আছে। তবে ট্রিটমেন্টটা ঠিকমত চালিয়ে যেতে হবে। আমি কিছু অ্যাড করলাম। এই ওষুধগুলো এখন খাইয়ে যান। আর মাঝে মাঝে ব্লাড দিতে হবে—এখুনি নয়। তবে পনেরো দিন পর একবার চেক করাতে আসবেন।'

'ডাক্তারবাবু—' মনীশ উদগ্রীব স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এখন চিন্তার কিছু নেই তো?'

'না। এখন যা অবস্থা ট্রিটমেন্ট প্রপারলি হলে আমার মনে হয় দেড় থেকে দু বছর ইয়ু নীড নট টু বি ওরিড। তবে সবই চান্স। আফটার অল ইট ইজ ক্যানসার।'

মনীশের মুখে উদ্বেগের ঢেউ।

ডাক্তারবাবু তাকালেন। আবার বললেন, 'এই রোগের টাইমলি চেকআপ আর ট্রিটমেন্ট পারফেক্টলি হলে আমরা দু-একজনকে পাঁচ থেকে দশ বছরও বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি।'

'থ্যাঙ্ক ইয়ু ডাক্তারবাবু!' মনীশের মুখে ম্লান হাসি। প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে পকেট থেকে দশটা দশ টাকার নোট বের করে গুনে টেবিলের ওপর রাখল। উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, 'আচ্ছা! আসি আজ?'

ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে টাকাটা তুলে নিলেন টেবিল থেকে।

গায়ত্রী ও কাকাবাবু রিকশা করে বাড়ি ফিরছেন। মনীশ পেছনে হেঁটে আসছে।

গায়ত্রী বলল, 'দাদা একশ টাকা দিয়ে মনীশ ডাক্তার দেখাল গা-টা চড় চড় করছে আমার। কি যে করল মনীশ ওর কি এত সামর্থ্য আছে?'

'না দিদি, বাইরে একজনকে দেখিয়ে নেওয়া খুব দরকার ছিল।' কাকাবাবু মন্তব্য করলেন।

'কোনো দরকার ছিল না! আর দু'দিন বাদেই হাসপাতালে রিপোর্ট করার ডেট—'

'হাসপাতালের যা হাল—!' কাকাবাবু ক্ষোভের স্বরে বললেন, 'আর তোমার কাছে যা টুকটাক ঘটনা শুনলাম, ওখানকার চিকিৎসার ওপর ভরসা করা যায়!'

'অনেকেই তো সেখানে চিকিৎসা করাচ্ছে দাদা।'

'তারা নিরুপায় দিদি!'

'আমাদেরই বা কি উপায় আছে!'

'দেখো না—ইন্দ্রনাথ যখন বলেছে মনীশের এই চাকরীটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।'

'সেই আশাতেই নিজের সব সঞ্চয় নিয়ে আজ আমায় দেখাতে এল।' গায়ত্রী চিন্তিত স্বরে বলল, 'কিন্তু কই চিঠি তো এখনো এল না!'

'আসবে আসবে!' কাকাবাবু আশ্বাস দিলেন, 'একটা চাকরীর চিঠি সোজা কথা। আসতে সময় লাগে।'

লাঞ্চের পর ঠিক আড়াইটের সময় সোনার কোম্পানীর চীফ পার্সোনাল অফিসার জয়ন্ত গোস্বামী ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুধীন চক্রবর্তীর চেম্বারে ঢুকলেন। জয়ন্ত গোস্বামীর আটান্নর কাছাকাছি বয়স। বয়সের ভারে একটু নুইয়ে গেছে শরীর।

'মিঃ গোস্বামী, তামিল্লার পোস্টের রিক্রুটমেন্টের পোজিসন কী?' সুধীন চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলেন।

'সিলেকশন কমপ্লিট স্যার!' জয়ন্ত গোস্বামী বললেন, 'উই আর জাস্ট ওয়েটিং ফর ইয়োর সিগনেচার ইন দ অর্ডার।'

'সিলেক্ট কে হয়েছে ?'

'মনীশ সিংহ। এ ব্রিলিয়েন্ট বয়।'

সুধীন চক্রবর্তী গম্ভীর হলেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'বি সিটেড গোস্বামী।'

জয়ন্ত গোস্বামী বসলেন সামনে।

'আমি পার্সোনালি কোম্পানীর রিক্রুটমেন্ট পলিসিতে ইন্টারভেন করা পছন্দ করি না।' সুধীন চক্রবর্তী চেয়ারে গা এলিয়ে একটু আড়ষ্ট স্বরে বললেন, 'কোম্পানীর ডেভলেপমেন্ট, প্রোগ্রেসের জন্য আমাদের ব্রিলিয়েন্ট ব্রেনের খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এমন সব আইন কানুন ব্যুরোক্রেটিক বাইন্ডিংস-এ আমরা বাঁধা, সামটাইমস উই হ্যাভ টু কম্প্রোমাইজ।—মনীশ সিংহ চাকরীটা পাচ্ছে না।'

'হোয়াই স্যার?'

'প্লিজ ব্রিংগ দি লিস্ট অফ কেনডিডেট্স্। উই হ্যাভ টু রিক্রুট সামওয়ান এলস।'

'সামওয়ান এলস।' জয়ন্ত গোস্বামী বিস্মিত চোখে তাকালেন।

'ইয়েস মিঃ গোস্বামী। রিকোয়েস্টটা এমন কোয়ার্টার থেকে এসেছে যদি আমরা তাকে চাকরীটা না দি আমাদের একটা প্রোজেক্ট ইমেডিয়েট সাফার করবে।'

জয়ন্ত গোস্বামী উঠে দাঁড়ালেন। ঘটনাটা তার একদম ভাল লাগল না। চেম্বার থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন ধীর পায়ে। এই মুহূর্তে তার চোখে ভেসে উঠল মনীশ সিংহের মুখ। সেদিন ইন্টারভিউ বোর্ডে বসে ছেলেটার প্রতি প্রশ্নের সঠিক উত্তর, কথা বলার ঢঙ, নম্র চাহনী উপভোগ করেছিলেন তিনি। অনেক ইন্টারভিউ নিয়েছেন জয়ন্ত গোস্বামী কিন্তু এরকম ভদ্র বিনীত অথচ মেধাবী ছেলে খুব কম দেখেছেন। এই প্রথম তার নির্বাচন থেকে একটি যোগ্য পদপ্রার্থী বঞ্চিত হল। এটা তো সরকারী অফিস কিংবা পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠান নয়, প্রাইভেট ফার্ম। এখানে এ ধরনের ঘটনা কচিৎ কদাচিৎ হয়।

মনীশ দেবাশীষকে পড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল নীচে। ঠিক সে মুহূর্তে ইন্দ্রনাথবাবু তার গাড়ী থেকে নেমে সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন। মনীশকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুহূর্তে গম্ভীর থমথমে হয়ে গেল তার মুখ।

'মনীশ—।'

'বলুন কাকাবাবু।' মনীশ শেষ সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে ইন্দ্রনাথবাবুর সামনে এসে নত চাহনীতে তাকাল।

'খুবই দুঃসংবাদ মনীশ। এরকম হবে আমি কখনো ভাবতে পারিনি—'

'কি হয়েছে কাকাবাবু ?'

'সোয়াব কোম্পানীতে তোমার চাকরী হয়নি।'

মনীশের সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। স্তব্ধ চোখে সে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথবাবুর দিকে।

'ভদ্রলোক আমাকে ফোন করে জানালেন। তিনিও হতবাক। বুঝতে পারছেন না

কেন এমন হল। বললেন, স্কোর তুমি সবচেয়ে ভাল করেছিলে এটা ঠিকই। কিন্তু অন্য কোনো ফ্যাক্টর আছে বোধহয়। চাকরীটা আরেকজন পেয়েছে।'

মনীশ কিছু বলল না। ও তখন ভাবছে, ওর বুক এতদিনে পাথর হয়ে গেল না কেন? আবেগ-উদ্বেগ চিন্তা-দুশ্চিন্তার অনুভূতিগুলি যদি এতদিনে ভোঁতা হয়ে যেত তাহলে কোনো দুঃসংবাদের প্রভাব পড়ত না ওর ওপর।

'মনীশ—!' ইন্দ্রনাথবাবু ওর কাঁধে গাঢ় হাত রেখে বললেন, 'তোমার জন্য আমিও চেষ্টা করছি। বেশ কয়েক জায়গায় বলে রেখেছি। কিন্তু চাকরীর যে এরকম দুরবস্থা বুঝতে পারিনি।—ইস্! এতদূর এগিয়েও তোমার হল না, যাক্ ডোন্ট বি ফ্রাস্ট্রেটেড। আর একটু অপেক্ষা কর। কিছু একটা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।'

মনীশ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। নিথর নিশ্চল। ইন্দ্রনাথবাবু ওর কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এসো মনীশ!'

মনীশ মাথা হেলিয়ে এগোলো। ইন্দ্রনাথবাবু সিঁড়িতে উঠে গেলেন।

কোনোমতে বারান্দার দরজা অব্দি গিয়ে কপাটে হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল মনীশ। মুহূর্তের জন্য ওর মনে হল চোখে শুদ্ধ অন্ধকার দেখছে। সামনে অতল গহ্বর। চোখ বুজে কিছুক্ষণ দাঁড়াল মনীশ। তারপর তাকাল। ধীরে ধীরে এবার এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে।

'দাদা তুই এই চাকরীটা পেলে আমি কিন্তু কলেজে ভর্তি হব।'

'তোর কলেজে পড়া হবে হবে হবে!'

ঠিক আছে সামনের জন্ম দিনে ওকে পঁচিশ টাকা দিস্।'

'বেশ তাই দেবো!'

'এই রোগের টাইমলি চেকআপ আর ট্রিটমেন্ট পারফেক্টলি হলে আমরা দু-একজনকে পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি।'

ফুলবাগান থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত বেহুঁশের মত হাঁটছিল মনীশ। মাথায় তখন প্রতিধ্বনির মত বেজে উঠছিল কথাগুলো।

'তুই যে এই দু-বছর এতগুলো ইন্টারভিউ দিলি সেই চাকরীগুলো হচ্ছে না? তোকে বাদ দিয়ে কারো না কারো হচ্ছে তো?'

'তারা যোগ্য বলেই হচ্ছে। আমি যোগ্যতা দেখাতে পারছি না।'

'আমার বিশ্বাস হয় না। তোর শিক্ষা তোর বুদ্ধি তোর অধ্যবসায় এত পরিশ্রম তার কোনো মূল্যই নেই?'

হ্যাঁ সত্যি কোনো মূল্য নেই। এখন সেটা বুঝতে পারছে মনীশ। ওই যে ইন্দ্রনাথবাবু বললেন, 'স্কোর তুমি সবচেয়ে ভাল করেছিলে এটা ঠিকই কিন্তু অন্য কোনো ফ্যাক্টর আছে বোধহয়। চাকরীটা আরেকজন পেয়েছে।'

সেই অন্য ফ্যাক্টর অন্য গুণের ঘাটতি আছে মনীশের। কিন্তু সেগুলো কী, মনীশ কিছুতেই অনুধাবন করতে পারছে না। এরকম ঘটনা ওর জীবনে প্রথম নয়। আগেও দু-একটা ইন্টারভিউতেও ঘটেছে। বিশ্বাস ছিল চাকরীটা হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি।

কেন কিসের জন্য হল না সেটা ওর কাছে এখনো রহস্য। সোরাব কোম্পানীর চাকরীটা পাবেনা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি মনীশ। এ রহস্য আরো হতবুদ্ধিকর আরো দুর্বোধ্য মনীশের কাছে।

ভেজানো দরজা ঠেলে বাড়িতে আজ চোরের মত ঢুকল মনীশ।

গায়ত্রী খাটে শুয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিল। চাপা শব্দটা শুনে তাকাল। উঠে বসল বিছানায়।

'মনীশ— !'

'কী মা ?'

'তোর চেহারা এরকম লাগছে কেন রে ? শরীর ভাল তো ? এদিকে আয় !'

মনীশ মার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

গায়ত্রী ডান হাতটা মনীশের কপালে রাখল। উলটে গালের ওপরটাও পরখ করল। 'কই কিছু না তো !'

'কি আবার হবে ?' মনীশের মুখে অস্বস্তির ছায়া। 'এতদূর টানা হেঁটে এসেছি তাই ক্লান্ত লাগছে।'

'রোজ রোজ হাঁটিস কেন ? ওফ্ তোর চাকরীটা হলে বাঁচি—ওই দ্যাখ বাড়িও এখন না সারালে নয়।'

গায়ত্রীর ইঙ্গিতে মনীশ খাটের উলটো দিকে ডান কোণের ছাদের দিকে তাকাল। ছাদ থেকে একটা চাঙর ভেঙ্গে পড়েছে। তার সদ্য গর্তের দাগ।

'কখন ভাঙ্গল ?'

'আজ বিকেলের দিকে।'

ভাড়া বাড়ি। কিন্তু সেই বাবার আমলের ভাড়া। বাড়িওয়ালা ওদের ওঠাতে পারছে না বলে বাড়ি সারাইয়ের ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।

'মা তোমার খাটটা সরিয়ে দি ?' মনীশের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর। ভীত চোখে তাকাল খাটের ঠিক ওপরে ছাদের দিকে।

'না এদিকটা ঠিক আছে।' গায়ত্রী বলল, 'তবে তুই চাকরী পেলে সারাইয়ের কাজটা—'

'মা লীলা কোথায় ?'

'কোথায় আবার পাশের ঘরে। ভাল কলেজে পড়বে বলে এখন দিনরাত বই নিয়ে পড়ে থাকে।—আজ কাকাবাবুর কাছে গান শিখতেও গেল না।'

লীলা তখনই পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, 'দাদা আজ আমাকে একটু বেশী রাত্তির অব্দি পড়াবি ?'

'হ্যাঁ পড়াব।'

মনীশ এখন বুঝতে পারছে ওর বুকে আস্তে আস্তে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। পাথর হতে আর দেরী নেই। তাই আজ ঘরে ঢুকে সবার সঙ্গে কি সুন্দর কথা বলে যাচ্ছে। এই তো চাই। অথচ ক'দিন আগেই ইন্দ্রনাথকাকুর কাছে চাকরীটা হবে শুনে আনন্দে মাকে জড়িয়ে কেঁদে ফেলেছিল মনীশ। আজ ওর মুখ ফসকেও বেরলো না যে

চাকরীটা হয়নি। ভবিষ্যতে আরো কত দুঃসংবাদ শুনতে এখন থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে ওকে।

সে-রাতে লীলাকে পড়াতে গিয়ে ওর ইংরেজী বইয়ের মলাটের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মনীশ। মলাটটা খবরের কাগজে বাঁধানো। কাগজের ওপর একটা পুরোনো বিজ্ঞাপন। দুবাইয়ের কোনো কোম্পানীর চাকরীর বিজ্ঞাপন ওটা। ভারতবর্ষ থেকে তারা লোক নিতে চায়। সেই বিজ্ঞাপনের ওপর চোখ বুলোচ্ছিল মনীশ।

রাত দুটো অব্দি পড়িয়ে মনীশ শুয়ে পড়ল ছোট্ট খাটে। লীলাও শুতে চলে গেল মার কাছে।

সকাল ছটায় উঠে মনীশ তৈরী হয়ে নিল। লীলা তখন ঘুমোচ্ছে আর গায়ত্রী স্নান সেরে পুজোর বেদীতে প্রণাম করছে।

'মা আমি একটু বেরোচ্ছি—!'

মনীশের গলা শুনে ঘুরে তাকাল গায়ত্রী। 'কোথায় যাচ্ছিস এত সকালে?'

'এক বন্ধুর বাড়ি। চলে আসব তাড়াতাড়ি।'

'কিছু খেয়ে যা তাহলে। খালি পেটে বেরোস না।'

'খেয়েছি মা। এক বাটি মুড়ি।—আসছি!'

মনীশ দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে গেল। খাওয়ার কথাটা অবশ্য সে মিথ্যে বলল। এরকম মিথ্যে বহুবার বলেছে। বাড়ির মুড়ি, চিড়ে, ভাত বাঁচানোর জন্য।

এখন সময় নেই। কাল রাতে চিন্তাটা যখন দানা বেঁধেছে মাথায়, এদিকের খবরা-খবর তাড়াতাড়িই নিতে হবে। এর আগেও মনীশ ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে দু-একবার। কিন্তু তখন বিশেষ খতিয়ে দেখেনি। বিদেশের চাকরীতে ভেবেছিল প্রথমে অনেক টাকার প্রয়োজন। কিন্তু কাল রাতে লীলার বইয়ের মলাটে যে বিজ্ঞাপনটা দেখল তাতে লেখা আছে যোগ্য প্রার্থীদের দুবাই যাওয়া-আসার টিকিট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ওর কলেজের দুই বন্ধু বছর খানেক আগে মিডল ইস্ট-এ গেছে। একজন কোয়েতে আরেকজন দুবাইয়ে। কিন্তু এ ব্যাপারে মনীশের কোনো ধারণা নেই। তাই এখন ও যাচ্ছে অরবিন্দর বাড়ি।

অরবিন্দ ওর বন্ধু নয়। উপরন্তু ওর চাল-চলন কথাবার্তার ধরণে ওকে পছন্দ করে না মনীশ। কিন্তু অরবিন্দর বিদেশের দিকে বেশ ঝোঁক আছে। এসব ব্যাপারে অনেক কিছু জানে সে। যদি ওর কাছ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়, দেখাই যাক না। বাঁচতে তো হবে মনীশকে। ও না বাঁচলে আর দুটো প্রাণ বাঁচবে কি করে?

ইস্টার্ন বাইপাস থেকে বাসে উঠে ঢাকুরিয়া স্টপে নামল মনীশ। ঢাকুরিয়া আর যোধপুর পার্কের মাঝামাঝি কোথায় যেন অরবিন্দর বাড়ি। কলেজ থেকে আহত অরবিন্দকে নিয়ে একবার এসেছিল। মেয়ে ঘটিত কোনো ব্যাপারে কলেজের সামনে এক মস্তান ছেলের সঙ্গে মারামারি হয়েছিল অরবিন্দর। মাথায় কোমরে পায়ে বেশ

চোট পেয়েছিল তখন। একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার। মনীশ ও আরেক বন্ধু হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ফার্স্ট এইড করিয়ে বাড়ি পেঁছে দিয়েছিল ওকে।

বড় রাস্তার মুখেই বাড়িটা। চিনতে পারল মনীশ। দোতলা। পাঁচিল ঘেরা চারপাশে। ভেতরে এক চিলতে বাগান।

গেটের কাছে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে কিন্তু কিন্তু করে ভেতরে ঢুকল। গেটের ওপর ছোটো একটা বোর্ডে সুন্দর করে লেখা, 'মিসেস করবী সেন'। অরবিন্দর মায়ের নাম। অরবিন্দর বাবা আছে কিনা জানে না মনীশ। সেবার মায়ের সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। বেশ সুন্দরী সুবেশা স্মার্ট ভদ্রমহিলা। দু-একবার খবরের কাগজে ছাবও দেখেছে। কোনো এক নারী সমিতির সেক্রেটারী না প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভাষণ দিচ্ছেন। নারীরা যে কত দুর্নীতি, নৈতিক অবনতি, পক্ষপাতিত্বের শীকার হয় তার প্রতিবাদে। পাশে স্বনামধন্য কোনো মন্ত্রী বসে।

বারান্দায় পেঁছতেই এক যুবতী পরিচারিকা বেরিয়ে এল ভেতর থেকে।

'কাকে চান?'

'অরবিন্দ আছে?'

'ওপরে—।' পরিচারিকা ঘেরা বারান্দার ভেতরে বাঁদিকের সিঁড়িটা দেখিয়ে দিল।

'যাব?' মনীশ জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ যান!' পরিচারিকা দাঁড়িয়ে রইল দরজায়।

মনীশ আড়ষ্ট পায়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল। ওপরে আরেকটা বারান্দা। তারপর ঘরের সারি।

'অরবিন্দ!'

অরবিন্দ সামনের ঘব থেকে বেরিয়ে এল। পরনে শর্ট প্যান্ট। খালী গা।

'আরে তুই!' অরবিন্দ অবাক। 'কাম অন—!'

অরবিন্দর পেছন পেছন ঘরের ভেতর ঢুকল মনীশ। অরবিন্দ সোজা দেয়াল ঘেঁষা টেবিলের কাছে গিয়ে একটা গ্লাস তুলে চুমুক দিল। মনীশ বিস্মিত চোখে দেখল, গ্লাসে মদ। এখন বাজে সকাল আটটা।

'আর বলিস না। হ্যাঙ্গ ওভার হয়েছে।' অরবিন্দ ঢোক গিলে গ্লাসটা রাখল টেবিলের ওপর।

'হ্যাঙ্গ ওভার!' মনীশ বুঝতে পারল না।

'বস্।' অরবিন্দ ঘুরে বলল, 'কাল রাতে পাঁচ পেগ পেটে পড়েছে—।'

মনীশ একটু অস্বস্তির সঙ্গে টেবিলের পাশে গিয়ে চেয়ারটায় বসল।

'ওয়েট এ বিট! পুরোটা চার্জ করেনি। তা নাহলে হ্যাঙ্গ ওভার যাবে না।'

অরবিন্দ টেবিল থেকে আবার তুলে নিল গ্লাস। এক চুমুকে সব নিঃশেষ করে গ্লাসটা টেবিলে রেখে বিছানায় বসল।

'বল্ কি খবর?' অরবিন্দর মুখ থেকে এক দমক তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল মনীশের মুখের সামনে।

চোখমুখ কোনোমতে সংযত করে মনীশ বলল, 'এত সকালে তোকে একটু ডিস্টার্ব করতে এলাম।'

'নো মেটার। এখুনি আমি বেরোচ্ছি না। হোয়াটস্ ইয়োর প্রবলেম ?'

'মিডল ইস্ট-এর চাকরীর ব্যাপারে কোনো আইডিয়া আছে তোর ? মানে—' মনীশ একটু থেমে বলল, 'এখানে কাগজে যে বিজ্ঞাপনগুলো বেরোয়। যদি আমি অ্যাপ্লাই করি—'

'তুই তো স্কিলড ওয়ার্কার নস্। কোন্ পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবি ?' অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল।

'কেন ? আমি একটা অ্যাডভারটাইজমেন্ট-এ দেখলাম দুবাইয়ে টেলিফোন অপারেটর, অ্যাকাউন্টস্ অফিসারও চাইছে ?'

'টেলিফোন অপারেটর স্কিলড ওয়ার্কার।' অরবিন্দ টেবিল থেকে প্যাকেট তুলে সিগারেট বের করতে করতে বলল, 'আর অ্যাকাউন্টস অফিসার নিশ্চয়ই সি এ অথবা কস্ট্ অ্যাকাউন্টেন্ট চাইছে ? আদারওয়াইজ ওয়েল এক্স্পিরিয়েন্সড্ ইন সাম ওয়েল রিনাউন্ড কোম্পানী।'

দমে গেল মনীশ। অবশ্য লীলার বইয়ের মলাটে বিজ্ঞাপনের সামান্য একটা অংশ ছিল। তাছাড়া যেহেতু চাকরী নিয়ে বিদেশে যাবার কথা কোনোদিন ভাবেনি মনীশ, এই সব বিজ্ঞাপন কখনো সে এক ছত্রও পড়ে দেখেনি।

'তুই কি ভাবছিস—?' অরবিন্দ সিগারেটটা লাইটারে ধরিয়ে জোর একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'ওই শেখরা পয়সা ছড়িয়ে ইন্ডিয়া থেকে মেয়ার গ্র্যাজুয়েটস নেবে ? নো নো – নেভার!'

'তাহলে ব্যোমকেশ আর সমর গেল কি করে ?'

'ইয়েস ইয়েস আই নো।—' ঘাড় নাড়ল অরবিন্দ। 'ব্যোমকেশের দাদা কোয়েতে আছে আর সমরের মামা দুবাইয়ে। ওদের কেস আলাদা। যেমন আমি স্টেট্স-এ গিয়ে থাকতে পারি রঞ্জনার দাদা কিংবা অন্য কেউ আমাকে স্পন্সর করলে।

হতাশায় মনীশের মুখ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তাহলে সব পথ ওর সামনে রুদ্ধ ? স্বদেশে কোনো চাকরী নেই। বিদেশে যাবার কোনো সুযোগ নেই ? অবশ্য বিদেশে যাবার ব্যাপারে বিশেষ কোনো উৎসাহ বা পরিকল্পনা নিয়ে এখানে সে ছুটে আসে নি। তবু ডুবন্ত মানুষ যেমন যে কোনো অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরতে চায় গতরাত্রের দুবাইয়ের বিজ্ঞাপনটা তেমনি ওর মনে একটা বিকল্প চিন্তা এনে দিয়েছিল।'

'মনীশ, তুই বিদেশে যাবার কথা ভাবছিস কেন ?' অরবিন্দ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'ডু ইয়ু ওয়ান্ট টু আর্ন মোর মানি অর বিদেশের জীবন তোকে টানছে ?'

মোর মানি'! মনীশ অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে চাইল। সামলে নিল নিজেকে। অরবিন্দ অবশ্য কোনোদিনই ওর কাছের ছিল না। তাই মনীশ সম্বন্ধে কিছুই ওর জানার কথা নয়।

মনীশ ম্লান হেসে বলল, 'না রে, দুটোর কোনোটাই কারণ নয়। আসলে আমি বাঁচতে চাই। চাকরী তো এখানেও নেই। চাকরীর জন্যই যেতে চাইছি।'

'আই সি, তুই তাহলে আন-এম্প্লয়েড ? এখনো ?'

'হ্যাঁ এখনো ?'

'রিয়লী, আই ফিল পিটি ফর ইয়ু।' অরবিন্দ হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা টেবিলের অ্যাশট্রের ওপর ঝেড়ে বলল, 'অথচ আমি পাস করার পর থেকে দুটো চাকরী অলরেডী করেছি। নাউ আয় অ্যাম গেটিং দ্য থর্ড ওয়ান—ওই সোয়াব কোম্পানীর চাকরীটা।'

চমকে উঠল মনীশ। স্থির দীর্ঘ দৃষ্টিতে তাকাল অরবিন্দর দিকে। হেঁয়ালীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ চাকরী ?'

'ওহো, তোকে বলতে ভুলে গেছি।' অরবিন্দ সিগারেট মুখে পুরে ডান হাতটা টেবিলের ড্রয়ারের দিকে বাড়াল। ড্রয়ারটা টানতে টানতে বলল, 'সোয়াব কোম্পানীর ইন্টারভিউ তো তুইও দিয়েছিলি ? বাট আয় গট দ জব। এই দ্যাখ—'

ড্রয়ার খুলে অরবিন্দ একটা খাম বের করে মনীশের দিকে এগিয়ে দিল।

স্তব্ধ চোখে খামটার দিকে তাকাল মনীশ। এক কোণে সেই সুন্দর হরফে ছাপা সোয়াব কোম্পানীর নাম। কাঁপা হাতে সে খামটা নিল অরবিন্দর হাত থেকে। তারপর রুদ্ধশ্বাসে ভেতরের চিঠিটা বের করে মেলে ধরল সামনে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। সোয়াব কোম্পানী অরবিন্দকে আগামী এক তারিখে তাদের তামিয়ার কারখানায় অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হিসেবে যোগ দিতে বলছে। তার সঙ্গে রয়েছে মাইনে ও আবাসের বিস্তারিত তথ্য অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি।

চিঠিটা পড়তে পড়তে মনীশের চোখে ভাসছিল কয়েকটা দৃশ্য। কলেজে ক্লাস চলছে। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে মনীশও বসে একাগ্র মনে প্রোফেসারের লেকচার শুনতে ব্যস্ত। কিন্তু ওর পেছনের চাপা গুঞ্জন হাসাহাসি বিঘ্ন ঘটাচ্ছে ভীষণ। মনীশ ঘুরে দেখল, পেছনের ডেস্ক-এ অরবিন্দর হাতে একটা পর্নোগ্রাফির বই। দু-পাশের দুই সহপাঠীর সঙ্গে সেই বইয়ের ছবি নিয়ে রসিয়ে আলোচনা চলছে। আরেকটা দৃশ্যে ভেসে উঠল ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার ছবি। অরবিন্দ উত্তর পত্রের নীচে বইয়ের ছেঁড়া পাতার গুচ্ছ লুকিয়ে লাইনের পর লাইন নকল করে চলেছে। একজন বয়স্ক ইনভিজিলেটর লক্ষ্য করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন। অরবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে পরনের জামার একটা অংশ তুলে ওর কোমরের বেল্টে ঝোলানো পিস্তলটা দেখিয়ে দিল। মনীশও পাশের ডেস্ক থেকে দেখল। আতঙ্কে উঠল ওর মুখ। ইনভিজিলেটর ভদ্রলোক তার আগেই সরে গেছেন অন্য দিকে। সব শেষে মনীশের মনে পড়ল, সোয়াব কোম্পানীর এই চাকরীর অবজেকটিভ টেস্টে অরবিন্দর পেছন ফিরে বার বার মনীশকে উত্তর জিজ্ঞেস করার দৃশ্যটা।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা খামে পুরে অরবিন্দর হাতে ফিরিয়ে দিল মনীশ। ঠান্ডা গলায় উষ্ণতা আনার চেষ্টা করে বলল, 'কংগ্রেচুলেশনস্ অরবিন্দ !'

'থ্যাঙ্কস !' অরবিন্দ খামটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে বলল, 'আসলে কি জানিস, শুধু অ্যাকাডেমিকল কোয়ালিফিকেশনস থাকলে হয় না। তার সাথে ওরা দেখে অ্যাপটিটিউড স্মার্টনেস, অবজারভেশন অ্যান্ড আদার ফিটনেস। দিস ইজ মাই থার্ড জব।'

ঘটনার পরিণতি মনীশের বাকশক্তি প্রায় লোপ করে দিয়েছিল। কিন্তু এ-মুহূর্তে অরবিন্দ ওর সামনে একটা বিশাল প্রশ্নচিহ্ন। তাই বিস্ময়ের ঘোরেই সে জিজ্ঞেস করল, 'আগের দুটো ছাড়লি কেন ?'

'ভাল লাগেনি !' বেশ সহজ ভঙ্গীতে জবাবটা দিল অরবিন্দ। শূন্যে ধোঁয়ার রিঙ ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'সেটাই আমার প্রবলেম। বেশী দিন কোথাও ভাল লাগে না। এই চাকরীও আমি হার্ডলি দু-মাস করব।'

'দু মাস !'

'হাঁ, বললাম না স্টেটস-এ যাচ্ছি। দু-মাস পর আমার ডিপারচার ডেট।'

'তাহলে নিলি কেন চাকরীটা ?'

'মাম্মির জন্য।' সিগারেটের শেষাংশটা অ্যাশট্রেতে ছুঁড়ে হাত দুটো নগ্ন হাঁটুর ওপর নাচাতে নাচাতে অরবিন্দ বলল, 'মাম্মি চায় না আমি ফরেনে যাই। —ও ইয়েস। ওয়ান থিং মনীশ, ইট ইজ আ টপ সিক্রেট। মাম্মি কিন্তু জানেনা আমি স্টেটস-এ যাচ্ছি।'

মনীশের মাথায় কিছু ঢুকছে না। সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। প্রথম কথা, এতগুলো ছেলেকে টেক্কা মেরে অরবিন্দ চাকরীটা পেল কি করে ? দ্বিতীয় কথা, মাত্র দু-মাসের জন্য সে নিয়েছে এই চাকরী ? আশ্চর্য ! অথচ ওই খামটা যদি অরবিন্দর পরিবর্তে মনীশের ঠিকানায় যেত, তাহলে কত বড় একটা সমস্যার সমাধান হতে পারত ? যে সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তিন তিনটে জীবনের প্রশ্ন ! একটা সম্পূর্ণ পরিবারের অস্তিত্বের লড়াই !

'অরবিন্দ !' মনীশ একটু আহত স্বরে বলল, 'তুই যখন স্টেটস-এ যাচ্ছিস, মাত্র দু-মাসের জন্য চাকরীটা না নিলেও পারতিস। এই চাকরী তাহলে আরেকজন পেত। একটা সংসার হয়ত বাঁচত।'

'অল দ্য সেম। অরবিন্দ হাঁটু নাচাতে নাচাতে বলল, 'দু-মাস পর আমি চাকরীটা ছেড়ে দিলেও আরেকজন পাবে। কিন্তু আমার প্রবলেম কি জানিস ? চাকরীটা যদি আমি অ্যাকসেপ্ট না করি, মাম্মি আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দু-লাখ টাকা ট্রান্সফার করবে না !'

'মানে ?'

'ইয়েস ! দ্যাট ইজ দ্য কন্ডিশন ! আমি মাম্মিকে বলেছি, তুমি যদি দু-লাখ টাকা এখুনি দাও গাড়ি-টাড়ি কেনার জন্যে তাহলে চাকরীটা নোব। মাম্মি রাজী। আসলে মাম্মি চায় আমি গাড়ি-টাড়ি কিনে চাকরী নিয়ে এখানেই থেকে যাই। আর আমারও টাকাটা দরকার স্টেটস-এ যাওয়ার খরচের জন্য। দ্যাট মানি হ্যাজ বিন ট্রান্সফারড্ ইয়েস্টারডে। আজ আমি শপিংয়ে বেরুচ্ছি উইথ রঞ্জনা।'

অরবিন্দ খাট থেকে উঠে দাঁড়াল।

মনীশও উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ওর শরীর এখন টলছে। পা দুটো যেন সোজা হয়ে থাকতে চাইছে না মাটির ওপর। চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। নাঃ আজ এখানে এসে খুব ভুল করেছে মনীশ। সোয়াব কোম্পানীর চাকরীটা সে পায়নি,

এই আঘাত হয়ত সামলে নেওয়া যেত, কিন্তু সেই চাকরী অরবিন্দ পেয়েছে জানার পর একদম ভাল লাগছে না। চারপাশটা কি রকম যেন অসহ্য লাগছে। নিজেকে মানুষ ভাবতে ঘৃণাবোধ হচ্ছে এখন। অরবিন্দর কাছে না এলে অন্তত ওর ধারণায় থাকত চাকরীটা ওর চেয়ে যোগ্য কেউ পেয়েছে। কিংবা এমন কেউ যার ওর মতই বা ওর চেয়েও বেশী প্রয়োজন এই চাকরীর।

'চলি অরবিন্দ—!' বলেই মনীশ বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে।

দাঁড়া দাঁড়া! এক মিনিট--'

অরবিন্দর ডাকে দাঁড়িয়ে পড়ল মনীশ।

অরবিন্দ মনীশের মুখের দিকে তাকিয়েছিল এতক্ষণ। কাছে এসে বলল, 'তুই আনএমপ্লয়েড? চাকরীর জন্য ফরেন যেতে চাস? হোয়াই? এখানে চাকরী করবি?'

মনীশ অরবিন্দর মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে রইল।

অরবিন্দ টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ার খুলে সোয়াব কোম্পানীর খামটা বের করল। তারপর মনীশের কাছে এসে এগিয়ে দিয়ে বলল 'নে এই অ্যাপয়েন্ট মেন্ট লেটারটা নিয়ে তামিয়ায় চলে যা। জয়েন দেয়ার অ্যাজ অরবিন্দ সেন।'

মনীশ একবার খামটার দিকে তাকাল তারপর অরবিন্দর দিকে। ওর চোখে হেঁয়ালীর ছায়া।

'ভাবছিস কি?' অরবিন্দ খাম সুদ্ধ হাত খানা নামিয়ে বলল, 'তুইও বেঁচে যাবি আমিও বাঁচব। এই চাকরীটা করার আমার মোটেই ইচ্ছে নেই। তার চেয়ে এই দু-মাস আমি রঞ্জনার সঙ্গে বম্বেতে কাটাব। অনেক কাজ হবে। আর তামিয়ায় তোকে চিনছে কে?'

'অরবিন্দ—!' মনীশ রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস?'

'একদম না। আয় অ্যাম সিরিয়াস ম্যান!' অরবিন্দ স্বরে গাম্ভীর্য এনে বলল, 'তোর মুখের দিকে তাকিয়ে প্ল্যানটা এল মাথায়। মনে আছে, কলেজে আমাদের দুজনকে অনেকে দু-ভাই বলত? হোয়াই? আমাদের নাক আর মুখের এই পোরশন—' নিজের চিবুক ও ঠোঁটের চারপাশ দেখিয়ে বলল অরবিন্দ, 'অলমোস্ট সেম। আয় আয় 'বস্ এক মিনিট —'

অরবিন্দ মনীশের হাত ধরে ওকে চেয়ারের কাছে টেনে আনল। তারপর ড্রয়ার খুলে বের করল নিজের একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো।

'এই দ্যাখ—!' ফটোটা মনীশের চোখের সামনে নিয়ে এসে বলল. 'এই ফটো এখানে সোয়াব কোম্পানীর অফিসে সাবমিট করেছি। তোকে শুধু চোখে একটা ফটোক্রোমেটিক চশমা পরতে হবে। আর মাথার চুল আমার মত বাড়ানো চাই। ব্যস—ইউ আর অরবিন্দ সেন!'

মনীশ ঘোরের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অরবিন্দর চোখের দিকে। মুখে কোনো কথা নেই, ভাবও নেই।

'তোর চশমা আর মাথার উইগের ব্যবস্থা আমি করে দেব—!' অরবিন্দ আরো উৎসাহ

নিয়ে বলল, 'এই অফিসে আমার সার্টিফিকেটস দেখানোর পর্ব শেষ। তোকে শুধু আমার সিগনেচারটা একটু প্র্যাকটিস্ করতে হবে। অ্যান্ড ইট ইজ নট ইওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যে হুবহু মেলা চাই। সবচেয়ে বড় কথা, হেড অফিস এখানে আর কারখানা কোথায় ? দেড় হাজার মাইল দূরে। এ ভেরী ভেরী অড প্লেস। কেউ যাবে না সেখানে তোকে চিনতে। নো বডি উইল বদার ইয়ু।'

'অরবিন্দ--!' শেষ পর্যন্ত না জিজ্ঞেস করে পারল না মনীশ, 'আমাকে এই চাকরীতে ঢোকাতে এত উৎসাহী কেন তুই ?'

'সোজা কথা! ওই জঙ্গলে যাবার আমার কোনো ইচ্ছে নেই। আমার ফ্ল্যাইট বম্বে থেকে। শপিং বম্বেতে। রাইট নাউ মায় প্রেজেন্স অ্যাট বম্বে ইজ মোর নেসেসারি, কিন্তু আমি চাকরীতে জয়েন না করলে মাম্মি সব জানতে পেরে যাবে।'

'কি করে ?'

'মাম্মির অনেক কানেক্শনস্। ইনফ্লুয়েন্সও সাংঘাতিক। অ্যান্ড ইফ সি কামস টু নো আমার ফরেন যাওয়া ফর দ্য টাইম বিয়িং বন্ধ হয়ে যেতে পারে।'

'তোর ফরেন যাওয়ার ব্যাপারে এত বিরোধী কেন তিনি ?'

'হা—!' মনীশ মাথা ঝাঁকাল। কোমর ডান দিক বাঁ দিক ঘুরিয়ে একটা আড়মোড়া ভেঙ্গে বলল, 'দাদা দুবছর আগে স্টেটস-এ গিয়েছিল। গত বছর এইডস-এ মারা গেছে। —মাম্মির এত সম্পত্তি এখন ভোগ করবে কে বল ? তাই মাম্মি আমাকে—। নো মোর কোশ্চেনস মনীশ। আর ভাবিস না। চলে যা! তোরও তো চাকরীর দরকার।'

'হ্যাঁ দরকার!' মনীশ থমথমে মুখে ম্লান স্বরে বলল, 'কিন্তু তুই এভাবে আমাকে চাকরী দিচ্ছিস ? আমাকে চোর বানাতে চাস ?'

মনীশের মুখ কঠিন হয়ে এল।

'বেশ। করিস না তাহলে'—অরবিন্দ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিরক্ত স্বরে বলল, 'তোর উপকার করতে চেয়েছিলাম। তার সাথে আমারও উপকার একটু হত।—শোন্ অত এথিকস্ মেনে চললে জীবনে কিস্সু করতে পারবি না। যা সাধু হয়ে সৎ পথের ধুলোয় লুটোপুটি খা গিয়ে। দাঁড়াতে হবে না কখনো।'

অরবিন্দ বিরক্ত মুখে ঘরের কোণে গিয়ে কেবিনেট থেকে পেস্ট-টুথব্রাস বের করতে ব্যস্ত হল।

কয়েক মুহূর্ত পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল মনীশ। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নড়েচড়ে বলল, 'চলি অরিবিন্দ!'

দ্রুত পায়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মনীশ।

সাড়ে দশটা নাগাদ ইস্টার্ন বাইপাসের বাস স্টপে নামল মনীশ। এখন একটু খিদে পেয়েছে। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল সে।

পাড়ার মোড়ে পৌঁছতেই পাশের বাড়ির বারো বছরের বাপি বন্ধুদের সঙ্গে বল খেলতে খেলতে মনীশকে দেখে ছুটে এল।

'মনীশদা—লীলাদি, কাকাবাবু আর দাদা কাকিমাকে নিয়ে হাসপাতালে গেছে। তোমাকে বাড়িতে থাকতে বলেছে। কোন্ হাসপাতালে গেছে বলে যাবে এসে।'

মা আবার হাসপাতালে! আতঙ্কে মনীশের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। উদগ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে মার ?'

'ভীষণ রক্ত পড়েছে।' বাপি বলল, 'আমিই কাকাবাবুকে খবর দিতে গিয়েছিলাম। ওরা ট্যাক্সিতে করে চলে গেছে।'

'কখন ?'

'অনেকক্ষণ হয়েছে। তুমি বাড়িতে যাও মনীশদা।' বলতে বলতে বাপি আবার খেলতে চলে গেল।

মনীশ খানিকক্ষণ মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে বেলেঘাটা মেন রোডের বাসস্টপের দিকে তাকিয়ে থাকল। শিয়ালদার দিক থেকে পর পর দুটো বাস এল। কিন্তু পরিচিত কেউ নামল না। চিন্তিত পদক্ষেপে বাড়ির দিকে এবার এগোলো সে। আর কিছুক্ষণ দেখা যাক। তা নাহলে কোন্ কোন্ হাসপাতালে ছুটবে মনীশ!

হাঁটতে হাঁটতে পা দুটো বার বার কেঁপে উঠছে ওর। ভাল লাগছে না একদম। এই তো মাত্র তিন-সপ্তাহ আগে মা হাসপাতালে ছিল, আবার এর মধ্যেই যেতে হল ? ভীষণ রক্ত পড়েছে! তার মানে কি খুব খারাপ অবস্থা ? কে জানে! মায়ের ক্যানসার ডিটেকশনের পর থেকেই মনীশ মনোবল একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। এখন একটুতেই আঁতকে ওঠে। উৎকন্ঠায় আনচান করে ওঠে বুক। আজকের ঘটনা শুনে চরম বিপদের আশঙ্কাটাই উঁকি মারছে মনে।

কান্নাটা বুকে চেপে পাশের বাড়ি থেকে চাবী নিয়ে বাড়িতে ঢুকল মনীশ।

বাইরের ঘরে মা'র বিছানা বেশ আলুথালু। একটু এগোতেই দেখল, চাদরে রক্তের দাগ। মেঝেতেও নিশ্চয়ই রক্ত পড়ে ছিল। মোছা হয়েছে। তবে এদিক ওদিক কিছু ছিটে ফোঁটা এখনও রয়ে গেছে। মনীশের বুক শিরশির করে উঠল। ভেতরে যেন ঘূর্ণীঝড় বইছে।

পাশের ঘরে ঢুকল মনীশ। মাটিতে মাদুরের ওপর নজর পড়তে থমকে গেল। লীলা মাদুরে বসেই পড়াশোনা করে। বই পত্র ছড়ানো। পেন খাতা। তার মধ্যে একটা খাতা আর একটা বই ফালি ফালি করে ছেঁড়া।

মনীশ বিস্মিত চোখে নীচু হয়ে ছেঁড়া বইটা তুলে দেখল, লীলার ইংরেজী বই। খাতাটাও ইংরেজীর। গত রাতে পড়াতে পড়াতে মনীশ ইংরেজীর কিছু কাজ দিয়েছিল লীলাকে। লীলা তাই বোধহয় করছিল বসে বসে। কিন্তু এখন বই আর খাতা দুটোই সম্পূর্ণ ছেঁড়া। কেউ যে ইচ্ছে করে ছিঁড়েছে বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট। কিন্তু কে ছিঁড়ল ? কেন ?

বাইরের দরজায় শব্দ হল।

মনীশ সঙ্গে সঙ্গে বই খাতা মাদুরের ওপর ফেলে বেরিয়ে এল পাশের ঘরে। বাপির দাদা গৌতম এসেছে।

'গৌতম!'

'মনীশদা, কাকিমাকে নার্সিং হোমে ভর্তি করতে হল।'

'নার্সিং হোম! কেন?'

'নীলরতন ওভার ক্রাউডেড। জায়গা নেই। মেডিকেলে কাদের যেন স্ট্রাইক চলছে অ্যাডমিশন বন্ধ। কাকাবাবু শম্ভুনাথ অব্দি যেতে সাহস পেলেন না। ওয়েলিংটনের ধর্মতলা নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিয়েছেন। এখন ব্যাড চাই—এই নাও চিঠি।'

গৌতম পকেট থেকে চিঠিটা বের করে দিল।

অধৈর্য হাতে চিঠিখানা নিয়ে খুলে পড়ল মনীশ।

মনীশ,

চিন্তা করো না। নার্সিং হোমে ভর্তি করেছি যখন সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এক হাজার কি আটশো যা টাকা যোগাড় করতে পার নিয়ে চলে এস। যদি দু-তিন ঘণ্টা দেরীও হয় ক্ষতি নেই। আমরা এখানে আছি।

কাকাবাবু।

নীচে নার্সিং হোমের নাম ও ঠিকানা।

এক হাজার, আটশ টাকা! এখন কোথায় পাবে মনীশ?

'মনীশদা,—!' গৌতম বলল, 'আমাকে কলেজে যেতে হবে। যাই?'

'হ্যাঁ, এস গৌতম।' মনীশ কৃতজ্ঞতার স্বরে বলল, 'তোমরা ছিলে বলে মা বোধহয় এ যাত্রা রক্ষে পেল।'

'আমি বিকেলে একবার নার্সিং হোমে যাব, চিন্তা করো না।' গৌতম চলে গেল।

মনীশ আবার পাশের ঘরে ঢুকল। টেবিলের কাছে গিয়ে দেরাজ খুলে বের করল ওর সঞ্চয়ের পাত্র। লজেন্সের পুরোনো একটা বাক্স। ঢাকনা খুলে কাগজের তলায় টাকাগুলো গুনে দেখলো, একশ চব্বিশ। আরো অন্তত সাতশো কি আটশ চাই। ব্যাকুল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকালো মনীশ। টেবিলের ওপর পয়সার একটা ভাঙ্গা ভাঁড় পড়ে আছে। লীলার সঞ্চয় ছিল ওটা। পাঁচ পয়সা দশ পয়সায় কত আর হবে। তাই নিয়ে চলে গেছে লীলা।

ঘরে আর কি টাকা আছে?

মনীশ কোণের তোরঙ্গর কাছে গিয়ে তার ওপরে মায়ের বাক্সটা দেখল। তালা দেওয়া। চাবী মা'র আঁচলে আছে। টাকা অবশ্য বাক্সে থাকার কথা নয়। তাহলেও চাবী থাকলে দেখা যেত।

ইন্দ্রনাথকাকুর কাছে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। দু-সপ্তাহ আগেই মা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে শুনে দুশো টাকা দিয়েছেন। জোর জবরদস্তি। এভাবে টাকা নিতে একদম ভাল লাগে না মনীশের। ওর আত্ম-সম্মানে ভীষণ লাগে।

তাহলে কি করা যায় এখন?

মনীশ অস্থির পদক্ষেপে আবার টেবিলের কাছে এল। তখনই ওর নজরে পড়ল ভাঙ্গা ভাঁড়ের তলায় মায়ের চাবীর গোছাটা রাখা। লীলাই হয়ত রেখে গেছে।

মনীশ দ্রুত হাতে গোছাটা তুলে ছুটে এল মায়ের বাক্সের কাছে।

বাক্স হাতড়ে মাত্র একাশী টাকা পাওয়া গেল। আর কাঠের একটা শূন্য সিন্দুরের কৌটোয় এক ছড়া সোনার হার। মায়ের গয়নার শেষ সম্বল। মা একবার বলেছিল 'লীলার বিয়ের জন্য এইটুকু যেন থাকে। এতে কখনো হাত দিস্ না মনীশ। তোর বাবার দেওয়া উপহার। মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে।'

এখন ভাবনার আর সময় নেই। মায়ের জীবন আগে। হারের ছড়াটা কাগজে মুড়ে পকেটে ঢুকিয়ে নিল মনীশ। বিক্রী করবে না, বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা যদি পাওয়া যায়।

বাক্সে আবার চাবী লাগিয়ে গোছাটা টেবিলের ওপর রেখে মনীশ ছুটল বাইরের ঘরের দিকে?

ধর্মতলা নার্সিং হোম। বিকেল তিনটে।

গায়ত্রীকে রক্ত দেওয়া হচ্ছে। এক বোতল দেওয়া হয়ে গেছে। এখন দ্বিতীয় বোতল শুরু হয়েছে। অ্যাটেন্ডিং ডাক্তারবাবু বলেছেন চিন্তার কোনো কারণ নেই। সংকট কেটে গেছে।

বাইরে লাউঞ্জে কাকাবাবু ও লীলা সোফায় বসে। কাকাবাবুর নির্দেশে মনীশ কিছু খাবার কিনতে গেছে বাইরে। সেই সকালের জলখাবারের পর লীলার আর কিছু খাওয়া হয়নি। কাকাবাবুরও তাই। মনীশের তো আজ পেটে কিছুই পড়েনি। সেটা কেউ জানে না।

মনীশ এক হাতে কচুরীর ঠোঙা আরেক হাতে মিষ্টির বাক্স নিয়ে ঢুকল।

মিষ্টির বাক্সটা কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'কাকাবাবু—'

কাকাবাবু মুখ তুলে বললেন, 'আগে তোমরা ভাই-বোনে খেয়ে নাও। আমি পরে খাচ্ছি।'

মনীশ লীলার দিকে তাকাল, 'আয় লীলা!'

লীলা কালো থমথমে মুখ নিযে বসেছিল। ধীরে ধীরে উঠে এল সোফা থেকে। তারপর দাদার পিছু পিছু বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

বারান্দার কোণে গিয়ে লীলা রেলিঙের দিকে মুখ করে দাঁড়াল।

মনীশ ঠোঙাটা বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। 'লীলা নে খা!'

লীলা নীরব নিথর। কিছু বলল না ঘুরলও না। দাঁড়িয়ে রইল অন্য দিকে মুখ করে। হঠাৎ মনীশ বুঝতে পারল। ঝুঁকে সঙ্গে সঙ্গে তাকাল লীলার মুখের দিকে।

লীলার গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। চোখ দুটো অশ্রুতে টইটুম্বুর।

'লীলা!' ঠোঙা এক হাতে ধরে মনীশ আরেক হাতে লীলার চিবুক ধরল—'কি হয়েছে? মা তো এখন ভাল, অনেক সুস্থ।'

'দাদা!' লীলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দাদার বুকে মাথা ঠেকিয়ে বলল, 'আজকে মায়ের এই অবস্থা আমার জন্য হয়েছে। আমি আর পড়ব না দাদা। পরীক্ষাও দেব না।'

'কেন, পরীক্ষার সঙ্গে এর কি হল?' মনীশ অবাক।

'আজ সকালে অঞ্জু পিসি এসেছিল।' লীলা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মা নাকি অঞ্জু পিসির কাছ থেকে আমার পরীক্ষার ফি আর বই কেনার টাকা ধার নিয়েছে। সেই টাকা সময়মত ফেরত দেয়নি বলে মাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে গেল। —বলেছে— তোদের যখন এই অবস্থা, সামান্য টাকা শোধ দিতে পারিস না মেয়েকে পড়াচ্ছিস কোন্ মুখে—ঝিগিরি করতে পাঠাতে পারিস না। তাতে তো রোজগার হবে—টাকা ধার করতে হবে না—'

স্তব্ধ মুখে সব শুনল মনীশ। লীলা ওর বুকে মুখ রেখে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে আবার বলল. 'তোকেও যা তা বলে গেছে। বলেছে শিক্ষিত ছেলে নিজের কোনো মুরোদ নেই, মা'কে ধার করতে পাঠায়। তারপরেই মা মাথা ঘুরে খাট থেকে পড়ে যায়। —আমি জানতাম না দাদা, মা যে আমার পরীক্ষার ফি ধার করে দিয়েছে, বই কিনেছে ধার করে—'

মনীশ লীলার ছেঁড়া ইংরেজী বই ও খাতার রহস্যটা এতক্ষণে বুঝতে পারল। মা'কে অপমানিত হতে দেখে লীলা তীব্র ক্ষোভে দুঃখে নিজেই ছিঁড়েছে ওগুলো।

মনীশ ছোটো বোনের কান্না ভেজা মুখটাকে বাঁ হাতে নিজের বুক থেকে তুলে পরম স্নেহজড়িত স্বরে বলল, 'লীলা খেয়ে নে আগে। তোর কথা পরে শুনব। নে—'

মনীশ ঠোঙাটা খুলে এগিয়ে দিল লীলার দিকে।

'না দাদা। আমি খেতে পারব না। অঞ্জুপিসি যখন বলছিল ব্যাথায় কুঁকড়ে উঠছিল মা'র মুখ। ওই মুখ বার-বার মনে পড়ছে এখন। আমি পারব না খেতে।' লীলা আবার দাদার বুকে ডুকরে কেঁদে উঠল।

'লক্ষীটি লীলা খেয়ে নে!' মনীশ ছোটো বোনের মুখ জড়িয়ে ধরল। ওর মাথায় কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তুই না খেলে আমি খাব কি করে?'

'আমার খিদে নেই। তুই খেয়ে নে! লীলা শাড়ীর আঁচলে মুখ মুছে রেলিঙের দিকে মুখ করে বলল, 'মা সুস্থ হয়ে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত আমি খেতে পারব না।'

'ডাক্তারবাবু তো বলেছেন—' মনীশ লীলার দিকে ঝুঁকে বলল, 'রক্ত দেওয়া হয়ে গেলে মা'কে আজকেই আমরা বাড়ি নিয়ে যেতে পারব। আর কাঁদিস না লীলা বিপদ কেটে গেছে।'

'এই বিপদ আমার জন্যই এসেছে।' লীলা আবার ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমার জন্য মা যদি টাকা ধার না করত, আজ এই ঘটনা ঘটত না। দাদা, আমি আর পড়ব না। এখন কাজ করব। আয়া-টায়ার যে কোনো কাজ। মাকে আমি আর হেনস্থা হতে দেব না।'

রেলিঙের পিলারে মাথা ঠেকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে লীলা।

মনীশ অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে। জোরে জোরে নিশ্বাস বইছে ওর বুকে। ডান হাতের ঠোঙা আর খাতাটা পাশে জানলার ওপর রেখে লীলার দিকে এগিয়ে গেল। যা ভাবার এই কয়েক সেকেণ্ডেই ভেবে নিয়েছে মনীশ। লীলার দু-কাঁধ জড়িয়ে ওর মুখ নিজের মুখের দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'লীলা তোকে কাজ করতে হবে না। মা'কেও আর হেনস্থা হতে হবে না। আমি চাকরী পেয়ে গেছি, ভাল চাকরী।'

এ এক এমন সংবাদ লীলার কান্না থামবেই।

'পেয়ে গেছিস!' লীলা আদ্র' চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল। কোন্ চাকরী, যেটা সেদিন ইন্টারভিউ দিলি?'

'না ' মনীশ আলতো করে একটা ঢোক গিলল। চোখ নামিয়ে বলল, 'আর একটা। তবে এটাও খুব ভাল চাকরী। এক তারিখে জয়েন করতে হবে। আর চিন্তা নেই লীলা, তোর পড়া হবে। মায়ের চিকিৎসা হবে। সব হবে।'

'সত্যি!' অশ্রুসিক্ত মুখে খুশীতে হেসে উঠল লীলা, 'কাকাবাবুকে বলেছিস?'

'বলব। আজকেই তো জানলাম।' জানলাব ধার থেকে ঠোঙাটা তুলে কচুরী বের করে লীলার মুখে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে রে! তুই না খেলে আমি কিছুতেই খেতে পাবব না।'

লীলা দাদার চোখেব দিকে তাকাল। স্বপ্নে ভরা আহ্লাদিত দৃষ্টি ওর। তারপর দাদাব হাতেই খেতে শুরু করল।

খেতে খেতে উত্তেজিত লীলা দুহাতে জড়িয়ে ধরল দাদাকে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, 'ওফ্ দাদা, মা শুনলে যা খুশী হবে না! এই খুশীতেই মা ভাল হয়ে উঠবে দেখবি!'

লীলার কাঁধে মনীশের চোখ এক মুহূর্তের জন্য আদ্র' হয়ে আবার শুকিয়ে গেল। এতক্ষণে ওর বুক পাথরে পরিণত হল। পাথর না হলে পারত কি সে, নিজের শিক্ষা নিজের পরিচয় নিজের অস্তিত্ব এভাবে পদদলিত করতে?

অরবিন্দর চাকরীটা ওকে নিতেই হবে। এই সুযোগ হাতছাড়া করা নেই। তা না হলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কালো গহ্বরে কোথায় যে সে তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। একটা তো নয়, তিন তিনটে জীবনের প্রশ্ন।

তবে হ্যাঁ, এখন ওকে সাবধান হতে হবে সতর্ক হতে হবে। সেজন্যই সে লীলাকে বলল চাকরীটা সোয়াব কোম্পানীর নয়, অন্য।

আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে আরেকটা কচুরী সে হাসি মুখে এগিয়ে দিল ছোটো বোনের মুখের দিকে।

পরের দিন সকাল।

যোধপুর পার্কে অরবিন্দদের বাড়িতে আড়ষ্ট পায়ে প্রবেশ করল মনীশ। কলিং বেল টিপ্তে মধ্যবয়সী এক চাকর বেরিয়ে এল।

'অরবিন্দ আছে?' মনীশ জিজ্ঞেস করল।

চাকরটি যথারীতি দেখিয়ে দিল দোতলার সিঁড়ি। দেখিয়েই সে চলে গেল ভেতরে।

মনীশ ধীরপায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে অরবিন্দর ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। ভ্যাজানো দরজা। ভেতরে অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে। মনীশের মনে হল খিল খিল চাপা হাসির সাথে কারো যেন গোঙানির আওয়াজ।

মনীশ একটু ভীত স্বরে ডাকল, 'অরবিন্দ।'

হঠাৎ ভেতরে থেমে গেল শব্দটা। তারপরেই দরজা খুলে সেদিনের সেই যুবতী পরিচারিকাটি বেরিয়ে এল। ওর আলুথালু কেশ। মনীশের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে শাড়ীর লুটোনো আঁচল একহাতে বুকে আটকে সিঁড়ির দিকে ছুট দিল সে।

অরবিন্দ বেরিয়ে এল বাইরে। খালি গা, পরনে সেই শর্ট প্যাণ্ট।

বিরক্ত মুখে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার মনীশ!'

মনীশ অপ্রস্তুত। মেয়েটিকে ওভাবে বেরোতে দেখে ঘেমে উঠেছিল ওর মুখ। দুরু দুরু বুকে বলল, 'তোর সঙ্গে কথা আছে অরবিন্দ।'

'আয়!' অরবিন্দ ঘুরে পা বাড়াল ভেতরে।

মনীশ একটু দাঁড়িয়ে প্রায় টলতে টলতে ঢুকল ঘরে। রাম-এর গন্ধে তখন ভরপুর ছিল ঘরটা।

তামিয়া। হিমাচল প্রদেশ।

শিমলা থেকে একাত্তর কিলোমিটার দূরে পাহাড় বেষ্টিত একটি ছোট্টো গ্রাম। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে তামিয়ার উচ্চতা চার হাজার পাঁচশ ফিট।

উত্তরে তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গের পটভূমিতে তামিয়ার সৌন্দর্য অপূর্ব। শৃঙ্গের দিক থেকে একটি সরু খরস্রোতা নদী এসে গ্রামের পাশ দিয়ে শিমলা-মাণ্ডী হাইওয়ের দিকে চলে গেছে।

শিমলা-মাণ্ডী হাইওয়ে থেকে তামিয়ার দূরত্ব আঠাশ কিলোমিটার। নদীর নামও তামিয়া। নদীর নামেই গ্রামের নাম।

নদীর এক পাশে পাহাড়ের কোলে ঘন সবুজ বন। আরেক পাশে পুরনো বসতি। তামিয়ার আদি অধিবাসীদের গোটা তিরিশেক কুঁড়ে ঘর। এই বসতির আরো দক্ষিণে সোয়াব কোম্পানীর ইলেকট্রনিক ঘড়ির কারখানা। কারখানার শেড-সংলগ্ন কোম্পানীর দোতলা অফিস বাড়ি। এই বাড়ির আরো দক্ষিণে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে কারখানার কর্মচারী আর অফিসারদের কোয়ার্টার।

তামিয়া পোস্ট অফিস, কোম্পানীর অফিস-বাড়ির পেছনদিকে। এক তলার একটি ঘরে একজন পোস্ট মাস্টার, একজন বাবু ও একজন পিওন নিয়ে ছোট্টো অফিস। তামিয়ার সব নিয়ে বসতি মাত্র পাঁচশ চল্লিশ। চিঠি-পত্রের এখানে যা আদান-প্রদান তা এই তিনজনেই সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন হয়। অবশ্য এই সুষ্ঠ পরিচালনার মূলে প্রধান ব্যক্তি পোস্ট মাস্টার গোবিন্দভূষণ শর্মা। তিনি সারা তামিয়ায় শর্মাজী নামে পরিচিত। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স। মাঝারী স্বাস্থ্য, সৌম্য চেহারা।

শর্মাজী ও তাঁর সহকারী বাবু মাঝবয়সী রামস্বরূপ সিরধী এ মুহূর্তে মানি অর্ডার রিসিট বুক ও স্ক্রোল বুক আগামী কালের জন্য প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। আগামীকাল পয়লা তারিখ। সোয়াব কোম্পানীর মাইনের দিন। এই দিন এই পোস্ট অফিসে বিভিন্ন কর্মচারীদের বাড়িতে টাকা পাঠানোর ধুম লেগে যায়। যাতে হিমশিম না খেতে হয় তার জন্য প্রাকব্যবস্থা চলছে এখন শর্মাজীর টেবিলে।

যুবক পিওন উধো সিং এক কোণে শিমলা থেকে সদ্য আগত চিঠিগুলো শর্ট করে তামিয়ার শীল মারতে ব্যস্ত।

এখন বাজে দুপুর একটা। তামিয়ার আকাশ আজ বেশ উজ্জ্বল। নির্মেঘ নীলাকাশের নীচে রোদে ঝলমল করছে চার পাশ। পোস্ট অফিসের জানলা দিয়ে কারখানার শেডের পেছনে দেখা যাচ্ছে রুপোলী তুষারাবৃত শৃঙ্গ। জানুয়ারী মাস শেষ হতে চললেও এ মুহূর্তে হাওয়ার শীতের তীব্রতা একটু কম।

উধো সিং শীল মারতে মারতে হঠাৎ বলে উঠল, 'শর্মাজী আপনার চিঠি—'

শর্মাজী টেবিল থেকে মুখ তুলে তাকালেন। উধো সিং টেবিলের কাছে এসে ইনল্যাণ্ডটা এগিয়ে দিল তার দিকে।

শর্মাজী হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, রাজেশের চিঠি। রাজেশ সাহানী। স্ট্যাম্পের ওপর দিল্লীর সতেরো তারিখের মোহর। আজ একত্রিশ তারিখ।

'রামস্বরূপ—' শর্মাজী ইনল্যাণ্ডটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন, 'দিল্লী থেকে চোদ্দো দিনে এল। লোকে আমাদের বিরুদ্ধে বলে। আমি কার বিরুদ্ধে কাকে বলব ?'

'আপনি আমাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরকে বলুন।' রামস্বরূপবাবু হেসে বললেন, 'যারা এই দেরীর পেছনে আছে তাদের ঈশ্বর না শোধরাতে পারলে আর কেউ পারবে না।'

শর্মাজী তখন চিঠিটা পড়ছেন। রাজেশ লিখেছে—

চাচা শর্মাজী—

আপনার ও গুড়িয়ার চিঠি যথা সময়ে পেয়েছি। পনেরো দিন হল দিল্লীতে আছি। যদিও নিজেদের বাড়ি, কিন্তু এখন আপনাদের জন্য মন কেমন করছে। গুড়িয়ার জন্য ওর বৌদিও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা তিরিশ তারিখ ট্রেনে রওনা হচ্ছি। একত্রিশে তামিয়া পেঁছব। আর কি ? প্রণাম নেবেন। গুড়িয়াকে আমার ভালবাসা দেবেন।

-- রাজেশ।

ইনল্যাণ্ডের আরেক দিকে গুড়িয়াকে লেখা রাজেশের স্ত্রীর চিঠি। চিঠিটা না পড়ে ইনল্যাণ্ডটা মুড়ে শর্মাজী বলে উঠলেন, 'দেখেছো কাণ্ড! আজকেই রাজেশরা এসে পেঁছোচ্ছে আর আজকেই চিঠিটা এল।—উধো দেখ্‌ তো ভাই, গুড়িয়া কি আসছে! না এলে তুই ছুটে চিঠিটা দিয়ে খাবারটা নিয়ে আয়। রাজেশরা যে কোনো সময়ে পেঁছতে পারে। ওদের জন্য কিছু খাবার বানিয়ে রাখা উচিত।'

উধো সিং শীলমোহর ছেড়ে শর্মাজীর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে বাইরের দরজার দিকে দৌড়োলো। দক্ষিণের পাহাড়ের কোলে শর্মাজীর কোয়ার্টার। সোয়াব কোম্পানীই দিয়েছে। গুড়িয়া রোজ দুপুরে কোয়ার্টার থেকে বাবার জন্য খাবার দিতে আসে। অফিস কম্পাউণ্ড থেকেই দেখা যাবে গুড়িয়া আসছে কিনা।

'ইস্‌ চিঠিটা যদি কালকেও আসত।' শর্মাজী দুঃখ করে বললেন, 'আজ গুড়িয়া ওদের জন্য রেঁধে রাখতে পারত। রামস্বরূপ! কখন ওরা আসতে পারে বলতো ?'

রামস্বরূপবাবু হিসেব করতে করতে বললেন, 'ট্রেনে আসছে যখন শিমলায় পেঁছবে এগারোটায়। তারপর টোঙ্গীর বাস—তিনটের মধ্যে পেঁছে যাবে।'

উধো সিং ফিরে এল। 'শর্মাজী, গুড়িয়া দিদি আসছে—'

'ঠিক আছে—।' শর্মাজী ওর হাত থেকে ইনল্যাণ্ডটা নিলেন।

রামস্বরূপবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, 'একটা পাঁচ, গুড়িয়া রাণী যে আসছে জানা কথা।'

রামস্বরূপবাবু শর্মাজীর টেবিলে কাগজ-পত্র গুছিয়ে নিলেন। এই টেবিল এখন পরিষ্কার করে দিতে হবে। গুড়িয়া খাওয়াবে তার বাবাকে।

শর্মাজীর শরীরের ডান অংশ পুরো প্যারালিসিস। তবে তিনি চেয়ারে বসে বাঁ হাতে

দিয়ে এমন ভাবে কাজ করেন যে কেউ এক নজরে বুঝতে পারে না। তাঁর ডান হাত টেবিলের ওপর এক ধারে স্থির ভাবে রাখা থাকে।

দু-মিনিট পরেই পুব দিকের জানলা দিয়ে দেখা গেল গুড়িয়া আসছে। ওর ডান হাতে টিফিন ক্যারিয়ার।

যদিও গুড়িয়ার পরনে এখন শাড়ী। বয়সও ওর উনিশ। উচ্চতা মাঝারী। মাথায় ঢেউ খেলানো চুল। কিন্তু হাবে ভাবে কথাবার্তায় মনে হয় যেন বারো বছরের বালিকা। হাতে টিফিন ক্যারিয়ার দোলাতে দোলাতে জানলা দিয়ে বাবাকে দেখতে পেয়ে ও বলতে শুরু করল—'পাপাজী পাপাজী—আমি এসে গেছি।'

শর্মাজী মৃদু হাসলেন।

গুড়িয়া জানলা পেরিয়ে ঘুরে দরজা দিয়ে ঢুকল।

গুড়িয়ার মুখের গঠন অপূর্ব। উন্নত নাক, পাতলা বিস্তৃত ঠোঁট। ত্রিকোণ কপাল। চোখের কোলে আর চিবুকের নীচে এমন সুন্দর ঢেউ খেলে গেছে যে মনে হয় মুখখানা সব সময় প্রচ্ছন্ন হাসিতে ভরপুর।

'কি ব্যাপার উধো ভাইয়া—'গুড়িয়া ঘরের ভেতর ঢুকে উধোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাপাজীর এত খিদে পেয়ে গেছে? তুমি দেখতে গিয়েছিলে আমায়—!'

'না পাপাজীর খিদে পায় নি।' শর্মাজী ইনল্যান্ডটা মেয়ের দিকে বাড়িয়ে বললেন, যাদের খিদে পেতে পারে তাদের জন্যই তোর কাছে পাঠাচ্ছিলাম।'

টিফিন ক্যারিয়ার টেবিলের ওপর রেখে গুড়িয়া ইনল্যান্ডটা হাতে নিল।

'ওমা! সঙ্গীতা ভাবীর চিঠি!' ইনল্যান্ডটা খুলে একবার বাবার চিঠির দিকটা দেখে নিজের চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

'সে কী! ভাবীজীরা তো আজকেই আসছে!' চিঠিখানা পড়ে বাবার দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল গুড়িয়া। তারপর দ্রুত টিফিন ক্যারিয়ার খুলতে খুলতে বলল, 'চটপট খেয়ে নাও বাবা। আমাকে বাড়ি গিয়ে কিছু রাঁধতে হবে।'

এর মধ্যে উধো সিং এসে শর্মাজীর টেবিলে একটা ম্যাট পেতে দিয়েছে। এখন দিচ্ছে জলের গ্লাস। তারপর একটা চেয়ার গুড়িয়ার পেছনে এগিয়ে দিল।

গুড়িয়া তার আগেই টিফিন ক্যারিয়ারের বাটিগুলো সাজিয়ে নিয়েছে টেবিলে।

ঘর সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে এসে চেয়ারে বসল বাবাকে খাওয়াতে।

শর্মাজী অনেকদিন বলেছেন, বাঁ হাতে কাজ করা যখন অভ্যেস হয়ে গেছে, তখন ে-ই হাতে খেতেও তিনি পারবেন।

কিন্তু গুড়িয়া কিছুতেই মানবে না। দু-বেলার প্রধান খাবার ও বাবাকে নিজের হাতে খাওয়াবেই।

শর্মাজীর স্ত্রী নেই। গুড়িয়ার দশ বছর বয়সে ধনুষ্টংকারে মারা গেছেন। তার তিন বছর পর শর্মাজীর ডান দিকের শরীরে এই পক্ষাঘাত হয়।

শিমলা বাস স্ট্যান্ড। সময় দুপুর দু'টো দশ।

টিকিট কাউন্টারের পাশে একটা বেঞ্চের ওপর রাজেশ ও তার স্ত্রী সঙ্গীতা বসে। দুজনেরই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত চেহারা। ওদের সামনে মাটিতে রয়েছে একটা সুটকেশ আর বেঞ্চে দু-জনের মাঝখানে দুটো ব্যাগ।

রাজেশের বয়স বত্রিশ। মোটাসোটা খর্বকায় চেহারা। সঙ্গীতা ওর সমবয়সী স্বাস্থ্যবতী। তবে সুগৌরী ও সুন্দরী সে।

এ মুহূর্তে সঙ্গীতার মুখ খুব বিরক্ত। চোখের ওপর ভ্রূকুটি। নাক মুখ কোঁচকানো। রাজেশ নির্বিকার ভোলাভালার মত বসে।

'কত করে বললাম—' সঙ্গীতা তখন ঝাঁঝালো স্বরে বিড় বিড় করছে, 'টিকিটগুলো যত্ন করে রাখো। হারিও না। তা নাহলে আমাকে দাও। তা তো দিলই না, শেষ পর্যন্ত খুইয়েই বসলেন! ওফ্! এত কষ্ট আমার কপালেই ছিল!'

রাজেশ রুমালে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে মিন মিন সুরে বলল, 'হারাই নি সঙ্গীতা, বিশ্বাস করো। ওগুলো আমি যত্ন করেই রেখেছি। কিন্তু মনে করতে পারছি না কোথায় রাখলাম।'

তেড়ে উঠল সঙ্গীতা। ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'মনে পড়বে কি করে? খুব যত্ন করে রেখেছো যে! আমায় উদ্ধার করেছ!'

'আরে বাবা, শিমলায় এসে তো পৌঁছেছি, এত চটছ কেন?'

সঙ্গীতা ফোঁস করে উঠল, 'চটব না? বাবা এক মাস আগে ট্রেনের রিজার্ভেশন করে দিলেন—সেই টিকিট তুমি হারিয়ে ফেললে? তার জন্য বাসে আসতে হল! সেই বাস আবার খারাপ?'

রাজেশ এবার কিছু বলল না। নির্লিপ্ত নিশ্চল বসে।

সঙ্গীতার রাগ তখনো প্রশমিত হয়নি। বকে চলেছে, 'হুঁ এসে পৌঁছেছি!—হ্যাঁ এসে পৌঁছেছি তবে জ্যান্ত নয় লাশ হয়ে। মাঝরাতে রাস্তায় তিন ঘণ্টা বসে। না জল না খাবার। কোথায় সুখে আসতাম রিজার্ভ স্লিপারে। আসতে হল রিফিউজিদের মত।'

রাজেশ নীরব। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে অন্য দিকে তাকিয়ে। তাতে সঙ্গীতার রাগ আরো বৃদ্ধি পেল। মাথায় হাত চাপড়ে তিক্ত স্বরে বলে উঠল, 'কি দুর্ভোগ ছিল আমার কপালে! তাই ভুলোমনের একটা হাবাগোবা স্বামী জুটেছে।'

রাজেশ ঘুরে নত হয়ে নাটকীয় স্বরে বলল, 'আমি তা সর্বান্তকরণে স্বীকার করি সঙ্গীতা। এ ব্যাপারে আমার মত সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই।'

সঙ্গীতা কটমট করে তাকাল।

রাজেশ সেই মুখের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, 'রাগলে হাবাগোবা স্বামীর সুন্দরী বউকে আরো সুন্দরী দেখায়।'

সঙ্গীতা তির্যক দৃষ্টি হেনে তাকাল আবার। তবে ওর ঝাঁঝালো মুখ এখন ক্রোধ আর প্রচ্ছন্ন হাসির মাঝে দুলছে।

পাশের কাউন্টারে কে যেন তখন বলছে, 'দয়া করে বলবেন তামিয়া কি করে যাব ?'

তামিয়া! রাজেশ হাসি থামিয়ে ঘুরে তাকাল। অনুসন্ধানকারী এক যুবক। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, চোখে আবছা কালো চশমা।

তামিয়ার সবাই রাজেশের পরিচিত। কিন্তু এ কে? যুবকটিকে কাউন্টারের লোক কি বলল কে জানে? কিন্তু সে কাউন্টার থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক।

রাজেশ বেঞ্চ থেকে উঠে ওর কাছে গেল।

'তামিয়া যাবেন ?' রাজেশ জিজ্ঞেস করল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' মনীশের নম্র জবাব।

'টোঙ্গীর টিকিট কাটুন! ওখান থেকে তামিয়ার জীপ পাবেন।'

'টোঙ্গী ?' মনীশ আবার জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ টোঙ্গী।' রাজেশ বলল।

মনীশ কাউন্টার থেকে টিকিট নিয়ে ঘুরে রাজেশের দিকে তাকাল, 'অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে—'

'তামিয়ায় কার কাছে যাবেন ?' রাজেশের পরবর্তী প্রশ্ন।

'কারো কাছে নয়।' মনীশ টিকিট ও ফেরত পয়সা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'তামিয়ায় জয়েন করব সোয়াব কোম্পানীর অফিসে।'

'অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ?'

'হ্যাঁ।' মনীশ বিস্ময়ের স্বরে বলল, 'আপনি—?'

'আমি তামিয়ারই বাসিন্দা। সোয়াব কোম্পানীর অ্যাসিস্টেণ্ট অ্যাকাউণ্টস অফিসার, রাজেশ সাহানী।' রাজেশ হাসতে হাসতে হাত বাড়াল।

করমর্দন করল মনীশ। হাতটা একটু কেঁপে উঠল ওর। কাঁপা স্বরে বলল, 'আমার নাম অরবিন্দ সেন।'

'আসুন! আসুন!' উচ্ছ্বসিত রাজেশ হাত ধরে মনীশকে টেনে আনলো বেঞ্চের কাছে। 'সঙ্গীতা—!'

সঙ্গীতা ঘুরে তাকালো।

'আমার স্ত্রী।' রাজেশ পরিচয় করিয়ে দিল মনীশকে। তারপর সঙ্গীতার দিকে ঘুরে বলল, 'আমাদের অফিসের নতুন অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। আসার কথা চলছিল, মনে আছে ?'

সঙ্গীতা ঘাড় হেলিয়ে হ্যাঁ জানাল। রাজেশ মনীশকে দেখিয়ে বলল, 'ইনিই তিনি।'

সঙ্গীতা মিষ্টি হেসে হাত জোড় করে নমস্কার করল।

মনীশ হাতের সুটকেশ মাটিতে রেখে প্রতি-নমস্কার করে বলল, 'অরবিন্দ সেন।'

'যাক ভালই হল।' রাজেশ খুশীর স্বরে বলল, 'বাকী পথ তিনজনে মিলে সুন্দর যাওয়া যাবে।'

'ভাল তো আমার হল মিঃ সাহানী।' মনীশ হেসে বলল, 'এদিকে সব কিছুই আমার অচেনা। আর তামিয়া দেখছি আরো অজানা জায়গা।

'তামিয়া দু'বছর আগেও গণ্ডগ্রাম ছিল।' রাজেশ বলল, 'এখন সোয়াব কোম্পানীর দৌলতে তবু কিছু লোক জানতে পেরেছে। আপনি কোথা থেকে আসছেন মিঃ সেন?'

'কলকাতা।'

'আমরা দিল্লীর বাসিন্দা।' রাজেশ ঝুঁকে মনীশের সুটকেশটা তুলে নিজেদের মাল-পত্রের সঙ্গে রাখতে রাখতে বলল, 'বাস আর আধঘন্টা পর ছাড়বে। দেয়নি এখনো। —আচ্ছা, আপনি কলকাতা থেকে এখানে এলেন কি ভাবে? ভায়া দিল্লী নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।' মনীশ জবাব দিল, 'কালকা মেলে ভায়া দিল্লী কালকা। তারপর ছোটো ট্রেন। কালকা মেল চন্ডীগড়ে আড়াই ঘন্টা দাঁড়িয়ে ছিল, তাই দেরী হল আসতে।'

'কালকা মেলও দাঁড়িয়ে ছিল?' রাজেশ সঙ্গীতার দিকে ঘুরে বলল, 'দেখলে, আমাদের ওই ট্রেনেই রিজার্ভেশন ছিল। নাঃ, তোমার কপাল সত্যি খারাপ সঙ্গীতা। যেদিকেই যাও আমার মতই হাবাগোবা—। সেদিক দিয়ে ভাগ্যবান একমাত্র আমি—তাই তোমার মত সুন্দরী—'

সঙ্গীতা মনীশের সামনে অপ্রস্তুত হয়ে রাজেশের দিকে তীক্ষ্ম কটাক্ষ হানল।

রাজেশ আবার ওর স্বভাবসুলভ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল যেন। হাসতে হাসতে বলল, 'আরে মিঃ সেনের সামনে লজ্জা কি?' বলেই রাজেশ হঠাৎ ওর ডানহাত মনীশের কাঁধে জড়িয়ে বলল, 'আমরা এক কোম্পানীর কর্মচারী। এখন খুব কাছের লোক। কি বলেন মিঃ সেন?'

মনীশ মৃদু হাসল। রাজেশের খোলামেলা মন আর আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়ে ভাল লাগল ওর।

'ব্যাপারটা কি জানেন—' রাজেশ কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে বলল, 'আমরা দিল্লী থেকে বাসে আসছি। বাস রাস্তায় তিনঘন্টা খারাপ। অবশ্য আমি একটা গণ্ডগোল করে ফেলেছি, তাই আমার স্ত্রী বলছিল—'

'হয়েছে!' সঙ্গীতা হাত তুলে স্বামীকে বাধা দিয়ে বলল, 'তোমার স্ত্রী কি বলছিল আর তুমি কি বল, সব উনি কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবেন। এখন ওনাকে বসতে দাও। দেখছ না কিরকম টায়ার্ড।'

'সরি, বসুন, বসুন—' রাজেশ বেঞ্চের ওপর থেকে তাড়াতাড়ি ব্যাগদুটো নামাল নীচে।

'ব্যস্ত হবেন না প্লিজ—' মনীশ অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'আমি এমন কিছু টায়ার্ড নই।'

'যথেষ্ট টায়ার্ড।' সঙ্গীতা মনীশের মুখের দিকে তাকাল—'দেখেই বোঝা যাচ্ছে। খেয়েছেন কিছু?'

'হ্যাঁ খেয়েছি।'

'না। মনে হচ্ছে না!' সঙ্গীতা মাথা নাড়ল।

'আমি আসছি—'

রাজেশ হন হন করে হাঁটা দিল সামনে খাবারের দোকানগুলোর দিকে।

'শুনুন—!' মনীশ অপ্রস্তুত হল।

'আপনি বসুন না।' সঙ্গীতা বেঞ্চের ওপর হাত রেখে অন্তরঙ্গ স্বরে বলল, 'এখানে নতুন আপনি। কোথায় কি পাওয়া যায় বুঝবেন?'

মনীশের অস্বস্তি বাড়ল। জড়তা নিয়ে বসল বেঞ্চের এক পাশে।

'কলকাতায় কোথায় থাকেন?' সঙ্গীতা জিজ্ঞেস করল।

'বেলেঘাটা।' দুরুদুরু বুকে বলল মনীশ।

'বে-লে-ঘা-টা।' সঙ্গীতা ভাবতে ভাবতে বলল, 'জানিনা। তবে আমি কলকাতায় দু'বার গিয়েছি। ভবানীপুরে আমার মামা থাকেন।

মনীশ প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য জিজ্ঞেস করল, 'তামিয়ায় আপনারা কতদিন আছেন?'

'দেড় বছর।' সঙ্গীতা জবাব দিল, 'ও শুরু থেকেই আছে। আমি ছ'মাস পর এসেছি।'

'ভীষণ ঠান্ডা ওখানে। তাই না?'

'তা আছে।' সঙ্গীতা হাসল।

মনীশ তাকাল এদিক-ওদিক।

সঙ্গীতা বলল, 'জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর। চলুন না দেখবেন।'

'তামিয়া নামটাও খুব সুন্দর!' মনীশ বলল।

রাজেশ হাতে দুটো প্যাকেট নিয়ে পেঁছিল তখন।

'মিঃ সেন, আপনার বয়স কত বলুন তো?' এসেই প্রশ্নটা করল রাজেশ।

'কেন? চব্বিশ।' একটু থতমত খেয়ে জবাব দিল মনীশ।

'চব্বিশ!' দু'হাতে প্যাকেট নিয়ে আবার সজোরে হেসে উঠল রাজেশ। 'কিছু মনে করবেন না, কাঁচ মুখখানা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমার বয়স বত্রিশ। তার মানে আপনি আমার চেয়ে আট বছরের ছোটো। অবশ্য র‍্যাঙ্কে আমরা এক। তবু মিঃ সেন মিঃ সেন বলতে খারাপ লাগে। আমি আপনাকে রবীন্দ্রনাথ বলব আপত্তি আছে?'

'রবীন্দ্রনাথ!' মনীশের চোখ প্রায় কপালে উঠল।

'হল তো।' সঙ্গীতা ঘাড় বেঁকিয়ে মনীশের দিকে তাকাল, 'কি বলেছিলাম? কিছুক্ষণের মধ্যেই সব জানতে পারবেন।'

'কি জানতে পারবেন?' রাজেশ তাকাল।

'জানতে পারবেন তোমার ব্রেন যে একটু—' সঙ্গীতা ডান হাতের দুটো আঙুল স্ক্রুর মত ঘোরালো। ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি নাম ওনার?'

'কেন? রবীন্দ্রনাথ সেন।'

'না, অরবিন্দ সেন।' মনীশ কাঁচুমাচু মুখে বলল।

'ওহো সরি! ভেরী সরি!' রাজেশ একটা প্যাকেট মনীশের দিকে বাড়িয়ে

বলল, 'আসলে দুজনেই মণীষী বাংলার, তাই গুলিয়ে ফেলেছি। নাও ভাই অরবিন্দ।'

মনীশ মৃদু হেসে প্যাকেটটা নিল হাতে।

'আমি অরবিন্দ বলব।' রাজেশ আরেকটা প্যাকেট বউয়ের দিকে বাড়িয়ে বলল, 'তুমি আমায় বলবে রাজেশভাইয়া। আর সঙ্গীতা তোমার ভাবীজী। তবে নো আপনি। এবার থেকে তুমি। এগ্রিড ?'

মনীশ হেসে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল। সত্যি অপরিচিতকে যে এত তাড়াতাড়ি আপন করা যায় এই প্রথম দেখল মনীশ। কয়েক মুহূর্তের আলাপ, কিন্তু মনীশও অনুভব করছে যে এরা দুজন যেন কতদিনের পরিচিত ওর।

প্যাকেট খুলে খাবার খেতে শুরু করল মনীশ।

তার কিছুক্ষণ পরেই ওরা মাণ্ডির বাসে উঠে পড়ল। রাজেশ ও সঙ্গীতা যে সিটে বসল তার ঠিক পেছনেই বসল মনীশ।

বাস ছাড়তে তখন আর মিনিট পাঁচেক বাকী। হঠাৎ সঙ্গীতা বলল, 'ইস্ গুড়িয়ার জন্য শিমলার পেঠা নেব যে ভেবেছিলাম।'

'আনব ?' রাজেশ সিট থেকে উঠে দাঁড়াল।

'নিশ্চয়ই।' সঙ্গীতা বলল, 'আর শোনো, কিছু কমলা লেবুও নিয়ে এস। রাস্তায় জল তেণ্টা পেলে খাওয়া যাবে।'

রাজেশ নেমে গেল বাস থেকে।

'তামিয়ায় কখন পেঁছিবো ভাবীজী ?' মনীশ জিজ্ঞেস করল।

'টোঙ্গী পেঁছিতে পেঁছিতে সাড়ে তিনটে।' সঙ্গীতা হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওখান থেকে জীপ। মনে হয় পাঁচটার আগে পেঁছিতে পারব না।'

'তখন কি অফিস খোলা পাব ?'

'না অফিস এখানে ন'টা থেকে চারটে। কেন, আপনার তো কাল জয়েনিং ?'

'আজ থাকার একটা ব্যবস্থা—'

'ও জলে পড়েছেন বুঝি!' সঙ্গীতা অনুযোগের চোখে তাকাল। 'আজ আপনি –'

'আবার আপনি ?' মনীশের স্বরে প্রতিবাদ, 'এ ভাবে চুক্তির খেলাপ করলে—'

সঙ্গীতা হেসে উঠল। মনীশও যোগ দিল সেই হাসিতে। এতক্ষণে সেও বেশ সহজ হয়ে গেছে।

সঙ্গীতা বলল, 'অরবিন্দভাই, আজ গেস্ট হাউস পেলেও তুমি আমাদের কোয়ার্টারে থাকছ। বুঝেছ ? কাল তো কোয়ার্টার পেয়েই যাবে।'

রাজেশ বাসে উঠল বাঁ হাতে ঢাউস একটা প্যাকেট বুকে সাঁটিয়ে। ওর ডান হাতে জালি ব্যাগে ঝুলছে বেশ কিছু আপেল।

প্যাকেটটা সঙ্গীতার কোলে দিয়ে বলল, 'এ নাও গুড়িয়ার পেঠা।'

'আর ওটা কী ?' সঙ্গীতা রাজেশের ডান হাতে ঝোলানো জালি ব্যাগের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'আপেল!—'তুমি যে আনতে বললে।'

সঙ্গীতা তাকাল মনীশের দিকে। মুখে কপট গাম্ভীর্য নিয়ে বলল, 'অরবিন্দভাই, কি বলেছিলাম আনতে?'

মনীশ মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল সিট থেকে। বাসের দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'আমি নিয়ে আসছি, ভাবীজী।'

খুব দ্রুত পাশের দোকান থেকে কমলালেবু নিয়ে ফিরে এল মনীশ। বাসে উঠে সঙ্গীতার হাতে দিল।

'কি, বুঝতে পারছ তো?' কমলালেবুর ব্যাগটা নিয়ে সঙ্গীতা ভ্রূকুটি করে বলল মনীশকে, 'বলেছিলাম না ধীরে ধীরে টের পাবে?'

'কি টের পাবে?' রাজেশ বোকার মত জিজ্ঞেস করল।

'টের পাবে, যে কি জিনিস নিয়ে আমি ঘর করি!' সঙ্গীতা স্বামীর দিকে ঘুরে ওর নিজস্ব ভঙ্গীতে হাত নাচিয়ে বলল, 'তিলকে বলে তাল। আর চাল আনতে বললে আনে ডাল।'

রাজেশ নির্বিকার মুখে জানলার দিকে ঘুরে বাইরে তাকাল।

মনীশ দুজনের মুখ নিরীক্ষণ করে মিটি মিটি হাসতে হাসতে বসল সিটে।

তারপরেই ছেড়ে দিল বাস।

তামিয়া। বিকেল পাঁচটা তিরিশ।

বাবাকে খাইয়ে দুপুর দুটোর মধ্যে কোয়ার্টারে ফিরে এসেছিল গুড়িয়া। তারপর রাজেশভাইয়া আর ভাবীজীর জন্য রেঁধে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে আবার পোস্ট অফিসে গিয়েছিল বাবাকে আনতে। রোজ তিনবার করে পোস্ট অফিসে যায় গুড়িয়া। পৌনে ন'টার সময় বাবাকে দিয়ে আসতে, একটার সময় বাবাকে খাওয়াতে, আর পৌনে চারটের সময় বাবাকে নিয়ে আসতে। এই পাহাড়ী পথে পঙ্গু শরীর নিয়ে চলাফেরা করতে খুব অসুবিধে হয় শর্মাজীর। যতটুকু চলাফেরা করেন সব সময় গুড়িয়ার সাহায্যে। গুড়িয়া কখনোই বাবাকে একা বা অন্যের সঙ্গে ছাড়ে না।

সাড়ে চারটে নাগাদ কোয়ার্টারে পেঁছে বাবাকে তাঁর বিছানায় শুইয়ে গুড়িয়া ঠায় বারান্দায় বসে আছে। এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা। রাজেশভাইয়া ভাবীজী এখনো এল না। এর মধ্যে শর্মাজীও দু-একবার ভেতর থেকে বললেন, 'কি রে এখনো এল না? তাহলে কি আজ আসবে না মনে হয়?'

বাবার কথা শুনে গুড়িয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। আসবে না আজ? এত আশা নিয়ে ও বসে আছে সেই দুপুর থেকে? তাহলে লিখল কেন? ঠোঁট ফুলে উঠল গুড়িয়ার। দুঃখে অভিমানে! পনেরো দিন হয়ে গেল রাজেশভাইয়া আর ভাবীজী নেই। ওদের ছেড়ে থাকতে ওর এত কষ্ট। আর ওদের কিছু হয় না? আসুক না ওরা! যখন ভাবীজীকে জড়িয়ে গুড়িয়া ভীষণ কেঁদে ফেলবে তখন বুঝবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দূরের রাস্তায় একটা জীপ দেখা গেল। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল গুড়িয়া। জীপটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পর্বত-বেষ্টিত সারা তামিয়ায় এখন আলো-আঁধারের পরিবেশ।

জীপটা আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে এদিকেই আসছে। তারপরেই সে দেখল রাজেশভাইয়া হাত নাড়ছে জীপের জানলা দিয়ে।

'পাপাজী পাপাজী—!' গুড়িয়া বাবাকে বলতে ভেতরে ছুটল, 'ওরা এসে গেছে!'

ভেতর থেকে একটা বেতের চেয়ার বারান্দায় এনে রাখল। চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি সাবধানে এস! বাইরে চেয়ারে এসে বস!'

গুড়িয়া ছুটে কোয়ার্টারের কম্পাউণ্ড-এর গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জীপটা এসে থামল সামনে।

রাজেশ নামল। হাত দুটো ছড়িয়ে উচ্ছ্বাসের স্বরে বলল, 'এই যে গুড়িয়া রাণী। এসে গেছি!—'

গুড়িয়া একটু এগিয়ে গোমড়া মুখে বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলব না!'

'যা শ্বাবা—কেন?'

'আমাকে একটাও চিঠি দাও নি।' বলেই গুড়িয়া সঙ্গীতাকে দেখে ছুটে গেল। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধবল ওকে! 'ভাবীজী!'

সঙ্গীতাও গুড়িয়াকে বুকে জাপটে ধরল।

মনীশ জীপে বসে বসে দেখল সব। সারা রাস্তায় রাজেশ ও সঙ্গীতার মুখে গুড়িয়া নামটা অনেকবার সে শুনেছে। এবং সে যে ওদের আদরেব কেউ সেটাও সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তাকে ভেবেছিল পাঁচ-সাত বছরের কোনো ছোট্টো মেয়ে। এই গুড়িয়াকে দেখে সে বেশ থমকে গেল!

গুড়িয়া সঙ্গীতাকে জড়িয়ে আছে। ওর মুখ জীপের দিকে। সূর্য ঢলতে ঢলতে পশ্চিমের গিরি শিরায় এমন অবস্থানে এসে পড়েছে যে তার শেষ আলোর ছটা মুহূর্তের জন্য ছিটকে পড়ল এই পাহাড়েব কোলে। সেই রক্তিম আভায় গুড়িয়ার মুখখানা দেখল মনীশ। যেন এক সদ্য ফোটা সন্ধ্যা মালতী সঙ্গীতার কাঁধ থেকে ফুটে বেরিয়েছে। এমনই পবিত্রতা স্নিগ্ধতা সেই মুখে। চোখের কোলের দুই দিগন্তের ওপারে পাপড়ি মেলে তাকিয়ে আছে দুটো স্বপ্নালু মণি। আবেগের ঘোরে সেই মণি দুটো সজল হয়ে চিক চিক করে উঠল। শেষপর্যন্ত গুড়িয়া ছাড়ল তার ভাবীকে।

মনীশ নামল জীপ থেকে।

গুড়িয়া ও সঙ্গীতা কম্পাউণ্ড-এর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। গুড়িয়া মনীশকে দেখতে পায় নি। রাজেশ জীপের পেছনে মাল-পত্র নামাতে ব্যস্ত। মনীশ এগিয়ে গেল সেদিকে।

গুড়িয়া সঙ্গীতার কোমর জড়িয়ে কোয়ার্টারের বারান্দার দিকে যেতে যেতে বলল, 'ভাবী' এই পনেরো দিন আমার যে কি ভাবে কেটেছে তোমাদের বোঝাতেই পারব না।'

সঙ্গীতা গুড়িয়ার চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে বলল, 'আমারও তোর কথা খুব মনে পড়তো ওখানে।'

'ছাই!' গুড়িয়া ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'ওখানে তোমাদের কত আত্মীয়স্বজন কত লোক। তার মধ্যে আমার কথা মনে পড়বে কেন?'

'না পড়লে মিথ্যে বলছি?' সঙ্গীতা তার জড়ানো হাতে গুড়িয়ার শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে

বলল, 'তুই আমার চিরকালের আত্মীয়, চিরকালের স্বজন। তোকে আমি ভুলতে পারি ?'

ওরা বারান্দায় গিয়ে পৌঁছল। শর্মাজী বেতের চেয়ারে বসে আছেন।

'কেমন ঘোরা হল বিটিয়া ?' শর্মাজী জিজ্ঞেস করলেন।

'ভাল চাচাজী।' সঙ্গীতা নত হয়ে শর্মাজীকে প্রণাম করে বলল, 'আপনি কেমন আছেন ?'

'ভাল। তোমাদের দেখে এখন আরো ভাল লাগছে।' শর্মাজী তারপর গুড়িয়ার দিকে ঘুরে বললেন, 'কই ওদের চাবিটা এনে দে !'

'ও হ্যাঁ—!' বলে গুড়িয়া ভেতরে ছুটল।

'এস অরবিন্দ !' রাজেশ সুটকেশ ও ব্যাগ হাতে পাশের কম্পাউন্ড-এ ঢুকল। অর্থাৎ গুড়িয়া ও সঙ্গীতা যে গেট দিয়ে ঢুকেছে তার পাশের গেটে। আবার একটু অবাক হল মনীশ।

রাজেশ পাশের কম্পাউন্ড-এ ঢুকে পাশের কোয়ার্টারের বারান্দার দিকে যেতে যেতে হাত নেড়ে এদিকের বারান্দায় বসা শর্মাজীকে বলল, 'আসছি চাচাজী।'

এতক্ষণে বুঝল মনীশ, গুড়িয়া ওদের কেউ নয়, প্রতিবেশী মাত্র। কিন্তু এতক্ষণ ওর ধারণা ছিল গুড়িয়া ওদের নিকট আত্মীয়। ওরা একসঙ্গেই থাকে। মনীশ ওর সুটকেশ হাতে রাজেশকে অনুসরণ করে কোয়ার্টারের বারান্দায় এল। সঙ্গীতা তখন গুড়িয়াদের কোয়ার্টার থেকে চাবি নিয়ে বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে রাজেশকে ডাকছে।

রাজেশ বারান্দা থেকে নেমে চাবি নিল। কোয়ার্টারের দরজা খুলে ভেতরে মাল-পত্র রেখে মনীশকে বলল, 'চলো শর্মাজীর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'শর্মাজী ?' মনীশ তাকাল।

রাজেশ বলল, 'শর্মাজী গুড়িয়ার বাবা। এখানকার পোস্ট মাস্টার। তামিয়ার মান্যগণ্য ব্যক্তি।'

মনীশ রাজেশের সঙ্গে কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে পাশের গেটে ঢুকল। পথে রাজেশ শর্মাজীর পক্ষাঘাতের কথা বলে দিয়েছে ওকে।

শর্মাজীর পাশে তখন আরেকটা চেয়ারে সঙ্গীতা বসে। গুড়িয়া ভেতরে।

'বলুন শর্মাজী—' রাজেশ ঝুঁকে শর্মাজীর গলা জড়িয়ে বলল, 'সব ঠিক-ঠাক ?'

'একেবারে।' শর্মাজী থেমে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মনীশের দিকে তাকালেন।

'ইনি আমাদের নতুন অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার।' রাজেশ পরিচয় করিয়ে দিল, 'অরবিন্দ দাশ।'

আঁৎকে উঠল মনীশ। সঙ্গীতা রাজেশের দিকে ধমকের দৃষ্টিতে তাকাল।

'বেশ—!' সঙ্গীতা সেই ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'শিমলায় নাম পালটে দিয়েছিলে এখানে পদবীটাও ঘুচিয়ে দিলে! আর বাকি রাখলে কি ?'

মনীশ শর্মাজীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার নাম অরবিন্দ সেন।'

এই নাম এখন পর্যন্ত তৃতীয় বার বলল মনীশ। প্রথম বারের মত এবারও ওর বুকে

কেঁপে উঠল। তবে ও বুঝতে পারল, এভাবেই ধীরে ধীরে আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক হয়ে যাবে এই পরিচয়।

শর্মাজী তখন হাসছেন। হাসতে হাসতে মনীশকে বললেন, 'কিছু মনে করো না ভাই। এই রাজেশ প্রথম দিকে আমাকেও কয়েকবার বর্মাজী বলেছে।'

'কিন্তু অরবিন্দভাই ' সঙ্গীতা কপট গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমাদের প্রেম করে বিয়ে। সঙ্গীতা নামটি কিন্তু উনি কখনো ভোলেননি। সেই প্রথম থেকে আঁকড়ে আছে। সেদিকে তোমার ভাইয়া সেয়ানা।'

শর্মাজী আবার হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে পেছন দিকে ঘুরে বললেন, 'গুড়িয়া! দুটো চেয়ার দে বাইরে।'

'গুড়িয়া কেন—' রাজেশ ভেতরে প্রবেশ করল।

কিন্তু তার আগেই গুড়িয়া রান্নাঘর থেকে 'আসছি পাপাজী' বলে বেরিয়ে এসেছে। ভেতর থেকে একটা বেতের চেয়ার নিয়ে বাইরের দরজায় এল। দরজায় এসেই মনীশকে দেখে একেবারে থমকে গেল। এই প্রথম সে দেখল মনীশকে।

বেতের চেয়ারটা কোলে নিয়ে ছুটে আসছিল গুড়িয়া। দরজার বাইরে এসে সেই যে দাঁড়াল আর এগোলো না। মনীশকে দেখামাত্র ওর সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। হাত থেকে পড়ে গেল চেয়ারটা। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি নামিয়ে নিল গুড়িয়া। গুড়িয়ার হাসি হাসি মুখ নিমেষেই মলিন হয়ে যেতে শর্মাজীও অকস্মাত তার হাসি থামিয়ে দিলেন। সঙ্গীতা কি করবে বুঝতে পারছে না। রাজেশ ভেতর থেকে আরেকটা চেয়ার নিয়ে বাইরে এসে পরিস্থিতি অনুধাবন করে সন্তর্পণে তাকাল গুড়িয়ার মুখের দিকে।

মনীশ অপ্রস্তুত হল। কোথায় যেন একটা ছন্দপতন ঘটে গেছে। এবং তার কারণ যে মনীশ সেটা সে বুঝতে পারল। কিন্তু পারল না বুঝতে কেন, কিসের জন্য হল এটা।

রাজেশ চেয়ারটা মাটিতে দ্রুত রেখে বলে উঠল, 'গুড়িয়া ইনি এখানকার নতুন অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার—'

'অরবিন্দ সেন।' সঙ্গীতা সঙ্গে সঙ্গে বলল। পাছে রাজেশ আবার ভুল করে।

'আমরা এক সঙ্গেই এসেছি।' রাজেশ গুড়িয়ার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'অরবিন্দ আমার ছোটো ভাইয়ের মত—।'

কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়াই হল না। গুড়িয়া ওর স্তব্ধ মুখখানা নত করে যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

শর্মাজী নির্দেশের স্বরে বললেন, 'গুড়িয়া নমস্কার করো।'

গুড়িয়া মুখ না তুলে হাত দুটো শুধু তুলল বুকের ওপর। তারপর ঘুরে বলল, 'আমি আসছি পাপাজী।'

বলেই ধীর পায়ে ভেতরে চলে গেল।

মনীশ প্রতিনমস্কার 'করার কোনো সুযোগ পেল না। গুড়িয়া আর তাকালই না

ওর দিকে। সেই যে বাইরে এসে প্রথমবার তাকিয়ে থমকে গিয়েছিল তারপর থেকে মুখ নামানো ছিল ওর।

শর্মাজী মনীশের দিকে ঘুরে মৃদু হেসে বললেন, 'ভীষণ লাজুক মেয়ে আমার। দেখছো তো কোন্ গণ্ডদেশে পড়ে আছি। লোকজন তেমন পায় না। অপরিচিত কাউকে দেখলেই ঘাবড়ে যায়। প্লিজ কিছু মনে করো না।'

'না মনে করব কেন?' মনীশ যদিও মুখে বলল কথাটা, কিন্তু ওর মনের ভেতর তখন অস্বস্তির ঝড় বইছে।

'বসো—!'

শর্মাজীর নির্দেশে মনীশ বসল একটা চেয়ারে। রাজেশ বসল আরেকটায়।

রাজেশ প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য বলল, 'চাচাজী তামিয়ার খবর বলুন। এই পনেরো দিনে নতুন কিছু ঘটেছে?'

সঙ্গীতা চেয়ার থেকে উঠে বলল, 'তোমরা গল্প কর, আমি ভেতর থেকে আসছি।'

সঙ্গীতা একটু চিন্তিত পায়ে ভেতরে ঢুকল। রান্নাঘরে এসে দেখল উনোনে চায়ের কেটলীতে জল ফুটছে আর গুড়িয়া পাশে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। ওর মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত একটা ভাবনার ঘোর, কোনো দিকে খেয়াল নেই।

'গুড়িয়া— !'

সঙ্গীতার ডাকে চমক ভাঙল গুড়িয়ার।

'চায়ের জল যে ফুটে যাচ্ছে।' সঙ্গীতা আঁচল দিয়ে কেটলিটা নামাল উনোন থেকে।

গুড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে বলল, 'সরো ভাবী!'

গুড়িয়া প্রায় ধাক্কা দিয়েই সঙ্গীতাকে সরিয়ে চা বানাতে শুরু করল।

সঙ্গীতা লক্ষ্য করল গুড়িয়ার মুখ। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে গুড়িয়া।

কিন্তু ট্রে-তে চা বিস্কুট নিয়ে সঙ্গীতা এল বারান্দায়। গুড়িয়া আর এল না।

মনীশ বুঝতে পারল, ওর জন্যই এল না গুড়িয়া। অস্বস্তিটা আরো বেড়ে গেল ভেতরে।

চা-বিস্কুট খেয়ে ওরা ফিরে এল পাশের কোয়ার্টারে। পথে কেউ কোনো কথা বলল না। রাজেশ ও সঙ্গীতাও যে অপ্রস্তুত এটা এখন স্পষ্ট।

কোয়ার্টারে ঢুকে সঙ্গীতা বেডরুমে গেল। রাজেশ ড্রয়িংরুমে মনীশকে বলল, 'যাও অরবিন্দ, হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে নাও!'

'রাজেশভাইয়া—' মনীশ একটু থমথমে স্বরে বলল, 'আমি যদি গেস্ট হাউসে চলে যাই—'

'খবরদার!' রাজেশ সাবধান করল, 'ও কথা আর একদম বল না। তোমার ভবীজী যদি শুনতে পায় আমাকেই ধমকাবে। বলবে আমি তোমায় চিমটি কেটেছি সেজন্য তুমি পালাচ্ছ।'

অন্য সময় হলে রাজেশের কথায় হাসত মনীশ। কিন্তু এখন হাসি আর আসছে

না। মনটা কেমন যেন মুচড়ে উঠছে ভেতর ভেতর। কান্না পাচ্ছে ভীষণ। গুড়িয়ার ঘটনা মা আর লীলার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে আরো। দু-দিন ধরে বাড়ির চিন্তায় এমনিতেই ও বিষণ্ণ। আজ গুড়িয়াকে প্রথমে একরূপে পরেই ভিন্ন রূপে দেখে সেই বিষণ্ণতাটা আরো তীব্র হল।

সঙ্গীতা এল।

'অরবিন্দভাই, বাথরুমে জল-টল রেডী। তুমি যাও হাত মুখ ধুয়ে এস।'

সঙ্গীতা চলে গেল।

সঙ্গীতার যাওয়ার দিকে তাকাল মনীশ। দূরদেশে মা-বোনের অভাব অনেকটা দূর করে দিচ্ছে এই মহিলা। রাজেশভাইয়ার ভালবাসাও অতুলনীয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়, কিন্তু এর মধ্যে কত কাছের হয়ে গেছে এরা। অনেক আতঙ্ক অস্বস্তি নিয়ে শিমলায় এসে পৌঁছেছিল মনীশ। সেখানে এদের সান্নিধ্যে এসে একটু আশ্বস্ত একটু ভরসা পেয়েছে। কিন্তু গুড়িয়া অমন স্তব্ধ হয়ে গেল কেন? অত সুন্দর অপূর্ব মুখখানা মনীশকে দেখে মলীন হয়ে যাওয়ার কী কারণ?

বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে কিছুক্ষণ দেখল মনীশ। অরবিন্দ-বেশে নিজের মুখ নিজেই সে চিনতে পারছে না। উইগ আর চশমা এতটা চেহারা পালটে দিতে পারে? ভাল লাগছে না মোটেই। জুলফি সুদ্ধ ঝাঁকড়া চুল স্টাইলিস্ট ফোটোক্রোমেটিক চশমা চোখে-মুখে একেবারে অন্য অভিব্যক্তি এনে দিয়েছে

বলতে গেলে এক নজরে নিজের চোখেই নিজেকে ভয়ংকর মনে হচ্ছে এখন। এই চেহারা কোনো দিন ভাল লাগত না মনীশের। অরবিন্দর দিকে তাকাতে সেইজন্য ঘৃণাবোধ করতো সে। ভাগ্যের কি পরিহাস! আজ সেই চেহারা নিতে হল ওকে। এখন বুঝতে পারছে মনীশ, গুড়িয়া কেন ওর দিকে তাকিয়ে থমকে গিয়েছিল। কেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ওর মুখ।

গুড়িয়ার এই প্রতিক্রিয়া মনীশের জন্য সাবধানের সংকেত নয় তো? মনীশের বুক ঢিব-ঢিব করে উঠল। এত দিন যে অপরাধবোধ মনের অতলে চোরা স্রোতের মত বইছিল সেটা উথাল পাথাল ঢেউ হয়ে মনীশের বিবেকে আঘাত হানল। চরম অভাবের তাড়নায়, সঙ্গীন পরিস্থিতির চাপে পড়ে এই চাকরী নিলেও, মনীশ এখন অপরাধী। আইনের চোখে তো বটেই। কিন্তু তার আগে নিজের কাছে নিজের বিবেকের কাছে এর কি কৈফিয়ত দেবে?

গুড়িয়া সেই অপরাধের প্রথম শাস্তি বোধহয় দিল আজ মনীশকে।

রাতে গুড়িয়াদের কোয়ার্টার থেকে খাবার এল। সঙ্গীতা নিয়ে এল সব খাবার-দাবার। কিন্তু গুড়িয়া এল না। খাবারগুলো গুড়িয়ার রান্না করা এবং গুড়িয়া যে আসত এটা রাজেশ ভাইয়া ও ভাবীজীর হাবে-ভাবে কথা বার্তায় বুঝতে পারল মনীশ। ঘটনা এখন স্পষ্ট যে গুড়িয়া মনীশের জন্যই আর এ কোয়ার্টারে এল না।

খাবার টেবিলে রাজেশ ও সঙ্গীতা মনীশের জীবনের অনেক কথা জানল। ওদের

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে মনীশই জানাল সব। ওর মায়ের কথা, ওর বোনের কথা, বাবার কথা। তাতে রাজেশভাইয়া ও সঙ্গীতাভাবীর সহানুভূতি ভালবাসা আরো বেড়ে গেল ওর ওপর।

সঙ্গীতাভাবী শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, 'অরবিন্দভাই, তুমি এখানে একা একা খাওয়া দাওয়া কি করে করবে! একটা কথা বলি? তুমি দু-বেলা আমাদের কাছেই খেও অসুবিধে হবে?'

অসুবিধে? এর চেয়ে সুবিধে আর কী হবে মনীশের? কিন্তু এই মুহূর্তে ওর চোখে ভেসে উঠল গুড়িয়ার সেই মুখ। ওকে দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল যে-মুখ। গুড়িয়া তারপর থেকে এই কোয়ার্টারের কাছে আর ঘেঁষেনি। এমনকি পাশের কোয়ার্টারেও তার কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায়নি আর।

মনীশ ম্লান হেসে বলল, 'এখন থাক ভাবীজী, পরে বলব।'

রাতে ড্রয়িংরুমের পাশের ঘরে মনীশের শোবার ব্যবস্থা করে দিল সঙ্গীতা।

শোবার আগে দরজা বন্ধ করে চারটে চিঠি লিখল মনীশ। মাকে, লীলাকে, কাকাবাবুকে ও বন্ধু প্রবীরকে।

সব চিঠিই প্রবীরের ঠিকানায় যাবে। এই ব্যবস্থাটা কলকাতা ছাড়ার আগে করে এসেছে মনীশ।

অরবিন্দর কাছ থেকে সোয়াব কোম্পানীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নেবার আগে মনীশ ওকে বার বার বলেছিল ঘটনাটা অরবিন্দ ও মনীশ ছাড়া আর কেউ যেন জানতে না পারে। কারণ মনীশের ভয় ছিল অরবিন্দর বান্ধবী রঞ্জনা যদি জানে তাহলে ব্যাপারটা খুব ঝুঁকির হয়ে যাবে। অরবিন্দ কথা দিয়েছিল, রঞ্জনাকেও সে কিছু বলবে না। আর কাউকে তো নয়ই।

কিন্তু মনীশ অরবিন্দর বাড়ি থেকে ফেরার পথে ওর ছেলেবেলার বন্ধু প্রবীরকে নিজেই সব বলেছে।

প্রবীর শুনে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে বলল, 'মনীশ, এ তো মারাত্মক অপরাধ! অন্যের নামে তুই চাকরী করবি? নিজের আইডেন্টি লুকিয়ে?'

'হ্যাঁ অপরাধ তো বটেই।' মনীশ ওর যন্ত্রণাকাতর মুখ নত করে বলল, 'তার দংশন অহরহ হুল ফোটাচ্ছে আমার মনে। কিন্তু আমি নিরুপায় প্রবীর। এ মুহূর্তে আমার একটা চাকরী চাই-ই! মাকে বাঁচানোর জন্য, লীলার মুখে সামান্য হাসি ফোটানোর জন্য। দুবছর তো বহু চেষ্টা করলাম। নিজের সত্যি পরিচয়ে যখন হলো না। এখন আমি কি করব তুই-ই বল?'

প্রবীর এখন সত্যি কী বলবে মনীশকে! সে নিজেও বেকার। বেকারিত্বের যন্ত্রণা তাকেও ভোগ করতে হচ্ছে। অথচ দুজনেই শিক্ষিত। জীবন নির্বাহের জন্য একটা চাকরীর প্রয়োজন ওদের। এই চাকরীকে লক্ষ্য করেই ওরা শিক্ষার একের পর এক ধাপ পেরিয়ে এসেছে। তার পরেও পরিশ্রম করছে কত। প্রচেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই।

কিন্তু চাকরী ওদের হচ্ছে না। প্রবীরের দাদা তবু চাকরী করে। বাবা রিটায়ার্ড হলেও পেনসন পান। কিন্তু মনীশের বাড়ির অবস্থা অন্যরকম। ওরা নিঃস্ব। শূন্য ওদের সঞ্চয়ের ভাণ্ডার। তার ওপর ওর মায়ের অমন মরণোন্মুখ রোগ। ওর মাথার ওপর কেউই নেই। মনীশকে সাহায্য করার মত একজনও যদি থাকত পাশে!

মনীশ মুখ তুলে আবার বলল, 'প্রবীর এই চাকরী আরো একটা কারণে নিলাম। আমার চেয়ে কোনো যোগ্য ব্যক্তি যদি এটা পেত কিংবা আরো অভাবগ্রস্ত কেউ, আমার কিছুই বলার থাকত না। অরবিন্দ পেয়েছে, আমি তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আমার মনে হয়, কোথায় যেন আমার ওপর একটা ভীষণ অন্যায় হয়েছে।'

অন্যায় নিশ্চয়ই হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রবীরেরও কোনো সংশয় নেই। অরবিন্দকে সামান্য কয়েক মুহূর্তের পরিচয়েই বীভৎস বিরক্তিকর মানুষ মনে হয়েছিল ওর। চাকরীটা সে পেয়েছে শুনে প্রবীর মনীশের চেয়েও বেশী আঘাত পেয়েছে। কিন্তু ভয় সেখানেই। প্রবীর সে কথাই বলল মনীশকে, 'মনীশ, অরবিন্দর নামে চাকরী, তাই আমার ভয় করছে। ছেলেটা তো ভাল নয়—'

'অরবিন্দর কাছ থেকে ভয়ের কিছু নেই।' মনীশ বলল, 'কারণ ও বিদেশে চলে যাচ্ছে। এ দেশের প্রতি ওর কোনো টান নেই। ভয় শুধু এখানে, যদি আর কেউ জানতে পারে। তবে জায়গাটা সত্যি বহুদূর এখান থেকে। কোনো শহরও নয়, পাহাড়ের মধ্যে একটা অপরিচিত অজ জায়গা।'

'তা ঠিক, কিন্তু বাড়িতে কি বলবি?'

'অল রেডি বলেছি, ঘুরে ঘুরে চাকরী। ফিক্সড কোনো ঠিকানা নেই।' মনীশ বলল, 'কিন্তু আমাকে তো বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। এ ব্যাপারে তোর সাহায্য চাই।'

'বল্?'

'আমার ঠিকানা একমাত্র তোর কাছে থাকবে।' মনীশ বলল, 'ওদের চিঠি তুই আমার কাছে পাঠাবি। আমিও বাড়ির চিঠি তোর ঠিকানায় পাঠাব। মোট কথা, পোস্ট অফিসের মাধ্যমে বাড়িতে চিঠি পাঠাব না। আমি কোথায় আছি, তুই ছাড়া কলকাতায় আর কেউ জানবে না।'

'ঠিক আছে।' প্রবীর আশ্বাস দিল, 'সে নিয়ে তুই ভাবিস না। আমি এমনিতেই মাসীমাকে দেখতে যাব মাঝে-মাঝে। কিন্তু এই চাকরী তুই কদিন করবি মনীশ?'

'আপাতত কিছুদিন। যতদিন না অন্য চাকরী কিংবা অন্য ব্যবস্থা হয়।'

'আশ্চর্য!' প্রবীর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তুই ভাল ইন্টারভিউ দিলি! তুই নাকি পরীক্ষায় ফার্স্ট হলি আর চাকরীটা পেল অরবিন্দ?'

'আমার আদার ফ্যাক্টর নেই রে প্রবীর, তাই বোধহয় কোনো চাকরী হচ্ছে না।'

'আদার ফ্যাক্টর!' প্রবীর তাকাল।

'হ্যাঁ, ওটা অ্যাডিশনল কোয়ালিফিকেশন।' মনীশ একটা ঝোড়ো নিশ্বাস ছাড়ল

বুক থেকে। ম্লান হেসে বলল, 'আমার সেই কোয়ালিফিকেশনটা নেই। তাই প্রতিবার ডিসকোয়ালিফায়ড হয়ে যাচ্ছি।'

রাতে বিছানায় ঘুম আসার আগে মনীশের চোখে গুড়িয়ার সেই মুখখানা ভেসে উঠল একবার। যেটা সে অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলোয় জীপের ভেতর থেকে দেখেছিল। পরের মলিন মুখ আর ভাবল না মনীশ। গুড়িয়ার সেই কালো স্তব্ধ মুখ এখন সে ভুলে যেতে চায়। ওই সুন্দর মুখ আর যাতে মলিন না হয় সেজন্য মনীশ মনে মনে একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন সে গুড়িয়ার সম্মুখে আসবে না। মনীশ কখনোই চায় না ওর জন্য কেউ অসুবিধে বোধ করুক। কেউ কষ্ট পাক। ক্ষতি হোক কারো।

বিশেষ করে গুড়িয়ার মত মিষ্টি মেয়ে সব সময় হাসি-খুশী থাকুক, আনন্দে থাকুক এটাই মনীশ মনে প্রাণে চায়।

ফুলের মত মুখখানা ভাবতে ভাবতে পরিশ্রান্ত মনীশ ঘুমিয়ে পড়ল বিছানায়।

পরের দিন অফিসে কাজের দায়িত্ব বুঝে নিতে বেশীক্ষণ লাগল না মনীশের।

রাজেশভাইয়া ওকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মিঃ সাকসেনার কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

মিঃ সাকসেনার বয়স প্রায় পঞ্চাশ। গায়ের রঙ, স্বাস্থ্যে তিনি প্রায় সাহেবদের মতন। মনীশের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'ওয়েল, আয় অ্যাম জাস্ট ওয়েটিং ফর ইয়ু মিঃ সেন। প্লিজ বি সিটেড।'

কয়েকটা সৌজন্যমূলক কথা বলার পর তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পেছনের আলমারি থেকে একটা ফাইল বের করলেন। ফাইলটা হাতে নিয়ে আবার চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'আপনার সার্ভিস ফাইল। হেড অফিস থেকে গতকালই এসেছে। নিন কয়েকটা সিগনেচার করুন।'

ফাইলটা খুলে টেবিলের সামনে এগিয়ে দিলেন মিঃ সাকসেনা।

ফাইলের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'অরবিন্দ সেন'। কভার তুলতেই দেখা গেল, ভেতরের ছাপা ফর্মের এক কোণে অরবিন্দর ছবি সাঁটা। যে ছবিটা অরবিন্দ দেখিয়েছিল ওর বাড়িতে। সেই ফর্মের নিচের অংশে সই করতে বললেন মিঃ সাকসেনা। মনীশের সারা শরীর দিয়ে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল। বুকে বাজছে হাতুড়ীর শব্দ।

মনীশ কাঁপা হাতে সই করল।

'মিঃ সেন, আর ইয়ু অল রাইট ?' সাকসেনা সাহেব মনীশের মুখের সঙ্গিন অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'অসুস্থ কি আপনি ?'

'না, একটু ক্লান্ত।' বলতে গিয়ে মনীশের স্বরও কেঁপে উঠল। ওর কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। ভাগ্যিস চশমা পরা ছিল, তাই ওর ভীত সন্ত্রস্ত চোখ দুটো মিঃ সাকসেনার নজরে পড়ল না।

কিন্তু তিনি কিছুই দেখলেন না। না অরবিন্দর ছবি। না মনীশের সই।

তিনি মনীশকে দিয়ে আরো বেশ কয়েকটা সই করিয়ে ফাইলটা তুলে বললেন, 'দ্যাটস অল। নাউ ইয়্যু আর অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার অফ দিস অফিস।'

মিঃ সাকসেনা উঠে দাঁড়িয়ে ফাইলটা আবার ঢুকিয়ে রাখলেন আলমারিতে। মনীশ পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথা, কপাল, মুখের ঘাম মুছল। বুকের দুরু দুরু শব্দটা সাময়িক স্তিমিত হয়েছে।

'কাম অন!' সাকসেনা সাহেব আলমারির পাল্লা বন্ধ করে টেবিলের সামনের দিকে আসতে আসতে বললেন, 'আপনার ঘর আমার পাশেই।'

উঠে দাঁড়াল মনীশ। তারপর মিঃ সাকসেনাকে অনুসরণ করে দরজা পেরিয়ে পাশের ছোটো ঘরে ঢুকল।

এই ঘরেও দুটো আলমারি। আলমারির পাশে ঝকঝকে টেবিল চেয়ার। টেবিলের ওপর কয়েকটা ফাইল-পত্র পড়ে আছে।

সাকসেনা সাহেব বললেন, 'এই আপনার চেয়ার টেবিল। আপনার কাজ ওনলি টু হেল্প মি। দেয়ার আর লটস অফ ওয়ার্ক পেণ্ডিং। এখুনি চা আসবে। ততক্ষণ দেখুন এই কাগজপত্র। তারপর চলে আসুন আমার কাছে। ও কে.?'

সাকসেনা সাহেব নিজের ঘরে চলে গেলেন।

মনীশ চেয়ারটার দিকে তাকাল। যে চেয়ারে ওকে বসতে বলে গেলেন সাকসেনা সাহেব। অর্থাৎ এই অফিসের অ্যাসিস্টেণ্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের চেয়ার ওটা। ওর স্বপ্নের চেয়ার। এরকমই একটা চেয়ারে বসার জন্য দু'বছর ধরে হন্যে হয়ে চেষ্টা করেছে মনীশ। এর জন্য কত রাত জেগে পড়াশোনা করেছে। কত বই-পত্র ঘেঁটেছে। ওর পড়াশোনায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য মা ও লীলাও কত কষ্ট করেছে। কত সাহায্য করেছে ওকে। ঈশ্বরের কাছে তারা প্রার্থনা করেছে বার-বার। যাতে মনীশ এরকম একটা চেয়ারে বসার সুযোগ পায়। আজ সেই চেয়ারেই বসতে চলেছে মনীশ। কিন্তু তার প্রাণের আপনজন মা ও লীলার কাছে গোপন করে। লুকিয়ে চোরের মত সে এসেছে এই চেয়ারে বসতে। কারণ এর ওপর বসার অধিকার অর্জন করতে পারেনি মনীশ। এই আসন ওর কাছে একজনের ভিক্ষার দান। এমন ভিক্ষা, যা গ্রহণ করাও দেশের আইনের চোখে সাংঘাতিক অপরাধ। কিন্তু আত্মসম্মানবোধ, অপরাধবোধ সব জলাঞ্জলি দিয়ে সেই ভিক্ষাই আজ হাত পেতে নিতে হয়েছে মনীশকে।

চেয়ারটায় যখন বসল মনীশ ওর পাথর বুক নিঙড়ে দু-ফোঁটা অশ্রু ভেসে উঠল চোখে। আনন্দের পরিবর্তে আজ দুঃখে ফেটে যাচ্ছে বুক।

সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সাকসেনা সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী একটানা কাজ করে গেল মনীশ। এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, মাইনে সংক্রান্ত কিছু তথ্য হেড অফিসে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করা। সাকসেনা সাহেব সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ওকে। মনীশেরও বুঝতে কিছু অসুবিধে হয়নি।

সাড়ে বারোটা নাগাদ ওর ঘরের বাইরের দরজায় একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন।

'মে আই কাম ইন স্যার ?'

মনীশ তার অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গী দেখে হকচকিয়ে গেল। অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। দ্রুত বলল, 'ও সিওর আসুন—!'

'আমি স্যার আপনার কোয়ার্টার অ্যালটমেণ্টের ব্যাপারে এসেছি। আপনার যদি কোনো চয়েস থাকে আমাকে বলতে পারেন।'

এরকম একজন বয়স্ক লোকের মুখে স্যার শুনতে একদম ভাল লাগছিল না মনীশের। মনীশ বিব্রত স্বরে বলল, 'আমার নাম অরবিন্দ সেন। প্লিজ আমাকে স্যার বলবেন না। আপনার নাম জানতে পারি ?'

'হরবংশ কুমার। আমি এই অফিসের এস্টেট ক্লার্ক।'

'নমস্কার। মিঃ কুমার, চয়েস বলতে আপনি কি বলতে চান ?' মনীশ জিজ্ঞেস করল।

কুমারবাবু সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে নমস্কার করলেন। তারপর দক্ষিণের জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন। ব্লাইণ্ড লাগানো ছিল সেই জানলায়। হুক টেনে ব্লাইণ্ড খুলতেই অদূরে পাহাড়ের কোলে কোয়ার্টারগুলো দেখা গেল।

কুমারবাবু ঘুরে আবার বললেন, 'স্যার—'

'নো! মিঃ সেন—' মনীশ বলল।

'ও. কে —' কুমারবাবু হাসলেন, 'মিঃ সেন, আপনি তিনটে কোয়ার্টারের মধ্যে যে কোনো একটা নিতে পারেন। প্লিজ আসুন এদিকে—'

মনীশ জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মিঃ কুমার হাত দিয়ে দেখালেন, 'ওই যে বাঁ দিকে পাইনের জঙ্গল দেখছেন। তার পাশে ফিফথ রো-র সেকেণ্ডটা। আর মাঝামাঝি ওয়াটার ট্যাঙ্কের পেছনে আছে একটা। আরেকটা ওই ডান দিকে রাস্তার পাশে ফার্স্ট রো-র ফোর্থ ওয়ান।'

মনীশ মিঃ কুমারের বলা শেষ হতেই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'ডান দিকের ফার্স্ট রোর ফোর্থ ওয়ান।'

'ওটা রাস্তার খুব কাছাকাছি মিঃ সেন।' কুমারবাবু বললেন, 'আমার মতে পাইনের জঙ্গলের পাশেরটাই সবচেয়ে ভাল হবে।'

'না মিঃ কুমার, আমাকে এইটেই দিন—' হাতের ইশারায় ডান দিকেরটা আবার দেখাল মনীশ।

'আপনি যখন বলছেন। ও কে. মিঃ সেন, আমি চাবি আর অ্যালটমেণ্ট লেটার এখুনি দিয়ে যাচ্ছি।' কুমারবাবু বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মনীশ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে খোলা ব্লাইণ্ড দিয়ে কোয়ার্টারগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। দোতলা থেকে সুন্দর দেখাচ্ছে দৃশ্যটা। কোয়ার্টার্স-এর পেছনে পর পর তিনটে পাহাড়ের সারি। একেবারে পেছনের পাহাড়ের মাথাটা শিলায়িত। পাথরের খাঁজে খাঁজে রোদ ও আঁধারের অপূর্ব সংমিশ্রণ। দ্বিতীয়টার

ডানদিকের শিরাটুকু দেখা যাচ্ছে। ঘন সবুজ বনে আবৃত। তৃতীয়টায় অর্থাৎ কোয়ার্টার্স-এর ঠিক পেছনের পাহাড়ের মাঝামাঝি কোল থেকে পাইনের ঘন জঙ্গল নেমে এসেছে নিচে। ডান দিকে জঙ্গলের ঘনত্ব কম। বাঁ দিকে কোয়ার্টার্স-এর একেবারে ধার ঘেঁষে পাইনের সারি গড়িয়ে পড়েছে নিচের রাস্তা অব্দি। ওদিকটা সত্যি মনোরম। অনেক সুন্দর ওদিকের পরিবেশ। কিন্তু মনীশ ডান দিকে রাস্তার পাশের কোয়ার্টারটা নিল শুধু একটি কারণে। গুড়িয়াদের কোয়ার্টার থেকে ওই কোয়ার্টারের দূরত্ব সবচেয়ে বেশী। গুড়িয়ারা থাকে পাইনের জঙ্গলের পাশে।

তামিয়া হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার ডক্টর ভাটনাগর পোস্ট অফিসে এসেছেন মানি অর্ডার করতে।

প্রায় চল্লিশ বছর বয়স ডক্টর ভাটনাগরের। সুপুরুষ। মাঝারী স্বাস্থ্য। মাঝারী উচ্চতা। এই মুহূর্তে অন ডিউটি বলে তাঁর পরনে ট্রাউজারের ওপর সাদা দীর্ঘ বুশশার্ট।

কাউন্টারে রামস্বরূপ বাবু ডক্টর ভাটনাগরের হাত থেকে টাকা ও ফর্ম নিয়ে বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আপনি কষ্ট করে এলেন। কাউকে পাঠিয়ে দিলে পারতেন?'

ডক্টর ভাটনাগব মৃদু হেসে বললেন, 'কত দূর আর হাসপাতাল এখান থেকে। এখন অফ টাইম, হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম।'

ডক্টর ভাটনাগরের গলা শুনে ভেতর থেকে শর্মাজী সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, বাইরে কেন ভেতরে আসুন!'

'ঠিক আছে।' ডক্টর ভাটনাগর অমায়িক স্বরে বললেন, 'কাউন্টার তো ফাঁকা!'

'আপনার সঙ্গে একটা দরকারী কথা ছিল—'শর্মাজীর উদগ্রীব স্বর, 'যদি আসেন একবার—'

'তাই বলুন! নিশ্চয়ই আসব। এক মিনিট।' ডক্টর ভাটনাগর রামস্বরূপ-বাবুর কাছ থেকে রসীদ নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। বসলেন এসে শর্মাজীর সামনের চেয়ারে।

'বলুন শর্মাজী—।'

শর্মাজীর চোখে মুখে দুশ্চিন্তা। স্বরে উৎকণ্ঠা নিয়ে বললেন, 'ডাক্তারবাবু গুড়িয়া কি আর ভাল হবে না?'

'কেন?' ডক্টর ভাটনাগর তাকালেন, 'আবার কিছু ঘটল নাকি?'

'গতকাল আপনাদের কোম্পানীর নতুন অ্যাসিস্টেণ্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার এসেছেন—'

'হ্যাঁ শুনেছি।'

'তাকে বোধহয় দেখেন নি এখনো?'

'না এখনো মোলাকাত হয়নি।'

'বেশী বয়স নয় ছেলেটার। চব্বিশ কি পঁচিশ হবে।' শর্মাজী বললেন,

'রাজেশদের সঙ্গে এসেছে। তাকে দেখা মাত্র গুড়িয়ার সেই একই অবস্থা হল দেখলাম।'

'অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ?' ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর ভাটনাগর।

'না! জ্ঞান হারায়নি।' শর্মাজী বললেন.' তবে ভীষণ নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। এমন ভাবে কেঁপে উঠেছিল ওর শরীর. আমি ভাবলাম বেহুঁশ হল বুঝি। তারপর ঘরে ঢুকে ছেলেটির সামনে আর আসে নি।'

'মিঃ সারীন ছিলেন সেখানে ?'

'হ্যাঁ।' শর্মাজী উত্তর দিলেন. 'সঙ্গীতাও ছিল। তবে ওরা ব্যাপারটায় বিশেষ গুরুত্ব দেযান। ওদের অভিমত, নতুন শহুরে ছেলে তাই গুড়িয়া কিছুটা নার্ভাস হলেও লজ্জায় আর সামনে আসেনি। কিন্তু আমি ওর বাবা। লক্ষ্য করে দেখেছি গুড়িয়ার হাব-ভাব খুব একটা সুস্থ ছিল না।'

'আপনি বাবা বলেই বেশী চিন্তা করছেন।' ডক্টর ভাটনাগর বললেন. 'শেষ ঘটনার পর গুড়িয়া কিন্তু দীর্ঘদিন সুস্থ আছে। আমার মনে হয়. মিঃ অ্যান্ড মিসেস সারীন ঠিকই বলেছেন। দেখুন না। বেঁহুশ যখন আর হয় নি. গুড়িয়া ভালই আছে এখন। ওকে নিয়ে আর খামোকা চিন্তা করবেন না।'

'চিন্তা করব না ?' শর্মাজী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এর জন্যই মেয়ের এখনো বিয়ে দিতে পারছি না। কোনো যুবকের সামনেই ও আসতে পারে না। ব্যাপারটা তো স্বাভাবিক নয়। কতজন ওকে দেখতে এসে ফিরে গেল বলুন ?'

'নিরাশ হবেন না।' ডক্টর ভাটনাগর আশ্বাস দিলেন, 'আপনি চেষ্টা চালিয়ে যান। নিশ্চয়ই লেগে যাবে কোথাও। তাছাড়া আমার কি মনে হয় জানেন, গুড়িয়া আপনাকে ছেড়ে যেতেও চায়না।'

'তা বললে হবে ?' শর্মাজীর চিন্তিত স্বর. উনিশ বছর বয়স হল ওর। আমাদের জাতে মেয়েদের ষোলো বছরে বিয়ে হয়ে যায়। এর পর যদি ওর বিয়ে না হয়, আমি শান্তিতে মরতেও পারব না ডাক্তার সাহেব।'

ডক্টর ভাটনাগর শর্মাজীর হাতের ওপর নিজের হাত রেখে জোর চাপ দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে. আপনি আরো দেখুন না ছেলে। মিঃ অ্যান্ড মিসেস সারীন আছেন, আমি আছি। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব। গুড়িয়ার রোগ নিয়ে ভাববেন না। সে জন্যেও আমরা আছি। —আচ্ছা আজ আসি শর্মাজী!'

ডক্টর ভাটনাগর উঠে দাঁড়ালেন।

'আসুন ডাক্তার সাহেব।'

ডক্টর ভাটনাগর চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন পোস্ট অফিস থেকে।

শর্মাজীর মুখে দুশ্চিন্তার ঘোর কিন্তু এক ফোঁটাও কাটল না।

একটার পরেই রাজেশ এল মনীশের কাছে। ওর ঘর সাকসেনা সাহেবের দুটো ঘর পরে।

'কি ব্যাপার অরবিন্দ ?' রাজেশ এসে বিস্মিত স্বরে বলল, 'তুমি নাকি ফরেস্ট সাইড কোয়ার্টারটা নাও নি ?'

'না !' মনীশের নির্লিপ্ত জবাব 'রোড সাইডটা নিয়েছি।'

'হোয়াই ? কেন ?' রাজেশ হতবাক। সামনের চেয়ারে বসে বলল 'রোড সাইড কোয়ার্টার কেউ নেয় ? ধুলো শব্দ কত কিছু হ্যাজারড সেদিকে। ফরেস্ট সাইডের পরিবেশ কত ভাল। সবচেয়ে বড় কথা, আমার কোয়ার্টারের কাছাকাছি থাকবে তুমি।'

'সেসব কথা ভাবিনি।' মনীশ মিথ্যেটা বেশ সহজ কণ্ঠে বলল, 'আসলে জানলা দিয়ে রোড সাইড কোয়ার্টারটা দেখতে খুব ভাল লাগল বলে '

'তুমি এখানকার ভাল মন্দ কি বুঝবে। এখন মাত্র একটা রাত কাটিয়েছ।' রাজেশ চেয়ার থেকে উঠে নির্দেশের সুরে বলল, 'চলো কোয়ার্টারটা চেঞ্জ করিয়ে নি ?'

'থাক্ না রাজেশভাইয়া।' মনীশের গম্ভীর স্বর, 'কোয়ার্টারটা যখন ভাল লেগে গেছে আমার। প্লিজ এখন চেঞ্জ করব না।'

মনীশের দৃঢ় কণ্ঠ রাজেশকে আরো বিস্মিত করে দিল। ওর মুখের দিকে তাকাল রাজেশ। মনীশের মুখ নামানো। ঘন গাম্ভীর্যে ভরপুর। রাজেশ আর কিছু বলল না। ভাবল, সঙ্গীতার কাছে যাক, তখন দেখা যাবে কোয়ার্টার বদল না করে পার পায় কিনা।

মনীশ ওর টেবিলের কাগজ-পত্রের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল।

'ব্যাপার কি ?' রাজেশ হাতের একটা জোর চাপড় মারল টেবিলের ওপর। 'কটা বাজে ? এখন দেড় ঘণ্টা লাঞ্চ টাইম। যাবে না ?'

'কোথায় ?' মনীশ তাকাল।

'কোয়ার্টারে। লাঞ্চ খাবে তো।'

'কোয়ার্টারে ? কেন এখানে ক্যাণ্টিন নেই ?

'আছে। 'কিন্তু আমরা বাড়ির খাওয়া ছেড়ে কোন্ দুঃখে ক্যাণ্টিনে খাব ?'

'আমি ক্যাণ্টিনে খেয়ে নেব রাজেশভাইয়া।'

রাজেশ ভুরু কুঁচকে তাকাল।

'মানে ? সঙ্গীতা তোমার জন্য রান্না করেছে। আসার সময় কি শুনলে ?'

'হ্যাঁ বলেছে ভাবী।' মনীশ চোখ আবার নত করে বলল, 'কিন্তু অত দূর খেতে যেতে ইচ্ছে করছে না। প্লিজ রাজেশভাইয়া, আমি ক্যাণ্টিনেই খেয়ে নেব।'

মনীশের সেই দৃঢ় কণ্ঠ। সেই গম্ভীর মুখ। ব্যাপারটা লক্ষ্য করল রাজেশ। আহত স্বরে বলল, 'ঠিক আছে আমি যাচ্ছি।'

মনীশের এই ব্যবহার ওর কাছে বেশ রহস্যময় মনে হল।

রাজেশ ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মনীশ পরিত্রাণের একটা শ্বাস নিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। যাক্ রাজেশ

ভাইয়ার কোয়ার্টারে যাতে আর না যেতে হয় তার ব্যবস্থাটা আজকের লাঞ্চ থেকেই হয়ে গেল। এই ব্যাপারে এস্টেট ক্লার্ক কুমার বাবু খুব সাহায্য করেছেন ওকে। তিনি যখন কোয়ার্টারের চাবি ও অ্যালটমেন্ট লেটার দিতে এসেছিলেন তখনই সব কথাবার্তা হয়ে গেছে মনীশের। অফিসের দিন, দুপুরে ক্যান্টিনেই খাবে মনীশ। রাতে ও ছুটির দিন দুপুরে ক্যান্টিনের একটা ছেলে খাবার দিয়ে আসবে ওর কোয়ার্টারে। ফ্যাক্টরি চব্বিশ ঘণ্টা চলে এখানে। তাই ক্যান্টিনও চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। সকালের জলখাবার মনীশ নিজেই করে নেবে। কুমারবাবু তখনই ক্যান্টিনের একটি ছেলেকে ডেকে সব কথাবার্তা বলিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রাজেশভাইয়ার কোয়ার্টার থেকে ওর সুটকেশ এই কোয়ার্টারে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন তিনি।

শুধু সঙ্গীতাভাবীর জন্য মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। ভাবী যে ওর খাবার নিয়ে বসে থাকবে সেটা অবধারিত। কত অন্তরঙ্গ স্বরে আন্তরিকতার মন নিয়ে মনীশকে সে বার বার খেতে যেতে বলেছিল। বলেছিল, রোজ যদি দুবেলা মনীশ খেতে না যায় তাহলে সঙ্গীতা কথা বলবে না ওর সঙ্গে। সেই কথা না বলার ব্যবস্থা মনীশ নিজেই পাকাপাকি করে দিল। এতে মনীশের কি মনকষ্ট হবে না? হবে। যে কোনো মানুষের চেয়ে বেশী হবে। কারণ মনীশের আবেগ মনীশের ভালবাসা সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী। তবে সেটা ওর বুকে লুকোনো থাকে। মুখের কথায় হাবে ভাবে প্রকাশ পায় না। তাই তার প্রতিক্রিয়াটাও ওর মধ্যে হয় তীব্র। কিন্তু এই কষ্টের বিনিময়ে একজনের হাসি, একজনের সুখ, একজনের খুশী তো অব্যাহতি পাবে। মনীশ সেজন্যই এভাবে সরে গেল রাজেশভাইয়া সঙ্গীতাভাবীর ত্রিসীমানা থেকে।

এখন সেই দৃশ্যটা ভাবতে ভাল লাগছে মনীশের। সঙ্গীতাভাবী জীপ থেকে নামা মাত্র গুড়িয়া তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল। সঙ্গীতাভাবীও বুকে আগলে রেখেছিল ওকে। তখন কত কথা কত হাসি কি উচ্ছলতা। সব নিমেষে বিলীন হয়ে গেল মনীশের আবির্ভাবে। যেন আকাশের এক ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাত চঞ্চল হরিণীর ছন্দময় গতিকে অতর্কিতে নিশ্চল করে দিল। তারপর থেকে এক পলকের জন্যেও গুড়িয়ার আর দেখা পাওয়া যায় নি।

এবার থেকে নিশ্চয়ই সেই উচ্ছলতা সেই হাসি আবার মন্দ্রিত হবে রাজেশভাইয়াব কোয়ার্টারে। মনীশ আর কোনোদিন সেখানে যাবে না গুড়িয়ার অভিশপ্ত প্রতিমূর্তি হয়ে। আর বাধা হয়ে দাঁড়াবে না ওদের মাঝে।

টেবিলের কাগজ-পত্র গুছিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল মনীশ। এখন ওকে ক্যান্টিনে যেতে হবে লাঞ্চের জন্য।

খাবার টেবিলে সঙ্গীতা থমকে গেল। গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

রাজেশ বলল, 'মন খারাপ করো না। সব মানুষ কি এক হয়? অরবিন্দ যখন চায় না আমাদের সঙ্গ, ওর জন্য দুঃখ করে লাভ কি?'

সঙ্গীতা ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, 'অদ্ভুত! কোয়ার্টার এদিকে নিল না? এখানে খেতেও আসবে না? তার মানে ও আমাদের অ্যাভয়েড করছে?'

'তা ছাড়া আর কি?' রাজেশের রূক্ষ স্বর 'গতকাল তুমি লক্ষ্য করো নি? বাসে মাঝে মাঝে কি রকম গম্ভীর দেখাচ্ছিল। চিন্তায় না অস্বাভাবিকতা কে জানে? মুখ চোখ কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল কথা বলতে বলতে। আজকেও তেমন মনে হল। আমার মনে হয় ছেলেটা স্বাভাবিক নয়।'

'ঠিক আছে আমার কি!' সঙ্গীতা অভিমানের স্বরে বলল, 'একা ছেলে, বাড়ি থেকে এত দূরে এসেছে তাই একটু মায়া পড়ে গিয়েছিল। তারপর কাল ওর মা'র কথা যা শুনলাম। বাবা নেই, ছোটো বোনের জন্য অত চিন্তা। সব দেখে শুনে আমি ঠিক করেই নিয়েছিলাম ও যতদিন এখানে একা থাকবে আমার কাছেই খাবে। আমাদের চায় না যখন আমি জোর করে টানব নাকি?'

'আসলে একাচোরা। স্বার্থপর!' খাওয়া শুরু করে মন্তব্য করল রাজেশ, 'কাল অচেনা জায়গায় এসে অসুবিধেয় পড়ে কাছে ঘেঁষেছিল। আজ অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হয়েই খুলে দিল নিজের আসল মূর্তি '

সঙ্গীতা একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে শুরু করল ওর খাওয়া।

ক্যান্টিনটা অফিসের পেছনে। কারখানা ও অফিসের মাঝামাঝি ডানদিকের কম্পাউন্ড ঘেঁষে। মনীশ লাঞ্চ খেয়ে অফিসের দিকে আসছিল। হঠাৎ সামনে পোস্ট অফিসের জানলায় নজর পড়তে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। গুড়িয়া ভেতরে একটা চেয়ারে বসে শর্মাজীকে খাওয়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পা দুটো থেমে গেল মনীশের।

এক মুহূর্ত তাকাল। গুড়িয়া অবশ্য জানলার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে। হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছে বাবাকে আর খাইয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ও যদি হঠাৎ ঘাড় ফিরে পেছনে তাকায়। কিংবা উঠে বাইরে বেরিয়ে আসে! মনীশ পিছিয়ে এল দু'পা। ঘুরে চারপাশ দেখল। আবার ঢুকে পড়ল ক্যান্টিনে। ক্যান্টিনের ওপাশে কম্পাউন্ড থেকে বেরোনোর একটা পথ আছে। সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে অফিসের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির কাছে এল। দোতলায় উঠে নিজের ঘরে ঢুকে নিশ্চিন্ত হল শেষ পর্যন্ত।

আশ্চর্য, এখানেও গুড়িয়া! মনীশ হাঁপাতে হাঁপাতে ঘাম মুছল কপালের। তার মানে ও রোজ বাবাকে খাওয়াতে আসে!

চেয়ারে বসে গুড়িয়ার কথাই ভাবছিল মনীশ। ওর দৃষ্টি ছিল দক্ষিণের জানলার দিকে। জানলার ব্লাইন্ড সেই সকাল থেকে তোলা। হঠাৎ ওর চোখে ভেসে উঠল গুড়িয়া ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে এল মনীশ। জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গুড়িয়া হাতে টিফিন ক্যারিয়ার নাচাতে নাচাতে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে। পাইনের জঙ্গলের দিকে আঁকা-বাঁকা একটা পথ। সেই পথ দিয়ে গুড়িয়া হাঁটছে যেন এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতে।

গুড়িয়ার হাঁটার ছন্দে মনীশের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। কালকের ঘটনার পর গুড়িয়াকে এই মুহূর্তে হাসি-খুশী দেখে ভীষণ ভাল লাগছে ওর।

জানলার ফাঁক দিয়ে মনীশ ততক্ষণ দেখল গুড়িয়াকে যতক্ষণ না সে পাইনের জঙ্গলের পথ থেকে বাঁক নিয়ে কোয়ার্টারস-এর আড়ালে হারিয়ে গেল।

কলকাতা। মনীশদের বাড়ি।

বাইরে সন্ধ্যে তখন ঘনিয়ে এসেছে। লীলা পাশের ঘরে মাদুরে বসে পড়াশোনায় মগ্ন। উবু হয়ে কিছু লিখছে খাতায়। গায়ত্রী এক কোণে ওর পুরনো সেলাই মেশিনে বাচ্চাদের নতুন জামা তৈরী করতে ব্যস্ত।

লীলা লিখতে লিখতে মাথা না তুলেই বলল, মা তুমি কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে সেলাই করছ। যাও এখন একটু শোও গিয়ে।'

'শুধু শুধু কেন শোবো!' গায়ত্রী মেশিনের হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'আমার এখন শরীর অনেক ভালো।'

'মা!' লীলা মুখ তুলে গম্ভীর স্বরে বলল, 'দাদা থাকলে তুমি পাবতে এতক্ষণ সেলাই করতে? তোমাকে জোর করে তুলে দিত বিছানায়। আমার অত জোর নেই বলে, তুমি যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছ।'

'কে বলল তোর জোর নেই।' গায়ত্রী দাঁতের তলায় কাপড়ের একটা সেলাই কেটে হাসল, 'এখন দিনরাত আমাকে যা বকিস—'

বকবো না? শরীর আবার খারাপ হলে? এখন দাদা নেই—।'

'কিছু হবে না। সে চিন্তা আমারও আছে।' গায়ত্রী আবার মেশিন চালাতে চালাতে বলল 'তোর দাদা চাকরী পেয়েছে। এখন আমার বুকের কত বল্, কত ভরসা!'

'মা!' লীলা খাতা ছেড়ে মাদুরে উঠে বসে বলল 'দাদা একা একা কি করছে বলোতো! খাওয়া দাওয়া, কি জুটছে কে জানে!'

'হ্যাঁরে, ওর চিঠি পেলে নিশ্চিন্ত হতাম। আমার তো এই চিন্তায় ঘুমই হয় না রাতে।'

'তোমার রাতে ঘুম হয় না। আমার দিনগুলোই ভাল কাটে না।' লীলা চারপাশে উদাস দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, 'এই ঘরটা কী ভীষণ ফাঁকা লাগে এখন। দাদা ওই চেয়ারে বসে সব সময় পড়াশোনা করত। আমি মাদুর থেকে কত কিছু জিজ্ঞেস করতাম। অত পড়াশোনার মধ্যেও কখনো বিরক্ত হত না দাদা। সব সময় আমায় বলে দিত। উঠে এসে ভাল করে বুঝিয়েও যেত সব। এখন কেউ নেই বোঝানোর।'

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। গায়ত্রী তাকিয়ে বলল, 'দেখ্ বাকাবাবু বোধহয়।'

লীলা উঠে গেল। বাইরের ঘরে এসে দরজা খুলে দেখল, প্রবীর।

'মাসীমা কোথায়?' ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল প্রবীর।

'ও ঘরে। এস প্রবীরদা!'

প্রবীর ঢুকল পাশের ঘরে। 'মাসীমা, কেমন আছেন?'

'এস এস !' গায়ত্রী উঠল মেশিন ছেড়ে। 'ভাল আছি বাবা। মনীশের কোনো খবর পেলে ?'

'হ্যাঁ মাসীমা ওর চিঠি এসেছে' প্রবীর পকেট থেকে খাম বের করল।

পেছন থেকে ছুটে এল লীলা।

'দাদার চিঠি ! দেখি !' প্রবীরের হাত থেকে খামটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল লীলা। সাদা খামে পোস্টের কোনো ছাপ বা স্ট্যাম্প নেই। শুধু ওপরে লেখা 'শ্রীচরণেষু মা ও স্নেহের লীলা।'

'মা চিঠিটা খুলব ?' লীলা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ খোল্।' গায়ত্রী আনন্দের আতিশয্যে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল পাশে।

খামটা ছিঁড়ে দুটো ভাঁজ করা চিঠি বের করল লীলা। ভাল করে দেখে একটা এগিয়ে দিল মা'র দিকে, 'এটা তোমার।'

গায়ত্রী উৎসুক হাতে নিল চিঠিটা। তারপর মা ও মেয়ে দুজনেই চিঠি পড়তে ব্যস্ত হয়ে গেল। পড়তে পড়তে দুজনেরই মুখে আনন্দ ও নিশ্চিন্তির হাসি ফুটে উঠল।

লীলা পড়া শেষ করে খোলা চিঠিটা বুকের ওপর নিয়ে বলল, 'মা দেখেছ, দাদা কি লিখেছে। শোনো— 'তারপর ও পড়তে শুরু করল, 'মাকে একদম পরিশ্রম করতে দিবি না। ওষুধ-পত্র যেন ঠিক মত খায়। খেয়াল রাখিস। মাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখবি। কাকাবাবু দূরে থাকেন। তুই মায়ের এখন লোকাল গার্জেন।' চিঠি থেকে মুখ তুলে লীলা বলল, 'দেখেছ, আমি এখন তোমার গার্জেন ! লিখে দেবো দাদাকে, তুমি যে ওরকম গাদা গাদা সেলাই করছ ?'

'লিখতে হবে না !' প্রবীর বলল, 'তোমার দাদা নেই তো কি হয়েছে, আমি তো আছি।—মাসীমা— আপনার এত সেলাই করা সত্যি ঠিক হচ্ছে না।'

গায়ত্রী তখন চাকুরে ছেলের কুশল সংবাদ পড়ে আনন্দে আত্মহারা। নিমেষে মেনে নিল। হেসে বলল, 'ঠিক আছে বাবা আর করবো না। ওটা এক মহাজনের পুরনো কাজ ছিল করে দিলাম। মনীশ লিখেছে সামনের মাস থেকে হাজার টাকা করে পাঠাবে। এতো টাকা ! আমি তো ভাবতেই পারছি না ! তাহলে চাকরীটা খুব ভাল ? কি বল ? এত ভাল মাইনে যখন ?'

'হ্যাঁ মাসীমা।' প্রবীর একটা ঢোক গিলে বলল, 'মোটামুটি ভাল।'

ঠিকানাটা যে দিল না।'

'ঘুরে ঘুরে চাকরী, কোথায় কখন থাকে ঠিক নেই।' প্রবীর অন্য দিকে তাকিয়ে বলল 'আমি কাল আবার আসব। আপনারা চিঠি লিখে রাখবেন। পাঠিয়ে দেব—।'

'তুমি কি করে পাঠাবে প্রবীরদা ?' লীলা জিজ্ঞেস্ করল।

'ওদের একটা ব্রাঞ্চ অফিস আছে, এখানে।' প্রবীর ধুতীনিতে হাত ঘষতে ঘষতে বলল, ওখানে সবার চিঠি আসে। ওরাই পাঠিয়ে দেবে।'

'লীলা--' গায়ত্রী ঘুরে বলল, 'প্রবীরদাকে কিছু খেতে দে। তুমি বসো প্রবীর। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?'

'আমি কিছু খাবো না মাসীমা। একদম খিদে নেই।' প্রবীর চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'মাসীমা আপনাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে কিন্তু নিঃদ্বিধায় বলবেন। মনীশ চলে গেছে বলে ভাববেন না আর কোনো ছেলে নেই আপনার।'

'কক্ষনো নয় বাবা। তা ভাবো কেন?' গায়ত্রীর মুখে আনন্দের হাসি। মনীশের চিঠিটা ভাঁজ করে বলল, 'প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই বলব।'

প্রবীর সামনে মাদুরের দিকে তাকাল। লীলার বইপত্র পড়ে আছে।

'তোমার কি মনে হয় চাকরীটা পারমানেন্ট হয়ে যাবে?' গায়ত্রী দেয়ালে ঠেস দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

অস্বস্তির মধ্যে পড়ল প্রবীর। এই চাকরী পারমানেন্ট। কিন্তু মনীশ এটা অস্থায়ী রূপে নিয়েছে। নিজের সংকট কাটা না অব্দি। কিন্তু ওর সংকট আদৌ কাটবে কিনা সেটাও যেমন অনিশ্চিত, তেমনি এভাবে মনীশ কতদিন এই চাকরী করতে পারবে তারও কোনো স্থিরতা নেই।

প্রবীর আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'দেখা যাক্। অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করছে মাসীমা—'

এর মধ্যে লীলা একটা থালায় রুটি তরকারী নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রবীরদা—।'

'কি বললাম?' প্রবীর তাকাল লীলার মুখের দিকে, 'খিদে নেই।'

'দাদার চিঠি নিয়ে এসেছ। কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দেব? লীলার অন্তরঙ্গ স্বর, 'তোমাকে তো আজ মিষ্টি খাওয়ানো উচিত।'

'মিষ্টি খাবো আর তোকে খাওয়াব। যখন শুনব তুই ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছিস।' লীলার হাত থেকে থালা নিয়ে প্রবীর জিজ্ঞেস করল, 'কেমন পড়া হচ্ছে? অসুবিধে হচ্ছে কোথাও?'

'অসুবিধে মানে—' লীলা হাত কচলাতে কচলাতে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

'কি রে! জিজ্ঞেস করার কিছু আছে?' প্রবীর লীলার চোখে চোখ রাখল, 'আমার কাছে লজ্জা কি?'

'তোমার সময় আছে এখন?'

প্রবীর হেসে বলল, 'আমি তো এখনও বেকার। অঢেল সময় আমার।'

'ঠিক আছে তুমি খেয়ে নাও।' লীলার চোখে খুশীর ছটা। উৎফুল্ল হয়ে মাদুরের দিকে এগিয়ে বলল, 'আমি ততক্ষণ চ্যাপটার গুলো বের করি।'

গায়ত্রী এক গ্লাস জল এনে রাখল প্রবীরের থালার পাশে।

তামিয়া। দুপুর সাড়ে বারোটা।

মনীশ ওর অফিস ঘরে বসে একান্তে চিঠি লিখছে প্রবীরকে।

প্রবীর।

তোদের চিঠি পেয়ে কি যে ভাল লাগছে, ভাষায় বোঝাতে পারব না। মা,ও

লীলাকে ছেড়ে একদিনও কাটাইনি কোথাও। আজ পনেরো দিন হয়ে গেল, আমি ও:দের সঙ্গ ছাড়া। ওদেরও যে কি কষ্ট হচ্ছে তা প্রতি মুহূর্তে আমি অনুভব করি। তবে ওদের একটা সান্ত্বনা, আমি চাকরীর জন্য দূরে চলে এসেছি। আর আমার কাছে এই চাকরী যন্ত্রণার সমান। অপরাধবোধের জ্বালায় অহরহ জ্বলছে আমার মন। সব সময় মনে হয় দেশের আইনভঙ্গকারী অন্যান্য অপরাধীদের সঙ্গে আমার কোনো পার্থক্য নেই। ভাবতে গেলেই সব ছেড়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ফিরবই বা কোথায়? সেখানেও তো অতল মৃত্যু, ঘোর অন্ধকার।

যাক্, এখানে ছ'মাস না হলে আমি ছুটি পাব না। তাই ছ'মাসের আগে বাড়ি যেতে পারব না। এই ছ'মাস কিভাবে যে কাটবে বুঝতে পারছি না। তবে আমার পক্ষে একটাই আশ্বাস, বাড়িতে এখন ভাল টাকা পাঠাতে পারব। অভাবে থেকে এইটুকু বুঝতে পেরেছি, অর্থ হল সর্ব যন্ত্রণা-নিবারক-ওষুধ। এই অর্থ দিয়ে মায়ের চিকিৎসা হবে, লীলার পড়াশোনা হবে। ওরা একটু ভাল মন্দ খেয়ে থাকতে পারবে। বেকার হয়ে ওদের কাছে থেকে কী লাভ? মনের যন্ত্রণা সেই কথা ভেবেই কিছুটা লাঘব হয়। শুধু বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পাচ্ছি না। আমি নতুন চাকরীর দরখাস্ত ছ'মাস পরেই করব। কারণ, ইন্টারভিউ দিতেও ছুটির প্রয়োজন আছে। নিজের নামে ইন্টারভিউ এখান থেকে আবার লুকিয়ে দিতে হবে। আমার অদ্ভুত পরিস্থিতি! কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে। এই মৃত্যু-কূপ থেকে আমি খুব তাড়াতাড়ি পরিত্রাণ চাই।

মনীশ এই পর্যন্ত লিখে হঠাৎ দক্ষিণের জানলার দিকে তাকাল। অবশ্য ওর এই তাকানোটা ওর অজ্ঞানতেই দিনের কতগুলো নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে যায়।

মনীশ জানলার খোলা ব্লাইন্ড দিয়ে দেখল, গুড়িয়া সেই আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে নীচে নামছে। চিঠি লেখা বন্ধ করে তাকিয়ে রইল মনীশ। গুড়িয়া ওর বাবার খাবার নিয়ে কোয়ার্টার থেকে অফিসের দিকে আসছে। সেই একই ছন্দে, প্রায় নাচতে নাচতে আপন মনে হেসে উঠল মনীশ।

ওর চোখে ভেসে উঠল, সকাল ন'টার সময় গুড়িয়ার বাবার হাত ধরে নীচে নামাটা। তখন কত সংযত গুড়িয়া, কত ধীর-স্থির। ওই একই পথ দিয়ে নামে অথচ সামলে সুমলে। ধীর পদক্ষেপে বাবার সঙ্গে নানারকম গল্প করতে করতে। কথাগুলো তো আর শুনতে পায় না মনীশ। কিন্তু গুড়িয়ার ঠোঁট নাড়া, গুড়িয়ার হাসি, একাগ্র দৃষ্টিতে সে লক্ষ্য করে এই চেয়ারে বসে বসে। দুটো ভিন্ন সময়ে একই মেয়ের দুটো পদ-সঞ্চারে কত পার্থক্য। ভাব ভঙ্গী কত বিপরীত। সকালে যে ধীর বহমান নদী। সেই দুপুরে হয়ে যায় খরস্রোতা ঝরনা।

গুড়িয়া এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতে অনেক কাছে এসে গেল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল জানলার পরিধি থেকে। মনীশ ঝুঁকে প্রবীরের চিঠির সারাংশটা লিখল এবার।

প্রবীর, তামিস্রা অতুলনীয়া। কিন্তু অরবিন্দ রূপে সে আমায় গ্রহণ করে নি।

আমি মনীশের চোখে মাঝে মাঝে তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি। দেখতে এত ভাল লাগে। এমন অনুভূতি কোনোদিনই হয়নি আমার জীবনে। কে জানে এই দেখাটাও অপরাধ কিনা। কারণ তাঁমণ্ডা আমায় চায় না। মনীশকে সে জানে না। কোনদিন জানতেও পারবে না। এটাই আমার দুঃখ।

আর কি? তোদের চিঠির আশায় রইলাম।

মনীশ।

চিঠিটা ভাঁজ করে শার্টের পকেট থেকে আরো দুটো চিঠি বের করল মনীশ। এই দুটো কাল রাতে কোয়ার্টারে বসে মা ও লীলাকে লিখেছে। তিনটে চিঠি একটা খামে পুরে প্রবীরের ঠিকানা লিখতে শুরু করল সে।

নিউ ইয়র্ক। সময় দুপুর।

প্যান অ্যাম এয়ারওয়েজের টোকিও-দিল্লী লণ্ডন-নিউইয়র্ক রুটের বোয়িং সেভেন ফোর সেভেন প্লেনটা জেএফকে এয়ারপোর্টে নির্ধারিত সময়ের মিনিট দুই পরে নামল।

ইমিগ্রেশন চেক আর কাস্টমস-এর বাধা অতিক্রম করে অরবিন্দ হাতে সুটকেশ নিয়ে আর রঞ্জনা ব্যাগ কাঁধে অ্যারাইভাল লাউঞ্জের বাইরে এসে দাঁড়াল।

অরবিন্দর পরনে উলের স্যুট। রঞ্জনার গায়ে শালওয়ারের ওপর গাঢ় মেরুন রঙের টেরিউলের ওভার কোট। রঞ্জনা অরবিন্দর চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের বড়। ফরসা, স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ ওর চেহারা। চোখের কোলে কপালে কিঞ্চিৎ মেদের আস্তরণ আছে। তবে তাতে ওর সৌন্দর্যের কোনো হানি হয়নি। বরং আকর্ষণীয় এক মাদকতা এনেছে। যে মাদকতা ওর চোখের দৃষ্টিতেও হাতছানি দেয়।

মার্চের হাড় কনকনে শীতের হাওয়ায় মিনিট খানেক দাঁড়াতেই রঞ্জনা দেখল, সুমিত গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসছে। সুমিত ওদের পাশে এসে চটপট সামনের ও পেছনের দুটো দরজা খুলে বলল, 'কুইক! গেট ইন!'

রঞ্জনা ও অরবিন্দ দ্রুত ঢুকে পড়ল ভেতরে। অরবিন্দ সামনে। রঞ্জনা পেছনে। এক্সিলরেটরে চাপ দিয়ে গাড়ি এগিয়ে নিল সুমিত। সুমিত রঞ্জনার সমবয়সী। লম্বা দোহারা চেহারা।

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সুমিত বলল, 'বাড়ি থেকে টাইম ক্যালকুলেশন করতে করতে আসছি। যাতে তোদের বেরনোর সঙ্গে আমার পৌঁছনোর সময়টা সিঙ্ক্রোনাইজ করে যায়। তবু রাস্তায় দুটো চক্কর দিতে হল।'

'কতক্ষণ আগে এসেছ?' রঞ্জনা জিজ্ঞেস করল।

'দু'মিনিট।' সুমিতের উত্তর।

রঞ্জনা সামনে অরবিন্দর পিঠে টোকা মেরে বলল, 'এখানে গাড়ি পার্ক করা বড় সমস্যা, বুঝলে!'

'বুঝেছি।' অরবিন্দ সুমিতের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

রঞ্জনা বলল, 'দাদা পরিচয় করিয়ে দিতে হবে?'

'মোটেই না।' সুমিত সামনের বাঁকটায় স্টিয়ারিং সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে গাড়ি ডান

দিকের রাস্তায় নিয়ে এল। তারপর অরবিন্দর দিকে ঘুরে এক ঝলক তাকিয়ে হেসে বলল 'তোর চিঠিতে ওর সম্বন্ধে এত কথা লিখেছিস মনে হচ্ছে কত চেনা। মিঃ সেন, আমাকেও কি চেনা লাগছে আপনার ?'

অরবিন্দ এবার হাসল না। স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমাকে ঠিক যেভাবে চিনতে পারলেন অতটা নয়।'

সুমিত হেসে উঠল সজোরে। গাড়ির গতি বাড়িয়ে বলল, 'বুঝেছি। রঞ্জনা আমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেনি আপনাকে।'

'কি বলব ?' রঞ্জনা বলল, 'তোমার সঙ্গে ওর দেখা হবে জানি। তবে ওকে নিয়ে হয়ত একটু বেশী লিখেছি। তার কারণ, আয় লাভ অরবিন্দ। উই আর গোয়িং টু সেট্‌ল্ ইন ইয়ু এস এ।'

'জানি, জানি।' সুমিত মৃদু হেসে বলল, 'তোর চিঠির প্রতিটি আঁচড়ে আমি তার আভাস পেয়েছি।'

অরবিন্দ তখন চারপাশে আমেরিকান জৌলুষের প্রথম ধাক্কাটা চোখে সামলাতে ব্যস্ত। শুধু চোখ নয় বার বার ঘাড়টাকেও তুলতে হচ্ছিল ওকে। আমেরিকান জাঁক-জমকের আকাশ চুম্বি মাপটা বুঝে নিতে।

গাড়ি ততক্ষণে নিউ জার্সির রাস্তা ধরে ফেলেছে।

সুমিত গাড়ির গতি স্পিডোমিটারে নব্বইয়ের ওপর তুলে রঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি রে নিউ ইয়র্কের পরিবর্তন এবার কিছু দেখছিস ?'

'কিছুই না।' রঞ্জনা উত্তর দিল, 'আর কি পরিবর্তন হবে ? নিউইয়র্ক এখন স্যাচুরেটেড।'

'তা যা বলেছিস !'

অরবিন্দ হঠাৎ ঘুরে বলল, 'এই নিয়ে তোমার পাঁচবার আসা হল, রঞ্জনা ?'

রঞ্জনা একটু চমকে তাকাল। অরবিন্দ অবশ্য জানে যে রঞ্জনা এর আগেও নিউ-ইয়র্ক এসেছে। কিন্তু কতবার, সেটা কখনো বলেনি রঞ্জনা।

রঞ্জনা বুঝল। এয়ারপোর্টে, অরবিন্দ ওর পাসপোর্টের এণ্ট্রিগুলো লক্ষ্য করেছে।

'হ্যাঁ পাঁচবার।' রঞ্জনা ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'দাদার ডাকেই আসতে হয় বার বার ! এবার তোমার জন্য এলাম।'

এটা যে কত বড় মিথ্যে সুমিত ও রঞ্জনা ছাড়া তারাই জানে যারা এর আগের চার বার রঞ্জনার সঙ্গে এসেছিল। রঞ্জনা প্রতিবারই নতুন নতুন পুরুষসঙ্গী নিয়ে আসে স্টেটস-এ। এবার যেমন অরবিন্দকে নিয়ে এসেছে। এবং সুমিত ও রঞ্জনা ভাই-বোন আদৌ নয়। আবার বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীও নয়। যদিও গোপনে গোপনে ওরা থাকে স্বামী-স্ত্রীর মতই। বাইরে ভাই-বোন। এই মিথ্যে সম্পর্কের মুখোশ ওরা স্টেটস-এও ধারণ করে আছে ওদের পেশার স্বার্থে। ওদের একমাত্র পেশা ভারতীয়দের বিভিন্ন উপায়ে প্রতারণা করা।

তার মধ্যে একটি কৌশল, স্টেটস-এর লোভ দেখিয়ে ভারতবর্ষ থেকে ধনী ছেলেদের ধরে আনা। এ ব্যাপারে লোভের টোপটি ফেলে রঞ্জনা। রঞ্জনা ওদের খরচেই আসে

এখানে। তারপর ওদেরই মূলধনে স্টেট্স্-এর রঙীন জীবনের স্বাদে প্রত্যেককে উদ্দীপ্ত করানো হয়। শেষ পর্যন্ত যখন ধনীর দুলালেরা এই স্বপ্নের দেশে থেকে যেতে চায়, সুমিত ওদের স্টেট্স্-এ স্থায়ীরূপে থাকার জন্য চাকরী ও গ্রীন কার্ডের ব্যবস্থা করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে প্রতিটি আগন্তুকের সর্বস্ব আত্মসাৎ করে এরা। এবং নাটকের শেষ অঙ্কে চাকরী ও গ্রীনকার্ডের ব্যবস্থা না হওয়ার সংবাদ দিয়ে প্রত্যেককে ফেডারেল পুলিশের ভয় দেখানো হয়। কারণ তখন সবার ভিসার মেয়াদ প্রায় শেষ। রঞ্জনা অবশ্য ওদের দেশে ফেরার টিকিট অনেক আগেই কেটে রাখে। পুলিশের ভয়ে শেষ পর্যন্ত সেই টিকিট হাতে ভারতের প্লেন ধরতে ছোটে সবাই।

এযাবৎ চারজনের বেলায় ঘটনা এভাবেই ঘটেছে। কিন্তু এবার দাবার ঘুঁটি অরবিন্দর হাতে।

অরবিন্দ এদের ষড়যন্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর না রাখলেও অন্তত একজনের কাহিনী বিশদভাবে জানে। তার নাম সাহিল বাজাজ। যাকে নিয়ে রঞ্জনা গত বছর এসেছিল স্টেট্স্-এ।

সাহিলের সঙ্গে অরবিন্দর দেখা হয়েছিল দিল্লীর এক ডিসকোথেক ক্লাবে। সাহিল সবে স্টেট্স্ থেকে ঘুরে এসেছে শুনে স্টেট্স্-এ যাওয়ার ব্যাপারে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল অরবিন্দ। সাহিল তখন ওর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা খোলাখুলি বলে অরবিন্দকে। অরবিন্দ অন্য ধাতের মানুষ। ভিন্ন উপাদানে তৈরী। সে সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনার ঠিকানাটা সাহিলের কাছ থেকে জেনে নেয়। তারপর ওর নিজস্ব ভঙ্গীতে, কায়দা মাফিক রঞ্জনার সঙ্গে যোগাযোগ করে।

বিদেশে আসার ব্যাপারে অরবিন্দর কাছে ওর মা তখন পথের বাধা। স্টেট্স্-এ অরবিন্দর আত্মীয়স্বজন পরিচিত যারা আছে তারা কেউ অরবিন্দর মায়ের নির্দেশে এব্যাপারে ওকে সাহায্য করতে প্রস্তুত নয়। কারণ, সানফ্রান্সিসকোতে এইড্স-এ আক্রান্ত হয়ে অরবিন্দর দাদার মর্মান্তিক মৃত্যু। তাই রঞ্জনার সাহায্যের তখন খুবই প্রয়োজন অরবিন্দর।

যথারীতি এই প্রয়োজনেই দুই খেলোয়াড়ের যোগাযোগ হল। রঞ্জনা সব খেলাতেই পটু। সে বহু চক্রের মক্ষীরানী। তেমনি অরবিন্দ। মধু পান করতে ওরও কোনো জুড়ি নেই। বরং ওর জীবনে প্রতি মুহূর্তে প্রতি ক্ষণে নতুন নতুন মক্ষীরানীর বড় প্রয়োজন। গত তিন মাস ধরে রঞ্জনাকে সে উপভোগ করে আসছে। রঞ্জনাও উপভোগ করেছে অরবিন্দকে। বন্ধুত্বের খোলসটি তারপর ভালবাসার খোলসে পরিণত হয়। কেউ কাউকে বুঝতে দেয় না যে সবই খেলা। এই খেলা খেলতে খেলতেই ওরা শেষ পর্যন্ত স্টেট্স্-এ এসে পৌঁছল।

সুমিতের গাড়ি ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে নিউ জার্সির দিকে। তিন মূর্তি কিছুক্ষণের জন্য নীরব। এদের মধ্যে শুধু সুমিত ও রঞ্জনা তখন ভাবছে, জালে যে শিকারটি এসে পড়ল তাকে কিছুদিন দানা পানি খাওয়ানোর কি ব্যবস্থা করা যায়।

অরবিন্দ নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত। নিরাসক্ত চেহারায় সে বসে আছে সিটে। রঞ্জনা ও

সুমিত কেউই টের পেল না যে অরবিন্দ এখন ভেতরে ভেতরে হাসছে। হায়েনার গোপন হাসিতে ফেটে পড়ছে ওর বুকের পাঁজর।

দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল।

তামিয়ার নতুন কর্মজীবনের সঙ্গে অরবিন্দ সেন-রূপে মোটামুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ল মনীশ। এখানে চারপাশে অহরহ অরবিন্দ কিংবা মিঃ সেন শুনতে শুনতে সে নিজেই নিজের আসল নাম প্রায় ভুলতে বসেছে। মনীশ নামটা এখন কলকাতায় চিঠি লেখার সময় ছাড়া আর ব্যবহার হয় না। তাছাড়া কলকাতা থেকে যখন চিঠি আসে—মা, কাকাবাবু ও প্রবীরের মনীশ সম্বোধনে নিজের অস্তিত্ব সে খুঁজে পায়। নিজের জন্মগত পরিচয় ও প্রকৃত সত্তা এভাবে হারানোর যন্ত্রণা সেদিন আরো অসহ্য হয়ে ওঠে যেদিন সে অরবিন্দর নামে মাইনেটা হাতে নেয়।

এই জ্বালা থেকে ক্ষণিকের জন্যেও মুক্তি নেই মনীশের। দিন যত যায় নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পায় মনীশ।

একমাত্র সেদিন এই দংশন একটু লাঘব হয় যেদিন মনীশ প্রবীরের কাছে মা'র নামে এক হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টটা পাঠায়। কিন্তু অপরাধবোধের জ্বালাটা থেকে যায় মনের অতলে।

এই তিন মাসে তামিয়ায় ওর পরিচিতি কিন্তু কিছুই বাড়েনি। একমাত্র কারখানার কিছু শ্রমিকের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়া ছাড়া। পরিচিতিটা নিজেই বাড়াতে চায় নি মনীশ। কিছুটা নিজের পরিচয়-সংকটের জন্য। আর কিছুটা অনুতাপ-অনুশোচনার লজ্জায়। রাজেশভাইয়া ও সঙ্গীতাভাবীর সঙ্গে প্রথম দিন যেটুকু পরিচয় হয়েছিল তাও সে লোপ করে দিয়েছে ওর এই ক'দিনের ব্যবহারে। তার কারণ অবশ্য ভিন্ন। এবং সেই কারণেই অফিসে রাজেশভাইয়ার সঙ্গে সে বিশেষ কথা বলে না। কারণ মনীশ জানে সে যেমন মানুষ, বেশি কথা বললেই সম্পর্ক আবার গাঢ় হবে। রাজেশ ভাইয়া তখনই তাকে টেনে নিয়ে যাবে তার কোয়ার্টারে।

এর মধ্যে একদিন তামিয়ার এক মেলায় সঙ্গীতাভাবীর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল মনীশের। মনীশ তখন লীলার জন্য একটা হিমাচলী বটুয়া কিনছিল। সঙ্গীতাভাবীও কিনতে এসেছিল সেই দোকানে। সাথে গুড়িয়া। সঙ্গে সঙ্গে মনীশ সেখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে যায়।

শুধু কারখানার নীচু স্তরের শ্রমিকদের মধ্যে মনীশের জনপ্রিয় হওয়ার কারণ ওর অফিসের কাজের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র। সোয়াব কোম্পানীর কারখানায় তামিয়ার আশেপাশের গ্রাম থেকে বেশ কিছু শ্রমিক আসে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কাজে অনিয়মিত। অনুপস্থিত থাকে মাঝে মাঝে। কেউ কেউ কখনো কখনো দেরী করে আসে ডিউটিতে। সোয়াব কোম্পানীর নিয়মকানুন খুব কড়া। সেই নিয়ম অনুযায়ী মনীশকে মাঝে মাঝেই এদের নামে শাস্তিমূলক আদেশ দিয়ে চিঠি পাঠাতে হয়। কারো মাইনে কাটার নির্দেশ যায়। কাউকে সাবধান করতে হয়, বেশি অনিয়ম করলে চাকরী থেকে বরখাস্ত হতে হবে জানিয়ে। মনীশ পুরনো ফাইলপত্র ঘেটে

দেখেছে, এর মধ্যে ওর আসার আগে এই কারণে বেশ কয়েকজন শ্রমিক চাকরী হারিয়েছে। কিন্তু যেহেতু মনীশ একটা চাকরীর মর্ম তার জীবন দিয়ে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে চাকরী না থাকলে একটা পরিবারে অভাবের দহন কত নিষ্ঠুর কত নির্মম হতে পারে। তাই সে এধরনের চরমপত্র ছাড়ার আগে সেই শ্রমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। যোগাযোগ করে তাদের সমস্যা অসুবিধে জানতে চায়। তারপর সে আপ্রাণ চেষ্টা করে, সেই সমস্যা সেই অসুবিধের সমাধান করে যদি সেই শ্রমিককে কাজে নিয়মিত করা যায়। এই ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে সে ইতিমধ্যে কয়েকজনকে কোম্পানীর ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন থেকে বাঁচাতে পেরেছে।

এই সব সমস্যা অসুবিধের মধ্যে প্রধান কারণ, দূর দূর পাহাড়ী গ্রাম থেকে আসা যাওয়া। নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগে, তীব্র বর্ষায় কিংবা পাহাড়ে ধস নামায় অনেকেই ঠিক মত কাজে যোগ দিতে পারে না। তাছাড়া এরা সবাই সভ্যতা থেকে বহু দূরে থাকে বলে তাদের পুরোনো অভ্যেস, নিয়মের ছকে না আসার প্রবণতা, অসুখবিসুখ তো রয়েছেই।

যাই হোক, এই ব্যক্তিগত যোগাযোগের জন্যই মনীশ এই তিন মাসে এদের খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছে। শ্রমিকেরা তাই অরবিন্দ সেনকে অর্থাৎ মনীশকে ঠিক অফিসারের চোখে দেখে না। ভাবে নিজেদের এক আপনজন বলে।

সেদিন এরকমই একজন শ্রমিক মনীশের চেম্বারে এল।

'সাহেব!'

গলাটা শুনে মনীশ টেবিলের খোলা ফাইল থেকে মুখ তুলে তাকাল।

'হুজুর, আপনি আমাকে তলব করেছেন—' সে একটা ভাঁজ করা খাম ঝুঁকে টেবিলের ওপর রাখল।

খামটা হাতে নিয়ে মনীশ ভেতরের চিঠিটা বের করে খুলে দেখল, ওরই সই করা একটা ডিসিপ্লিনারি মেমো।

লোকটির নাম মহাবীর সিং। কারখানায় পরপর দুমাস সে পাঁচ বারে মোট ষোলো দিন ছুটি নিয়েছে। তাই কোম্পানীর সার্ভিস রুল অনুযায়ী সাকসেনা সাহেবের নির্দেশে তাকে এই শাস্তিমূলক চিঠিটি দিতে বাধ্য হয়েছে মনীশ। এই চিঠি অনুযায়ী মহাবীরকে বলা হয়েছে ওর প্রাপ্য তিনদিন ছুটি বাদ দিয়ে তেরো দিনের পারিশ্রমিক ওর আগামী মাসের মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হবে। এবং ভবিষ্যতে এভাবে যদি বার বার ও ছুটি নেয় তাহলে ওকে প্রথমে সাসপেণ্ড করা হবে এবং শেষ পর্যন্ত বরখাস্তও করা যেতে পারে।

এই চিঠিটা ইস্যু করেই মনীশ কারখানায় মহাবীরের ইনচার্জকে ফোন করে বলেছিল ওকে একবার পাঠিয়ে দিতে।

মনীশ চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, তুমি পাঁচ বারের ছুটিতেই কারণ দেখিয়েছ মা'র অসুখ। কারণটা সত্যি?'

'জী হুজুর!' মহাবীর মাথা ঝাঁকিয়ে দেহাতী স্বরে জবাব দিল।

'অসুখ প্রতিবার লিখেছ বুখার। বার বার বুখার আসে?'

'জী।'

'ডাক্তার কি বলছেন?'

'ডাগতর আমার গাওঁয়ে নেই হুজুর। বৈদ্য মহারাজ আছেন। তিনি বলেছেন শখত বিমারী। ঠিক হতে দেরী লাগবে।'

'কোথায় থাক তুমি?'

'জী দাঁতলা।'

'কোথায় দাঁতলা?'

'ওই যে সাহাব তিনটে পাহাড় দেখছেন।' মহাবীর দক্ষিণের জানলা দিয়ে কোয়ার্টার্স-এর পেছন দিকটা দেখাল, 'এদিকের পাহাড়ীর নাম মৌলী। তারপর বারকুই ও দুটোর বিচোবিচ আমার গাঁও দাঁতলা।'

'ওখান থেকে তুমি কারখানায় আস?'

'জী?'

'কতদূর এখান থেকে?'

'দু কোশ হুজুর। ঘণ্টা ভর লাগে।'

মনীশ একটু ভাবল। এভাবে আর দু-একবার ছুটি নিলেই ছেলেটার চাকরী চলে যাবে। সাকসেনা সাহেব সে-রকমই অর্ডার দিয়েছেন। সাকসেনা সাহেবের ধারণা মায়ের অসুখ-টসুখ সব অজুহাত। মহাবীরের আসলে চাকরী করার ইচ্ছে নেই। ওর গ্রামে নিশ্চয়ই ক্ষেত খামার আছে। তাছাড়া স্বভাবে হয়ত কুঁড়ে, নেশা-ভাঙও করতে পারে। কিন্তু মহাবীরকে দেখে মনীশের তা মনে হল না।

মনীশ সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, 'মহাবীর তোমার কি নৌকরী ভাল লাগছে না? ছেড়ে দেবে ভাবছ?'

'কভী নহী হুজুর!' মহাবীর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'নৌকরী না থাকলে আমি মরে যাবো।'

'কেন তোমার অন্য আমদানি নেই?'

'কিছু নেই হুজুর।'

'কিন্তু এভাবে গয়ের হাজিরী করলে তোমার চাকরী তো থাকবে না।'

'আমি আর গয়ের হাজিরী করব না হুজুর।' মহাবীর উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, 'আর কভী করবো না!'

'তোমার মায়ের আবার বুখার হলে?'

'হুজুর মায়ের বুখার সব দিন থাকে।' মহাবীর অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল মনীশের দিকে। একটা দুঃখসূচক ভঙ্গীতে বলল, 'যখন তবিয়ত আগুন হয়, একদম চলতে ফিরতে পারে না তখন আমি গয়ের হাজিরী করি। তবে আর করব না।'

'আজ তোমার কোন্ ডিউটি?' মনীশ জিজ্ঞেস করল।

'জী এক নম্বর শিফট।' তার মানে সকাল ছটা-দুটো।

'ডিউটির পর কিছুক্ষণ থাকতে পারবে?' মনীশ বলল, 'আমি আজ তোমার সঙ্গে তোমার গাওঁয়ে যাব।'

'গাও' যাবেন ?' মহাবীর থতমত খেয়ে তাকাল, 'কেন হুজুর ?'

'তোমার মা'কে দেখতে ?'

মহাবীর হা করে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। ওর অবিশ্বাসের চোখ। আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'হুজুর গাঁও আমার অনেক দূর। আপনার যেতে বহুত সময় লাগবে। রাত হয়ে যাবে।'

কিন্তু মনীশ ছাড়ার পাত্র নয়। ঠিক হল আগামী রবিবার, অর্থাৎ পরশুদিন সকাল ছ'টায় মনীশকে মহাবীর নিয়ে যাবে। শনিবার সেজন্য মহাবীরের রাতের ডিউটি অর্থাৎ রাত দশটা-ছটা মনীশই কারখানায় ওর ইনচার্জকে ফোন করে ব্যবস্থা করে দিল।

মহাবীর প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত সব ব্যবস্থা যখন হল, মনীশের আন্তরিক ইচ্ছেটা জেনে বেশ উত্তেজিত মন নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল চেম্বার থেকে।

তার একটু পরেই সাকসেনা সাহেবের চেম্বারে মনীশ রিপোর্ট করল। কারণ মহাবীরের ব্যাপারে মিঃ সাকসেনার কড়া নির্দেশ ছিল, আর পনেরো দিনের মধ্যে মহাবীর যদি একদিনও ছুটি নেয় ওকে সাসপেণ্ড করতে হবে। তারপর বরখাস্ত।

সব শুনে সাকসেনা সাহেবও অবিশ্বাসের চোখে তাকালেন, 'আপনি ওর বাড়ি যাবেন, ওর গ্রামে ?'

'ইয়েস স্যার।' মনীশ বলল।

'ডু ইউ নো এদের গ্রাম কতদূর এখান থেকে? কত টাফ্ পাহাড়ী পথ সেখানকার ?'

'সেজন্যই যাচ্ছি স্যার।' মনীশ চোখে-মুখে সহানুভূতির আভাস এনে বলল, 'এত দূর থেকে এত কঠিন পথ পেরিয়ে ওরা চাকরী করতে আসে। নিশ্চয়ই অভাবের তাড়নায়। এই অভাব ওরা সামলাবে কি করে যদি ওদের চাকরী চলে যায়।'

'কি করবেন সেখানে গিয়ে ?'

'একবার চেষ্টা করে দেখি, যদি ওর সমস্যার সমাধান করতে পারি।'

সাকসেনা সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, 'মিঃ সেন আপনার চাকরী কোম্পানীর সমস্যা সমাধানের জন্য, ওদের নয়। মনে রাখবেন, এই সব ইরেগুলার এমপ্লয়িজদের বরখাস্ত করলেই কোম্পানীর সমস্যার সমাধান হবে।'

মনীশ কিছু না বলে নত মুখে বেরিয়ে গেল চেম্বার থেকে।

রবিবার মহাবীরের ডিউটি শেষে সকাল ছ'টার একটু পরেই মনীশ রওনা হল মহাবীরের গ্রাম দাঁতলার উদ্দেশ্যে। ওদিক থেকে আরো অনেক শ্রমিক আসে এই কারখানায় কাজ করতে। তাদের দল এগিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর দুজনে হাঁটা শুরু করেছিল। কোয়ার্টারস্ ও পাইনের জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে সেই আঁকা-বাঁকা রাস্তাটা।

কোয়ার্টারস্-এর গা ঘেঁষে ছোটো এক গিরিশিরায় উঠে রাস্তাটা নেমে গেছে হঠাৎ।

তারপর আবার চড়াই। এই চড়াইয়ের পরেই বাঁ দিকের ঢালে মৌলী লেক। আঁকা বাঁকা পথ থেকে আরেকটা সরু পথ লেকের দিকে নেমে গেছে। আর এই পথ এগিয়ে মৌলী পাহাড়টাকে বেষ্টন করে চলে গেছে দাঁতলার দিকে।

লেক পেরিয়ে মনীশ মিনিট কুড়ি হাঁটার পরেই মুগ্ধ হয়ে গেল। ওর চারপাশে এখন অন্য জগৎ। ঘন জঙ্গল, গিরিখাত আর নতুন নতুন পাহাড়ের সারি। পেছনে কোয়ার্টারস্, কারখানার ছাউনি সব উধাও। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু পাখির কিচিরমিচির আর দূরে অদূরের ঝরনার আওয়াজ শুনতে শুনতে মনীশ বিভোর হয়ে হাঁটছিল। বহু চড়াই উতরাই দু-দুটো ঝরনার জল পেরিয়ে তারপর ওরা দাঁতলায় গিয়ে পোঁছল। মনীশ তখন রীতিমতো ক্লান্ত। দু-ঘণ্টার কাছাকাছি হাঁটা হয়ে গেছে। হাঁপাচ্ছে সে। এতক্ষণ অবশ্য মহাবীর যতবারই পেছন ফিরে বলেছে, 'সায়েব তকলীফ হচ্ছে? একটু জিরোবেন?' মনীশ প্রতিবার হেসে ইশারায় শুধু এগিয়ে যেতে বলেছে।

শেষে আর যখন পারছিল না ঠিক তখনই মহাবীর পেছন ফিরে বলল, 'সায়েব, এসে গেছে।'

মনীশ ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল, সামনে বারকুই পাহাড়ের কোলে দাঁতলার প্রথম কুঁড়েঘরটা। পা দুটো আবার সতেজ হয়ে উঠল ওর। এগিয়ে গেল দীর্ঘ পদক্ষেপে।

সঙ্গীতা হাতে একটা ঢাকা রেকাবী নিয়ে ওর কোয়ার্টার থেকে বেরলো। ওদিকে গুড়িয়াও হাতে একটা ঢাকা ডিশ নিয়ে ওর কোয়ার্টার থেকে বেরলো।

পরস্পরের গেটের দিকে যেতে গিয়ে ওদের মুখোমুখি দেখা।

'কি নিয়ে আসছিস?' জিজ্ঞেস করল সঙ্গীতা।

'আলু পরোটা।' গুড়িয়া বলল।

'বাঃ আমিও নিয়ে যাচ্ছি আলু পরোটা।'

'তোমার তো আজ নাশ্তা বানানোর কথা নয় ভাবী?' গুড়িয়া বলল।

'কেন গত রবিবার কে করেছিল?'

'তুমি। মনে নেই? কচুরী ভাজী করলে?'

রাজেশ মেহেদীর বেড়ার ভেতর বসে নিজের বাগানের পরিচর্যা করছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গীতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে ভুলের রোগ তোমারও ধরেছে?'

'ধরবে না?' সঙ্গীতা ঘুরে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে যে এতদিন ঘর করছি।'

'ঘর করে ভাল গুণটা তো নিতে পারলে না আমার।'

'কি ভাল গুণ তোমার শুনি?'

'লোকে বলে, আমি কত নম্র ভদ্র। কি সুন্দর মিষ্টি করে কথা বলি। তুমি বলতে পার না সেভাবে?'

'দেখো—!' সঙ্গীতা চোখ পাকিয়ে কি যেন বলতে গেল।

গুড়িয়া থামাল, 'ভাবী, আগে সমস্যার সমাধান করো। নাশ্তা যে ডবল। তুমিও করেছ। আমিও করেছি। এত খাবে কে ?'

'একটা কথা বলি ?' সঙ্গীতা বলল, 'কিছু এখন খেয়ে নি। বাকীটা নিয়ে চল্ মৌলী লেকে যাই। ওখানে বেড়াবো ঘুরবো তারপর বসে খাব। পিকনিক হয়ে যাবে লাঞ্চও হয়ে যাবে।'

'চমৎকার!' লাফিয়ে উঠল গুড়িয়া। রাজেশের দিকে ঘুরে বলল, 'যাবে তো রাজেশভাইয়া ?'

'কি করে যাবো ? আমি এখন বাগান করছি।' রাজেশ বেশ গম্ভীর।

সঙ্গীতাও গম্ভীর স্বরে বলল, 'বাগান পরে করলেও চলবে।'

'হবে না—' রাজেশ আবার বসতে যাচ্ছিল বাগানে।

গুড়িয়া ওর দিকে ঝুঁকে হাত ধরে অনুরোধের স্বরে বলল, 'মেনে নাও রাজেশ ভাইয়া, তুমি তো খুব নম্র ভদ্র।'

রাজেশ ঘুরে তাকাল গুড়িয়ার দিকে। তারপর মুচকি হেসে বেড়ার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে গুড়িয়ার বিনুনী ধরে টান দিয়ে বলল, 'তুই হচ্ছিস মোস্ট নটি গার্ল—'

দাঁতলায় মহাবীরের কুঁড়েঘরে ওর অসুস্থ মায়ের বিছানার সামনে বসে আছে মনীশ। মহাবীরের মা শতচ্ছিন্ন মলিন একটা কাঁথার ওপর গুটিশুটি শুয়ে। অবস্থা খুবই শোচনীয় তাঁর। দীর্ঘদিনের জ্বরে কালো থমথমে মুখ। রক্তহীন রুগ্ন শরীর। ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মনীশের দিকে।

মনীশ তাঁর মাথায় কপালে হাত দিয়ে দেখল, সত্যি জ্বর এখনও রয়েছে।

'বুখার তো ভালই আছে মহাবীর।' মনীশ ঘুরে বলল, 'কতদিন হল এই অবস্থা ?'

'জী চার কুড়ি দিন!' মহাবীর জবাব দিল।

চার কুড়ি দিন! মানে প্রায় তিন মাস! মনীশ চিন্তিত হল। লক্ষণ মোটেই ভাল নয়।

'হুজুর, বৈদ্য মহারাজকে ডেকে আনব ? আপনি কথা বলবেন ?'

'না মহাবীর।' মনীশ গম্ভীর হল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি খুব ভুল করেছ। তামিয়ায় যখন ডাক্তার আছে তোমার বৈদ্যের ভরসায় পড়ে থাকা ঠিক হয়নি।'

'সায়েব মা বৈদ্য মহারাজকে ছাড়তে চায় না।'

'হ্যাঁ মৃত্যু যখন টানবে তখনই তিনি ছাড়বেন তাকে।' মনীশ রাগতস্বরে বলল, 'তোমরা তাই করো। বাস করো নতুন জমানায়, ধরে বসে থাকো পুরোনো জমানার রীতি। এজন্য তোমরা মরবে আর এজন্য তোমার চাকরীও যাবে।'

মহাবীর মনীশের বিরক্ত মুখ দেখে ঘাবড়ে গেল। হাত জোড় করে বলল, 'কি করব হুজুর ?'

'কাল মা'কে তামিয়ায় নিয়ে যেতে হবে। এখানে আরেকজন লোক পাওয়া যাবে ?'

মহাবীর ঘাড় হেলিয়ে হ্যাঁ জানাল। তারপর মনীশ ওকে বুঝিয়ে দিল। জঙ্গলের কাঠ কেটে দড়ি দিয়ে বেঁধে কিভাবে একটা স্ট্রেচার বানাতে হবে। সেই স্ট্রেচারে মাকে শুইয়ে মহাবীর ও তার সাহায্যকারী যেন আগামীকাল সকালে এখান থেকে সোজা তামিয়া হাসপাতালে চলে যায়। এই নির্দেশ দিয়ে সে বেরিয়ে এল কুঁড়ে ঘর থেকে।

কুঁড়েঘরের সামনে তখন কারখানার আরো পাঁচ ছ'জন শ্রমিক খবর পেয়ে এসে পেঁাছেছে।

ওরা হাত জোড় করে মনীশকে অভ্যর্থনা জানাল।

'সায়েব, আপনি এত তকলীফ করে আমাদের গাঁওয়ে এসেছেন। একবার চলুন আমাদের ঝুপড়িতে।'

ওদের আন্তরিক অভ্যর্থনায় অভিভূত মনীশ। হাত জোড় করে বলল, 'আজ নয় আরেকদিন আসব। তোমাদের গাঁও আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। আমাকে আবার এন্দুর ফিরতে হবে তো।'

মহাবীর বলল, 'চলুন আপনাকে পেঁাছে দি সায়েব।'

'না পেঁাছে দিতে হবে না।' মনীশ আপত্তি জানাল, 'আমি একা চলে যেতে পারব। তোমার মা অসুস্থ। আজ ছুটির দিন, তুমি মায়ের কাছে থাক।'

'ঠিক আছে সায়েব চলুন। এদিকের জঙ্গলটা পার করে দি।'

মহাবীর নাছোড়বান্দা। জোর করেই মনীশের সঙ্গ নিল।

অন্যান্য শ্রমিকের মধ্যে তখন কয়েকজন ছুটল তাদের ঝুপড়ির দিকে। অন্যেরা মনীশকে বিদায় জানাতে এগিয়ে গেল। তারা বেশ উত্তেজিত, মুগ্ধ। কোম্পানীর কোনো সায়েব কখনো এই গ্রামে এত কষ্ট করে বেড়াতেও আসেনি। আর মনীশ এসেছে ওদেরই একজনের অসুস্থ মা'কে দেখতে।

ওরা যখন গ্রামের সীমানায় এসে পেঁাছেছে তখন যারা ঝুপড়িতে ফিরে গিয়েছিল তারা ছুটতে ছুটতে এল মনীশের কাছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল কিছু না কিছু তরি-তরকারী। কারো হাতে ফুলকপি, কারো হাতে খেতের লাউ, কারো হাতে ঢাউস কুমড়ো। সবাই ওগুলো দিতে এসেছে মনীশকে। শুধু তাই নয়, ওরা একজনকে এইসব নিয়ে মনীশের সঙ্গে পাঠাতেও চায়।

মনীশ এইসব গরীব নিঃস্ব লোকেদের অকৃত্রিম আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে গেল। প্রত্যেকের গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে অনেক করে বোঝাল। সব শেষে বলল, 'তোমরা বোধহয় জান না, আমি এখানে একা থাকি। ক্যান্টিনে খাই। কি করব এসব তরি-তরকারী নিয়ে। বরং আরেকদিন আসব। তখন তোমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে কিছু না কিছু খেয়ে যাব।'

মনীশের কথায় শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হল ওরা।

ছোটো পথ দিয়ে তারপর বারকুই পাহাড় থেকে মনীশ ও মহাবীর নামতে শুরু করল।

দাঁতলার শ্রমিকের দল পেছন থেকে তখন হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। মনীশ বারবার ঘুরে তার প্রত্যুত্তরে আরো জোরে হাত নাড়ছে। সামনের বাঁকে মনীশ হারিয়ে যাওয়া অব্দি এই সাদর বিদায় সম্ভাষণের পালা চলল।

মৌলী লেকের তিন পাশে পাহাড়। আরেক পাশে অর্থাৎ উত্তরে যেদিকে কোয়ার্টারস্ কারখানা, সেদিকে উঁচু প্রাচীরের মত একটি গিরিশিরা। মৌলী পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসেছে এই গিরিশিরা। গিরিশিরার তলায় লেক অব্দি বিশাল ভ্যালী। লেক ও ভ্যালী নিয়ে পর্বত-বেষ্টিত এই এলাকা অপূর্ব মনোরম।

ভ্যালীর একধারে একটি গাছের তলায় রাজেশ, সঙ্গীতা ও গুড়িয়া বসে আছে। গুড়িয়া একটু আগে সঙ্গীতাকে জিজ্ঞেস করেছে—'ভাবী তোমার সঙ্গে রাজেশভাইয়ার কলেজে আলাপ জানি, কিন্তু ভালবাসার শুরু হল কি করে?'

সঙ্গীতা হাসি মুখে রাজেশের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তখন সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, 'কলেজে আমার ওপর তোর রাজেশভাইয়ার খুব ঝোঁক ছিল। আমি অবশ্য বিশেষ পাত্তা দিতাম না।'

'তাই?' রাজেশ ভুরু টানটান করে বলল, 'নাকি আমি ক্লাসের সেরা ছাত্র ছিলাম বলে তোমার হিংসে হত?'

'আজ্ঞে না।' সঙ্গীতা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'তোমায় হিংসে করতে যাবো কেন? তোমার চেয়ে সুপুরুষ ওয়েল টু ডু ফ্যামিলির আরো কত ছেলে ছিল।'

'প্লিজ!' গুড়িয়া দুজনের দিকে দুটো হাত প্রসারিত করে বলল, 'এখন শান্তি শান্তি! তুমি বল ভাবী।'

'তোর রাজেশ ভাইয়া পড়াশোনায় ভাল ছিল এটা সত্যি।' সঙ্গীতা হেসে বলল, 'আর ও আমাদের বাড়ির কাছাকাছিই থাকত। একবার সামার ভ্যাকেশনের আগে ওকে বলেছিলাম স্ট্যাটিসটিক্সের কটা প্রবলেম্ বুঝতে ওর বাড়ি যাব।'

রাজেশ গুড়িয়ার দিকে তাকাল, 'দেখলি, পাত্তাটা কখন দিল? যখন প্রবলেমে পড়েছে।'

সঙ্গীতা বলল, 'হ্যাঁ সুন্দরীরা প্রবলেমে পড়লে তোমাদেরও প্রবলেম্ সলভড্ হয়ে যায়। বাড়িতে গিয়ে কি দেখলাম জানিস?'

'কি দেখলে?' গুড়িয়ার উৎসুক প্রশ্ন।

'দেখলাম, একটা বাড়ির চিলেকোঠায় উনি একা থাকেন। তখন ও দিল্লীর বাসিন্দা নয়। মফঃস্বলের গেঁয়ো ছেলে।' সঙ্গীতা বলে চলল, 'গিয়ে দেখি যে-ঘরে থাকে সে ঘর একেবারে অগোছালো, জিনিসপত্র ওলটপালট। যেন একটা গুদাম ঘর। তার মধ্যে কিছু নতুন ফ্যাওয়ার ভাস, নতুন পর্দা, নতুন বিছানার চাদর এক পাশে ভুর করে পড়ে আছে।'

'কেন?' গুড়িয়া অবাক।

'আমাকে অভ্যর্থনা করতে ঘর সাজাবেন।' সঙ্গীতার গালের টোলে হাসি, 'কিন্তু তারিখটা তো ভুলে গেছেন! ভেবেছিল, যেদিন আমি গেছি তার পরের দিন আমার

যাওয়ার কথা। তাই তখনও সাজানো গোছানো কিছু হয়নি। আমাকে দেখে একেবারে অপ্রস্তুত।'

গুড়িয়া হাসতে হাসতে মাটিতে প্রায় লুটিয়ে পড়ল। 'তারপর?'

তারপর স্ট্যাটিসটিকস্ না বুঝে ঘর গুছিয়ে দিলাম। ওই গুদাম ঘর গোছানো সোজা কথা।' সঙ্গীতা চিবুক দুলিয়ে বলল, 'আমার প্রবলেম্ সলভ্ হল না ওর প্রবলেম্ সলভড্।'

'কি প্রবলেম?' গুড়িয়া তাকাল।

'আমাকে জয় করা! যেই দেখল অতক্ষণ ধরে ঘর গুছিয়ে দিচ্ছি, ভাবল ওর প্রেমে পড়ে গেছি। ব্যস্ লেগে রইল আঠার মত।'

বেশ! বেশ! এবার আমি বলি তোমার আঠার কথা?' রাজেশ ঘুরে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতা গুড়িয়ার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল, 'আমার কোনো আঠাই ছিল না! —আয় গুড়িয়া। আমরা লুকোচুরি খেলি।'

গুড়িয়াকে টানতে টানতে সঙ্গীতা নিয়ে গেল আরো দূরে।

বারকুই পাহাড় থেকে নেমে খরস্রোতা একটা ঝরনা পেরিয়ে মৌলী পাহাড়ে উঠে এল ওরা। তারপর যখন দূরে মৌলী লেকটা দেখা গেল মনীশ বলল, 'এবার তুমি ফিরে যাও মহাবীর। লেক দেখতে পাচ্ছি, তামিয়া এসে গেছে।'

'যেতে পারবেন সাহেব?' মহাবীর তখনও মনীশকে ছাড়তে চাইছে না। বলল, 'তাওও পর্যন্ত যাই?'

'আর এক কদমও না।' মনীশ ধমক দিল, 'ফিরে যাও এখান থেকে। আর শোনো, কাল ডিউটি আসার দু'ঘণ্টা আগে বেরোবে ঝুপড়ি থেকে। মা'কে নিয়ে সোজা হাসপাতালে যাবে। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা করে রাখব।'

'জী হুজুর।' মহাবীর মাথা হেলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনীশ যতক্ষণ না ওর চোখ থেকে উধাও হয়ে যায়।

সামনের বাঁক পেরিয়ে মৌলী পাহাড়কে বেষ্টন করে আরো দুটো মোড় ঘুরল মনীশ। মৌলী লেক তখন ওর পাহাড়ী পথের ডান দিকে তলায় দেখা যাচ্ছে। অপূর্ব দৃশ্য। লেকের স্বচ্ছ জলে পাশের পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি। দৃশ্যটা উপভোগ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে মনীশ। হঠাৎ আরো সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনীশ দেখলো, লেকের পাশের ভ্যালীতে গুড়িয়া ও সঙ্গীতাভাবী ছুটোছুটি করছে। অবশ্য ভ্যালীর ও এই রাস্তার অবস্থান এমন যে নীচ থেকে মনীশকে ওদের দেখতে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। মনীশ তাই আবার হাঁটা শুরু করল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে গুড়িয়াকে লক্ষ্য করতে করতে। গুড়িয়া সঙ্গীতাভাবীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। গুড়িয়ার অপূর্ব ভাবভঙ্গী মাঝেমাঝে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে ওর লুকিয়ে যাওয়া তারপর যেই সঙ্গীতাভাবী ওকে খুঁজে বের করছে, হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়া, সব তারিয়ে তারিয়ে নিরীক্ষণ করছে মনীশ। গুড়িয়ার এই ছেলেমানুষি ভীষণ ভাল লাগে মনীশের। গাছের সারির আড়ালে মুখে

তৃপ্তির হাসির প্রলেপ নিয়ে গুড়িয়ার লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে হেঁটে চলেছে মনীশ।

সামনের বাঁকটা পেরোতেই গুড়িয়া ও সঙ্গীতাভাবী ওর দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেল। এখন নীচে শুধু লেক দেখা যাচ্ছে। ভ্যালীটা ডান দিকের উঁচু এক বনভূমির আড়ালে। মনীশ হেঁটে চলেছে আপন মনে। আরেকটা বাঁক পেরিয়ে উতরাই। উতরাইয়ে নেমে ভ্যালীর গা ঘেঁষে আবার গিরিশিরার চড়াই।

মনীশ সেই উতরাইয়ে নামছে তখন হঠাৎ অঘটনটা ঘটে গেল। মনীশ অকস্মাৎ একটা মধুর হাসির শব্দ শুনতে পেল। তারপরেই স্তম্ভিত চোখে দেখল, গুড়িয়া হরিণীর মত ছুটে আসছে নীচ থেকে। প্রথমে মনীশকে সে লক্ষ্য করেনি। একেবারে সামনাসামনি আসতে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে পা দুটো থেমে গেল ওর। দাঁড়িয়ে পড়ল স্তব্ধ হয়ে। মুখের সব দীপ্তি নিভে গেল হঠাৎ। থমথমে চোখে আর এক মুহূর্ত মনীশের দিকে তাকিয়েই সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল ওর। পর মুহূর্তে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

গুড়িয়া জ্ঞান হারিয়ে রাস্তার ধারে লুটিয়ে পড়ল। পাশেই ভ্যালীর খাদ। যদিও খুব একটা গভীর নয়। তবু তীব্র আতঙ্কে বেহুঁশ গুড়িয়াকে ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মনীশ। গুড়িয়ার কিছু হল না কিন্তু মনীশ নিজের টাল সামলাতে না পেরে পা পিছলে গড়িয়ে পড়ল খাদের ঢালে।

সে মুহূর্তে সঙ্গীতাও ছুটে আসছিল নীচ থেকে। গুড়িয়াকে বেহুঁশ হয়ে পড়তে দেখে আর্তনাদ করে উঠল। পলকের ফাঁকে দেখল, মনীশ ওকে বাঁচাতে গিয়ে পিছলে পড়ল খাদে। তারস্বরে চিৎকার করে ওপরে ছুটে এল সঙ্গীতা। একবার তাকাল বেহুঁশ গুড়িয়ার দিকে আরেকবার মনীশের দিকে।

মনীশ পাথরের খাড়া ঢালে কিছুটা পিছলে পাথরের একটা খাঁজ আঁকড়ে আটকে নিয়েছে নিজেকে। সঙ্গীতা ভীত বিহ্বল চোখে দেখল, পাথরের খাঁজ ধরে ধরে মনীশ ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে।

তামিয়া হাসপাতাল।

আহত ও ক্লান্ত মনীশ গুড়িয়াকে পাঁজাকোলা করে ডাক্তারের ঘরে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গীতা। রাজেশ ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গেছে। মনীশ বেহুঁশ গুড়িয়াকে সাবধানে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিল।

কিছুক্ষণ পরেই রাজেশের সঙ্গে ডক্টর ভাটনাগর ঢুকলেন ঘরে।

'কি হল মিঃ সেন?' ডাক্তার ভাটনাগর একবার বেহুঁশ গুড়িয়া আরেকবার মনীশের রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সাংঘাতিক চোট পেয়েছেন আপনি!'

'প্লিজ ডক্টর, আগে ওকে দেখুন।' মনীশ বেহুঁশ গুড়িয়াকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আমি আউট-ডোরে ফার্স্ট এইড করিয়ে নিচ্ছি।'

ডক্টর ভাটনাগর ঝুঁকে পড়লেন গুড়িয়ার ওপর। রাজেশ ও সঙ্গীতা এগিয়ে গেল

টেবিলের দিকে। মনীশ সেই ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। পাছে গুড়িয়া জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার মনীশকে দেখতে পায়।

মনীশ ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা আউট-ডোরে কম্পাউণ্ডারের কাছে এল। সেও মনীশের অবস্থা দেখে হতবাক। বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'সেন সাহেব কি করে হল আপনার এই হাল?'

'পাথরের ঢালে পড়ে গেছি।' মনীশ একটা চেয়ারে বসে ক্লান্ত স্বরে বলল।

কম্পাউণ্ডার ছুটে ওষুধ ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এল। তারপর স্পিরিট দিয়ে মনীশের দেহের ক্ষত স্থানগুলো ধুতে ব্যস্ত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর ডক্টর ভাটনাগর ওখানে এলেন ইঞ্জেকশন, সিরিঞ্জ নিতে।

মনীশ উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর, কি অবস্থা পেশেণ্টের?'

'সেন্স এসে গেছে' ডক্টর ভাটনাগর শেলভ্ থেকে ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জের প্যাকেট নামাতে নামাতে বললেন. 'ডোণ্ট ওরি মিঃ সেন। চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি আপনাকেও এসে চেক করছি।'

কিন্তু তার একটু পরেই ডক্টর ভাটনাগর আউটডোরে এসে দেখলেন মনীশ নেই।

হাসপাতালের ছোটো অ্যাম্বুলেন্সটা শর্মাজীর কোয়ার্টার-এর সামনে এসে দাঁড়াল। শর্মাজী শব্দ শুনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

অ্যাম্বুলেন্স-এর পেছনের দরজা খুলে প্রথমে নামল রাজেশ। তারপর সঙ্গীতা গুড়িয়ার হাত ধরে। হাসপাতালের এক কর্মীও নামল সামনের দরজা খুলে। রাজেশ ও সঙ্গীতা গুড়িয়াকে দুপাশ থেকে ধরে গেটের দিকে এগোলো।

গুড়িয়ার নত মুখ। কপালে হাতে দু-একটা ব্যাণ্ড-এইড্ লাগানো। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকছে কোয়ার্টার-এর কম্পাউণ্ডে।

শর্মাজী উৎকণ্ঠায় চিন্তিত পদক্ষেপে নেমে এলেন। গুড়িয়া বাবাকে জাপটে কেঁদে ফেলল। শর্মাজী মেয়েকে জড়িয়ে ঘটনা কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকালেন রাজেশ ও সঙ্গীতার দিকে।

রাজেশ ইশারায় সংযত করল শর্মাজীকে।

সঙ্গীতা গুড়িয়ার পিঠে হাত বুলিয়ে আদরের স্বরে বলল, 'গুড়িয়া, চলো তোমাকে এখন শুতে হবে। ডাক্তারবাবু বলেছেন। চলো গুড়িয়া, প্লিজ—'

গুড়িয়াকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে। ওর এখন ঘুম খুব প্রয়োজন। তাই রাজেশও তাড়া দিল, 'চলো গুড়িয়া!'

গুড়িয়া সঙ্গীতার সঙ্গে ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল। পেছন পেছন শর্মাজী ও রাজেশ। সঙ্গীতা গুড়িয়াকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

তারপর বেরিয়ে এলো ওরা।

'কি হয়েছে রাজেশ?' শর্মাজীর উৎকণ্ঠা গাঢ় হল। সঙ্গীতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে গুড়িয়ার? তোমরা কিছু বলছ না কেন?'

'চাচাজী. গুড়িয়ার সেই রোগটা আবার দেখা দিয়েছে।' রাজেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আজ বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল।'

'বেঁহুশ হয়ে গিয়েছিল? কাকে দেখে?'

'অরবিন্দ। আমাদের অ্যাসিস্টেণ্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার।'

শর্মাজীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। রাজেশ ও সঙ্গীতাও চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

মনীশ হাসপাতালের আউটডোর থেকে বেরিয়ে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এসেছিল। ফার্স্ট এইড্ করা সত্বেও ওর শরীরে তখন দুঃসহ ব্যথা। কোয়ার্টারে এসেই শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। হাসপাতাল থেকে সে দ্রুত চলে এসেছে। লজ্জায়। নিজেকে আজ ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে ওর। এভাবে যে মনীশ হঠাৎ গুড়িয়ার সম্মুখীন হবে, ভাবতেই পারেনি। এবং আরো ভাবতে পারেনি, গুড়িয়া ওকে দেখামাত্র বেহুঁশ হয়ে যাবে। কেন হল এমন? ওকে কি দেখতে এতই ভয়ঙ্কর, কুৎসিত? মনীশ কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু সংকোচে, কুণ্ঠায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে ওর এখন। হাসপাতাল থেকে আসার সময় এই লজ্জায় রাজেশভাইয়া-সঙ্গীতাভাবীকে ডেকে সে জিজ্ঞেস করতে পারেনি, গুড়িয়া কেমন আছে। ওদের সামনে যাওয়ারও মুখ ছিল না মনীশের।

তাহলে কি গুড়িয়ার জন্য ওকে তামিয়া ছাড়তে হবে অচিরে? মনীশের মাথায় এখন সেই চিন্তাটাই দপদপ করছে ভীষণ। বারবার ওর মনে হচ্ছে, প্রথম দিনের ঘটনা ও আজকের ঘটনা ওর প্রতি যেন একটা সতর্কতার সূচনা। তামিয়ায় এসে মনীশ যে অন্যায় করেছে, অপরাধ করেছে তার থেকে বিরত হতে সাবধান করার সংকেত।

হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল।

বিছানা থেকে কোনো মতে উঠল মনীশ। ব্যথায় জর্জরিত ওর সারা শরীর। টলতে টলতে বাইরের ঘরে গিয়ে দরজা খুলল। সামনে ডক্টর ভাটনাগর দাঁড়িয়ে।

'মিঃ সেন! চলে এলেন হাসপাতাল থেকে! 'ডক্টর ভাটনাগরের বিস্ময় মিশ্রিত অনুযোগ। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'খুব অন্যায় করেছেন! আপনার চেহারা বলছে, ইউ নীড চেক আপ অ্যাণ্ড প্রপর ট্রিটমেণ্ট—। চলুন।'

মনীশ নীরবে বেডরুমের দিকে পা বাড়াল।

ওকে অনুসরণ করে ডক্টর ভাটনাগর হাতের ব্রিফকেস্ বেডরুমের টেবিলের ওপর রেখে নির্দেশ দিলেন, 'শুয়ে পড়ুন।'

ক্লান্ত মনীশ বিছানায় আগেই বসে পড়েছিল। শুয়ে পড়ল এবার।

ডক্টর ভাটনাগর ভাল করে সব পরীক্ষা করলেন। আপাদমস্তক। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন 'যাক্ হ্যামারেজ্ কিছু হয়নি। আমি যা শুনলাম মিসেস্ সাহানীর মুখে, আপনি যেভাবে পড়ে গিয়েছিলেন খাদে, ইয়ু কুড হ্যাভ ফ্র্যাকচরড ইয়োর বোনস অর ইট মাইট হ্যাভ কজড ইণ্টার্নাল হ্যামারেজ। থ্যাঙ্কস টু গড! সেরকম কিছু হয়নি।'

ব্রিফকেস থেকে ওষুধের ফাইল আর সিরিঞ্জের নতুন প্যাকেট বের করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি কষ্ট হচ্ছে মিঃ সেন ?'

'কষ্ট এমন কিছু না—' মনীশ আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'শুধু একটু ব্যথা আছে সারা শরীরে।'

'ব্যথা থাকবেই। যেভাবে গড়িয়েছেন পাথরের ঢালে! আমি একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে যাচ্ছি। ব্যাথা কমবে আর ঘুম আসবে। ঘুম এখন আপনার খুব প্রয়োজন। কিন্তু মুশকিল হল,' ডক্টর ভাটনাগর চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'আপনি একা থাকেন। এসময় হাসপাতালে থাকলে ভাল হত। আচ্ছা, এভাবে চলে এলেন কেন হাসপাতাল থেকে?'

প্রশ্নটা শুনে মনীশ অস্বস্তির চোখে তাকাল। একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'ঘটনাটা আপনি শুনেছেন সঙ্গীতাভাবীর কাছে? গুড়িয়া মানে শর্মাজীর মেয়ে কিভাবে বেঁহুশ হল?'

'হ্যাঁ শুনেছি।'

'ওই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্যই চলে এসেছি।'

'পুনরাবৃত্তি!' ডক্টর ভাটনাগর ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ প্রস্তুত করতে করতে তাকালেন মনীশের দিকে। তারপর নিজেই বললেন, 'ও আপনাকে দেখে যাতে আবার—'

'ইয়েস ডক্টর—,' মনীশ চোখ নামিয়ে বলল, 'এটা দ্বিতীয় ঘটনা। আমি যেদিন প্রথম তামিয়ায় এসেছিলাম সেদিনও প্রায় এরকমই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম।'

'শুনেছি।'

'কার কাছে শুনেছেন ?'

'শর্মাজীর কাছে। পরে মিঃ সাহানীর কাছেও কনফর্মড হয়েছি।'

মনীশ ব্যথিত স্বরে বলল, 'সত্যি কথা বলতে ডক্টর—আমি সেদিন থেকেই সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। গুড়িয়ার সামনে যাতে আর না আসতে হয় সেজন্য রাজেশ-ভাইয়া সঙ্গীতাভাবীর সঙ্গও ত্যাগ করেছি। কিন্তু আজ ওর দুর্ভাগ্য। কিভাবে কখন যে এল সামনে বুঝতে পারিনি। আমি এজন্য খুবই দুঃখিত। সত্যি খুব দুঃখিত।'

'নো নো, মিঃ সেন—'ডক্টর ভাটনাগর মাথা নেড়ে বললেন, 'ইট ইজ নট ইয়োর ফল্ট অ্যাট অল। আপনার দোষ নয়। এটা তো গুড়িয়ার একটা অসুখ। এই নিয়ে তিনবার বেঁহুশ হল মেয়েটা। এর আগে আরো দুবার হয়েছে।'

'অসুখ!' মনীশ বিস্মিত চোখে তাকাল।

'ইয়েস! গুড়িয়া আমার পেশেণ্ট। যদিও রোগটা সাইকোলজিকল। দুবার বেঁহুশ হবার পর ওকে আমি শিমলায় আমার এক সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধুর কাছেও পাঠিয়েছিলাম। তবে ফল কিছু হয় নি।' ডক্টর ভাটনাগর সিরিঞ্জে ওষুধ টানতে টানতে বললেন, 'মিঃ সেন, আমি কিন্তু আপনার কোয়ার্টার-এর চাবি নিয়ে যাব সঙ্গে করে।'

'কেন ?'

'এখন আপনি ঘুমে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন। এভাবে একা থাকা ঠিক নয়। তা ছাড়া, পরে আমি আবার আসব। গায়ে টেম্পরেচর উঠছে—। নিন পাশ ফিরে শোন। বাঁ হাতে তো টেটভ্যাক নিয়েছেন। এটা ডান হাতে দি ?'

মনীশ পাশ ফিরল। ডক্টর ভাটনাগর ইঞ্জেকশনটা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'কোথায় আপনার কোয়ার্টারের চাবি ?'

'ওই ড্রয়ারে।' মনীশ টেবিলের দিকে ইশারা করল।

ড্রয়ার খুলে চাবির রিংটা বের করে ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে নিলেন ডক্টর ভাটনাগব। ব্রিফকেস্ বন্ধ করে বললেন, 'চলি মিঃ সেন। পরে আসব। আপনাকে কিছু ওষুধও খাওয়াতে হবে।'

'ডক্টর—' মনীশ তাকাল। ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'শর্মাজীর মেয়ে এখন কোথায় ?'

'কোয়ার্টারে চলে গেছে।' ডক্টর ভাটনাগর জবাব দিলেন।

চিন্তার কোনো কারণ নেই তো ?'

'আপাতত নেই। আই মিন আজকের ঘটনার জের কেটে যাবে।' ডক্টর ভাটনাগর ব্রিফকেস্টা হাতে ঝুলিয়ে বললেন, কিন্তু আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। বোগটা সারাতে হবে গুড়িয়ার। এখন পর্যন্ত আমরা কিছু করতে পারছি না।—ও. কে. মিঃ সেন চোখ বুজে শুয়ে থাকুন। আমি যাচ্ছি।'

ডক্টর ভাটনাগর বেরিয়ে গেলেন।

মনীশ চোখ না বুজে তাকিয়ে রইল ছাদের দিকে। গুড়িয়ার অসুখের ব্যাপারটা কিছুই ও বুঝতে পারল না। এমন কি রোগ, যা মনীশকে দেখামাত্র ওকে আঁকড়ে ধরছে! এর আগেও গুড়িয়া দুবার বেঁহুশ হয়েছে ? কেন ? কি কারণ আছে এর পেছনে ?

ভাবতে ভাবতে একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে গেল মনীশ। ওর যেন মনে হল শূন্যে সাঁতরাচ্ছে ওর শরীর। এ মুহূর্তে মা ও লীলার মুখ মনে পড়ছে ভীষণ। মন চাইছে ওদের কাছে উড়ে চলে যেতে। আস্তে আস্তে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ওর চোখ। তারপরেই মনীশ একটা স্বপ্ন দেখল।

মনীশ দেখল, ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে সে ছুটতে ছুটতে ওদের বাড়ির দরজা খুলে আছড়ে পড়ল মায়ের কোলে। মায়ের কোলে হাঁপাচ্ছে মনীশ। মা ভীত সন্ত্রস্ত চোখে জাপটে ধরেছে মনীশকে। লীলা ছুটে এল পাশের ঘর থেকে। এক মুহূর্ত আতঙ্কের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেও এসে জড়িয়ে ধরল মনীশকে। তারপর দাদার পিঠে মাথায় আদরের হাত বুলোতে লাগল।

স্বপ্নের মধ্যে হঠাৎ মনীশ লক্ষ্য করল, ওদের চারপাশে ঘরের চার দেয়াল আর নেই। তার পরিবর্তে ভেসে উঠল পাহাড়ের সারি। জঙ্গলে ঘেরা একটা মাঠ। মাঠের মধ্যে বসে আছে মা। তার কোলে মুখ গুঁজে মনীশ। লীলা পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এক হরিণী ছুটে এল জঙ্গল থেকে। তারপর ধীর পায়ে ওদের কাছে এসে মনীশের

দেহে মুখ বুলোতে লাগল। চমকে উঠল মনীশ। মা'র কোল থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, সে হরিণী নয়। গুড়িয়া। মনীশ হেসে মায়ের কোল থেকে উঠে বসল। গুড়িয়াও হেসে উঠল। মনীশের দেহে এখন কোনো ক্ষত চিহ্ন নেই। লীলা হাসছে। মা হাসছে। লীলা আর গুড়িয়া হাত ধরাধরি করে এবার নাচতে শুরু করল ওদের চারপাশে। মায়ের কোলে আবার শুয়ে পড়ল মনীশ। শুয়ে শুয়ে দুজনের নাচ দেখছে সে। মা মনীশের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ঘুম ভেঙে গেল মনীশের। চোখ খুলে দেখল, ডক্টর ভাটনাগর পাশে বসে তার ডান হাতের কবজি ধরে নাড়ী দেখছেন। আর ওদিকে ক্যান্টিন-বয় নয়নসুখ খাবারের টিফিন ক্যারিয়ার হাতে দাঁড়িয়ে। ওর চোখেমুখে উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ।

'কটা বাজে ডক্টর ?' মনীশ জিজ্ঞেস করল।

'রাত ন'টা।' ডক্টর ভাটনাগর হেসে উত্তর দিলেন, 'ভালই ঘুমিয়েছেন। গায়ে ব্যথা কেমন ?'

'অনেক কম।' মনীশ উঠে বসল বিছানায়।

'খাবার খেয়ে নিন। তারপর ওষুধ খেতে হবে।' ডক্টর ভাটনাগর ব্রিফ কেস থেকে থার্মোমিটার বের করতে করতে বললেন, 'সামান্য টেম্পরেচর আছে। দেখি কত ?'

'সায়েব, আজ আমি রাতে এখানে থাকব।' নয়নসুখ হঠাৎ গম্ভীর মুখে বলল।

'কেন ?' মনীশ অবাক চোখে তাকাল ওর দিকে।

'সারা দিন আপনি একা একা বিমার পড়ে আছেন।' নয়নসুখ উদগ্রীব কণ্ঠে বলল, 'রাতে আমি থাকব।'

'ওকে থাকতে দিন!' ডক্টর ভাটনাগর থার্মোমিটারটা ঝেড়ে মনীশের হাতে দিয়ে বললেন, 'আজ রাতে আপনার কাছে কারো থাকা উচিত। নিন মুখে দিন এটা!'

'শর্মাজীর মেয়ে কেমন আছে ডক্টর ?' থার্মোমিটারটা হাতে নিয়ে মুখে ঢোকানোর আগে জিজ্ঞেস করল মনীশ।

'খবর পেয়েছি ভাল আছে।' ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'আমি আপনার এখান থেকে ওখানেই যাব এখন।'

মনীশ থার্মোমিটারটা জীভের নিচে ঢোকালো।

পরেরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে রাজেশ ও সঙ্গীতা নিশ্চল হয়ে বসে আছে। ওদের দুজনেরই মুখ গম্ভীর। চোখে ভাবনার ছায়া।

সঙ্গীতা ওর সামনের খাবারের প্লেটটা ঠেলে দিয়ে বলল, 'একদম ভাল লাগছে না গো। কাল ডক্টর ভাটনাগরের কাছে সব শোনার পর রাতে আমার ঘুম হয়নি। অরবিন্দ ভাই গুড়িয়ার জন্য আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে ?'

'এখন বুঝতে পারছি—' রাজেশ প্লেটের টোস্ট গুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'এদিকের কোয়ার্টারটা ও নিল না কেন ?'

'আমরা খুব অবিচার করেছি ওর ওপর।' সঙ্গীতা অনুশোচনায় সজল চোখে বলল, 'প্রথম দিন এখানে খেতে এল না। হাটে একদিন দেখা হওয়াতে দূরে সরে গেল। ভেবেছিলাম মিশুকে নয়, স্বার্থপর ছেলেটা—'

'অথচ ওর চেয়ে উপকারী তামিয়াতে আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ।' রাজেশ বলল, 'ডাক্তারবাবুর কাছে শুনলে না, কারখানায় একজন ওয়ার্কারের অসুস্থ মা'কে দেখতে সেই দাঁতলা গ্রামে গিয়েছিল। তাঁকে এই হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেছে।'

'শোনো!' সঙ্গীতা বলল, 'আমি একটার সময় তোমাদের দুজনের খাবার নিয়ে অরবিন্দভাইয়ের কোয়ার্টারে চলে যাব। তুমি লাঞ্চ খেতে ওখানে এস।'

'ঠিক আছে।' রাজেশ ঘাড় হেলিয়ে খাওয়া শুরু করল।

দুপুর বারোটা চল্লিশ।

রাজেশ ওর চেম্বারে ব্যস্ত তখন। হঠাৎ ডক্টর ভাটনাগর ঘরে ঢুকলেন। এই অসময়ে তাকে অফিসে দেখে রাজেশ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার ডক্টর ভাটনাগর, অরবিন্দ ভাল আছে তো ?'

'হ্যাঁ, তিনি সুস্থ আছেন।' ডক্টর ভাটনাগর সামনের চেয়ারে বসে বললেন, 'আপনার কাছে এলাম, গুড়িয়ার ব্যাপারে কিছু আলোচনা করতে।'

'বলুন— ' রাজেশ চেয়ারে গা এলিয়ে বসল।

'ভেবেছিলাম রোগটা বোধহয় ধীরে ধীরে সেরে গেছে ওর।' ডক্টর ভাটনাগর চিন্তিত স্বরে বললেন, 'কিন্তু এই নিয়ে তৃতীয়বার বেহুঁশ হল গুড়িয়া। তার মানে কিছুই সারেনি ?'

'না।' রাজেশও গম্ভীর স্বরে বলল, 'অরবিন্দর সঙ্গে ওর প্রথম দেখা হওয়ার দিনই সেটা বোঝা গেছে।'

'একটু আগে ডক্টর মোহনের সঙ্গে ফোনে কথা হল—'

'আচ্ছা, শিমলার সাইকেয়াট্রিস্ট— ' মাথা ঝাঁকাল রাজেশ, 'কি বললেন তিনি ?'

'সব শুনল।' ডক্টর ভাটনগর বললেন, 'মিঃ সেন সম্বন্ধে ওকে আমি ডিটেলসে বলেছি। শুনে খুব আশান্বিত হল। ডক্টর মোহনের ধারণা, দিস ইজ দ হাই টাইম ফর ট্রিটমেন্ট অফ গুড়িয়া। ও বলছে এখন গুড়িয়ার ভাল হওয়ার একটা চান্স আছে।'

'কি ভাবে ?'

'একটা ব্যাপার মিঃ সারিন—' ডক্টর ভাটনাগর রাজেশের চোখে গাঢ় দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, 'এর আগে যে দুটো ছেলেকে দেখে গুড়িয়া বেহুঁশ হয়েছিল, তাদের বয়স স্বাস্থ্যের সঙ্গে মিঃ সেনের কিছু মিল আছে। আপনার মনে আছে সেই প্রথম নেপালী

ছেলেটিকে? তারপর আমাদের পুলিশ ইন্সপেক্টর-এর ভাই শিমলার ছেলেটিকে? দুজনেরই চোখে চশমা ছিল আর ওদের মাথায় চুলের স্টাইল ছিল প্রায় মিঃ সেনের চুলের মত?'

রাজেশের মুখে গাম্ভীর্য আরো ঘন হল। স্মৃতি রোমন্থন করে সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, 'কারেক্ট! ঠিক বলেছেন ডক্টর! এ ব্যাপারে তিনজন প্রায় এক।'

'ডক্টর মোহন মিঃ সেনের চেহারার বর্ণনা শুনে ব্যাপারটা পয়েন্ট আউট করেছেন।' ডক্টর ভাটনগর বললেন, 'এবং তার বিশ্বাস, গুড়িয়ার জীবনে যে ছেলেটি অভিশাপ হয়ে এসেছিল তার মাথার চুলের কায়দাও প্রায় এদের মত ছিল এবং তার চোখেও ছিল কালো চশমা।'

রাজেশের প্রায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল ডক্টর ভাটনাগরের দিকে।

'অতএব—' ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'ডক্টর মোহনের সাজেশন, গুড়িয়ার এই ভীতি চিরকালের জন্য বিলীন করতে অরবিন্দ সেনের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। এখন একমাত্র তিনি পারেন গুড়িয়ার সেই অভিশপ্ত ঘটনার স্মৃতি ফিরিয়ে এনে গুড়িয়ার জীবন থেকে তা সম্পূর্ণ রূপে মুছে ফেলতে।'

রাজেশের উৎসুক দৃষ্টি।

'অরবিন্দ সেন বিরল স্বভাবের মানুষ।' ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'আমি এই তিন মাসে নানা ঘটনায় তা বুঝতে পেরেছি। মহাবীরের ঘটনা তো শুনেছেন। গত রাতে একটি ক্যাম্বিস বয় ওঁর কাছে সারারাত জেগে বসেছিল, কেন জানেন? ছেলেটি আমায় নিজে বলল, এক বৃষ্টির রাতে ও শীতে কাঁপতে কাঁপতে মিঃ সেনের খাবার দিতে এসেছিল। তিনি সেদিন নিজের গায়ের সোয়েটার খুলে জোর করে ওর গায়ে পরিয়ে দিয়েছিলেন।'

রাজেশের মুগ্ধ চোখ।

'মিঃ সাহানী—' ডক্টর ভাটনাগর বিরতি নিয়ে বললেন, 'যে লোকটির এরকম বেদনা-বোধ, এত সহানুভূতি, তাঁর দ্বারাই সম্ভব গুড়িয়াকে আবার স্বাভাবিক করে তোলা। ওদের দুজনকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে।'

'কিন্তু তা কি সম্ভব?' রাজেশের স্বরে আশঙ্কা, 'প্রথম দিন গুড়িয়া অরবিন্দকে দেখে ভয়ে কেঁপে উঠেছিল, দ্বিতীয় দিন বেহুঁশ হয়ে গেল, এর পর—?'

'সেজন্যই মিঃ সেনকে আমাদের চাই। গুড়িয়ার ভয়ের কারণ মিঃ সেন। অথচ মিঃ সেন মানুষটা অন্যরকম। তাঁকে দিয়েই গুড়িয়ার এই ভয়, এই সন্ত্রাস কাটাতে হবে। তার কিছুটা বেস ওয়ার্ক আমি আজ করে এসেছি।'

'কি রকম?' তাকাল রাজেশ।

'আমি কিছুক্ষণ আগে গুড়িয়াকে দেখতে গিয়েছিলাম।' ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'তখন কথার ফাঁকে মিঃ সেনের প্রসঙ্গ তুলেছি। গুড়িয়াকে ওঁর সম্বন্ধে কিছু এমন কথা বলেছি যাতে মিঃ সেন সম্পর্কে ওর ভীতিটা কাটে—'

'এমনি রিয়েকশন?'

'এত তাড়াতাড়ি কিছু আশা করছি না।—আর এ ব্যাপারে শুধু আমার প্রচেষ্টায় হবে না। আপনাকে ও আপনার মিসেসকে সাহায্য করতে হবে। কাজটা একটু কঠিন। তবে মিথ্যে কিছু বলার নেই। যা ফ্যাক্ট তাই ওর কাছে তুলে ধরতে হবে। আই মিন, মিঃ সেন যে ভীতিকর কেউ নন, বরং তার উল্টো, একেবারে মাটির মানুষ, এটা ওর মাথায় ধীরে ধীরে ঢোকাতে হবে। তারপর একদিন মিঃ সেনকে আবার ওর সামনে নিয়ে আসব আমরা '

'আপনি এ ব্যাপারে অরবিন্দকে কিছু বলেছেন?'

'না। গতকাল শুধু গুড়িয়ার রোগ সম্বন্ধে একটা আভাস দিয়েছি।' ডক্টর ভাটনগর বললেন, 'তবে এই মোড অফ ট্রিটমেন্টটা ওকে বলতে হবে। বোঝাতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। কারণ ডক্টর মোহনের নির্দেশ, যেহেতু লেটেস্ট ঘটনা গতকাল ঘটেছে আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়।'

'তাহলে চলুন!' রাজেশ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে টেবিলের কাগজপত্র গুছোতে গুছোতে উঠে দাঁড়াল, 'আমার এখুনি ওর কোয়ার্টারে যাওয়ার কথা। সেখানে সঙ্গীতাও থাকবে।'

'চলুন!' ডক্টর ভাটনগরও উঠলেন চেয়ার থেকে।

সঙ্গীতা খাবার নিয়ে মনীশের কোয়ার্টারে পৌঁছে বেশ ঘাবড়ে গেল। কোয়ার্টার থেকে তখন কুড়ি-পঁচিশ জনের ভীড় বেরিয়ে আসছে।

সঙ্গীতা ওদের পাশ কাটিয়ে ঢুকল ভেতরে। বাইরের ঘর পেরিয়ে আড়ষ্ট পায়ে বেডরুমে প্রবেশ করে দেখল, মনীশ একটা ইজি চেয়ারে বসে আছে। ওর মাথায়, হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

মনীশ সঙ্গীতাকে দেখে চেয়ার থেকে পিঠ তুলে তাকাল—

'আরে ভাবী!'

সঙ্গীতা হাতের খাবারের পাত্র টেবিলের ওপর রেখে উদগ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এরা কারা অরবিন্দভাই?'

'আর বোলো না! কারখানার কিছু ওয়ার্কার আর ক্যান্টিনের কয়েকজন বেয়ারা ছিল।' মনীশ মৃদু হেসে বলল, 'সব আমায় দেখতে এসেছে। যেন আমি ডেথ বেডে পড়ে আছি। দু'একজন তো যেতেই চাইছিল না। আমার নাকি দেখাশোনা করবে। কান্ড দেখেছ এদের!'

'হ্যাঁ দেখছি।' সঙ্গীতা বুকের আবেগটা সামলে মনীশের খাটে বসে বলল, 'ওরা মাটির মানুষ, তাই তোমায় চিনতে পেরেছে। আর আমরা শিক্ষিত তথাকথিত ভদ্র, তাই তোমাকে স্বার্থপর, অসামাজিক ভেবে দূরে সরিয়ে রেখেছি।'

'খবরদার ভাবী, ও কথা বলো না।' মনীশ স্বরে গাঢ় আন্তরিকতা নিয়ে বলল, 'বাড়ি থেকে হাজার মাইল দূরে এসে প্রথম দিন তোমাদের যে ভালবাসা পেয়েছি, জীবনে ভুলব না।'

'লজ্জা দিও না অরবিন্দভাই।' সঙ্গীতা নত মুখে বলল, 'তারপর থেকে তোমাকে

আমরা ঘৃণা করে এসেছি। ভীষণ ভুল বুঝেছি তোমায়। আসলে আমি ভাবতে পারিনি, তুমি যে প্রথম দিনই গুড়িয়ার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে নিজেকে নীরবে সরিয়ে নিয়েছ। গুড়িয়ার স্বার্থে আমাদের স্বার্থে।'

'এ জন্য তোমার কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী অরবিন্দ।' গলাটা ছিল রাজেশের। ও এর মধ্যে নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছিল ভেতরে। সঙ্গে ডক্টর ভাটনাগর।

'ছিঃ রাজেশভাইয়া!' মনীশ মুখ তুলে বলল, 'ক্ষমা তোমরা করবে আমাকে। আমার জন্য গুড়িয়ার কি অবস্থা হল? আরেকটু হলে—'

'এ জন্য তুমি দায়ী নও অরবিন্দ।' রাজেশ সঙ্গীতার পাশে বসে বলল, 'ওটা গুড়িয়ার মনের রোগ। ওই পরিবেশে তোমার পরিবর্তে, তোমার বয়সের, তোমার মত দেখতে অন্য কেউ হলেও গুড়িয়া বেহুঁশ হয়ে যেত।'

'মানে?' মনীশের বিস্মিত চোখ।

ডক্টর ভাটনাগর একটা চেয়ারে বসে পড়েছিলেন। তিনি পায়ের ওপর পা তুলে বললেন, 'ইয়েস মিঃ সেন, আপনাকে বলেছিলাম, এর আগে শর্মাজীর মেয়ে দুবার বেহুঁশ হয়েছিল। ইন বোথ দ্য কেসেস, ইট হ্যাপেন্ড ইন দ্য সেম এনভায়রনমেন্ট। আই মিন, একই রকম এক পাহাড়ী পরিবেশে দুজন যুবকের সম্মুখীন হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল গুড়িয়া। তাদের বয়স প্রায় আপনারই মতো ছিল।'

মনীশ কিছু বুঝতে পারল না। হেঁয়ালীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডক্টর ভাটনাগরের দিকে।

ডক্টর ভাটনাগর আবার বললেন, 'আমাদের ধারণা, গুড়িয়ার জীবনে এমন একটা অভিশপ্ত ঘটনা ঘটেছে যার সাথে এক যুবক জড়িয়ে আছে। কিন্তু ঘটনাটা ওর স্মৃতিতে নেই। শুধু এই ধরনের পরিবেশে, ওই বয়সী যুবকের সাথে দেখা হলে সেটা ওর মগজে স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে ওঠে। তার রি-এ্যাকশন এই জ্ঞান হারানো।'

এতক্ষণে কিছু বুঝল মনীশ। জিজ্ঞেস করল, 'ঘটনাটা ওর স্মৃতিতে নেই আপনারা জানলেন কি করে?'

'এ ব্যাপারে আমি ও আমার শিমলার সাইকেয়াট্রিক বন্ধু ওকে বহু জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। কোনো জবাব পাওয়া যায় নি।' ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'তাছাড়া শর্মাজী ও গুড়িয়ার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবরাও আমাদের কোনো ঘটনার কথা বলতে পারেনি।'

মনীশ তাকিয়ে রইল। ওর চোখে বিস্ময় ছিল, দুঃখও ছিল।

সব শেষে ডক্টর ভাটনাগর আসল প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, 'মিঃ সেন আমি এ ব্যাপারেই আপনার সাথে কিছু কথা বলতে এসেছি।'

'আমার সাথে?' মনীশ তাকাল।

'হ্যাঁ, অরবিন্দ—' রাজেশ বলল, 'ডক্টর ভাটনাগর এ নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চান।'

সঙ্গীতা তাকাল রাজেশের দিকে। সেও বুঝতে পারল না ডক্টর ভাটনাগর কি বলতে চান।

ডক্টর ভাটনাগর তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন।

মনীশের কোয়ার্টার থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল সঙ্গীতার। ডক্টর ভাটনাগরের সঙ্গে অতক্ষণ কথা হল মনীশের। তারপর মনীশ ও রাজেশ দাবা খেলো বসে। সঙ্গীতা নিজের কোয়ার্টারে যখন ঢুকল তখন আড়াইটে বেজে গেছে। খাবারের বাসন-পত্রগুলো রান্নাঘরে রেখে ছুটে এল গুড়িয়ার কাছে। আজ শর্মাজী মেয়ের জন্য অফিস যাননি। তবু সঙ্গীতা গতকাল থেকে প্রায় সব সময় গুড়িয়ার সঙ্গেই কাটাচ্ছে।

গুড়িয়া বিছানায় বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল।

ঘুরে সঙ্গীতার দিকে একবার তির্যক দৃষ্টি হেনে আবার সে জানলার দিকে মুখ ফেরাল।

'গুড়িয়া—একটু দেরি হয়ে গেল রে!' সঙ্গীতা বিছানা কাছে এসে দাঁড়াল।

'যাও! আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে না।' গুড়িয়া শরীরে অভিমানের একটা ঝাঁকুনি দিল।

'কোথায় গিয়েছিলুম জানিস?' সঙ্গীতা বিছানার ধারে বসে বলল, 'তোর যে প্রাণ বাঁচাল তাকে দেখতে।'

গুড়িয়া আড় চোখে তাকাল। বিরক্ত ভরা দৃষ্টি।

'অরবিন্দর অবস্থা সঙ্গিন।' সঙ্গীতা বলল, 'তোকে কাল হাসপাতালে পৌঁছিয়ে ডাক্তার না দেখিয়ে কোয়ার্টারে চলে গিয়েছিল। বেচারী অসুস্থ হয়ে একা একা পড়ে আছে। কেউ দেখার নেই।'

গুড়িয়া তবু কিছু বলল না।

সঙ্গীতা এবার প্রসঙ্গ পাল্টালো। ডাক্তার ভাটনাগর বলেছেন অরবিন্দর প্রতি গুড়িয়ার সহানুভূতি সমবেদনা ধীরে ধীরে আনতে হবে। তাড়াহুড়ো করে নয়। টেবিলের ওপর ওষুধের ট্যাবলেট গুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'গুড়িয়া, দুপুরের ওষুধ খাসনি?'

'না—' গুড়িয়া রাগতস্বরে বলল, 'কে খাওয়াবে?'

'ও তাই তো?' সঙ্গীতা মুচকি হাসল। বিছানা থেকে উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে বলল, 'ভাবী ছাড়া কে খাওয়াবে তোকে ওষুধ।'

সঙ্গীতা স্ট্রিপ ছিঁড়ে একটা ট্যাবলেট নিল হাতে। টেবিলের ওপর থেকে জলের গ্লাস তুলে আবার বিছানার কাছে এল।

'নে আয়!' সঙ্গীতা ডাকল গুড়িয়াকে।

গুড়িয়া ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। এবার হাসিতে ভরে উঠল সারা মুখ। ঘুরে জানু ও হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে শিশুদের মত এগিয়ে এল সঙ্গীতার কাছে। মুখ তুলে হা করল। সঙ্গীতা গ্লাস থেকে ওর মুখে জল ঢেলে ছেড়ে দিল ট্যাবলেটটা।

'এখন লুডো খেলবি না গল্প করবি?' সঙ্গীতা টেবিলে গ্লাস রেখে জিজ্ঞেস করল।

'কিচ্ছু করব না।' গুড়িয়া হাত দুটো প্রসারিত করে জড়িয়ে ধরল সঙ্গীতাকে। ওর বুকে মুখ গুঁজে জোর করে জাপটে ধরল হঠাৎ।

সঙ্গীতা গুড়িয়ার মাথায় চুলে আদরের হাত বুলোতে লাগল। হাত বুলোতে বুলোতে অকস্মাত সঙ্গীতা অনুভব করল, গুড়িয়া কাঁদছে। সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে ওর কান্না ভেজা মুখ তুলে ধরল সঙ্গীতা।

'কি হল গুড়িয়া!' সঙ্গীতা বিস্মিত, অপ্রস্তুত।

গুড়িয়া কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'সকালে ডক্টর আঙ্কলও বলছিলেন—'

'কি বলছিলেন?' সঙ্গীতা গাঢ় হাতে ধরে রইল গুড়িয়ার চিবুক।

'ওর কথা।' গুড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলল, 'যাকে দেখে কাল আমি বেহুঁশ হয়ে গেছি। ও নাকি ভীষণ ভাল লোক, সারা তামিয়া নাকি ওকে ভালবাসে।'

'ঠিকই বলেছে।' সঙ্গীতা হাত দিয়ে গুড়িযার কান্না মুছে দিতে দিতে বলল, 'আমি নিজের চোখে এক্ষুনি দেখে এলাম। কত লোক এসেছে ওকে দেখতে। কাল রাতে ক্যাণ্টিনের একটা ছেলে সারা রাত ওর পাশে ছিল। বেচারার কেউ তো নেই।'

'কেউ নেই কেন?' গুড়িয়া সিক্ত আয়ত চোখে তাকাল।

'ওর বাবা নেই। শুধু মা আর ছোটো বোন থাকে কলকাতায়। এখানে ও একা। তার ওপর মায়ের ক্যানসার। বেশী দিন বাঁচবেন না।'

সমবেদনায় গুড়িয়ার ঠোঁট তিরতির করে কেঁপে উঠল।

'ভাবী, ওর এই অবস্থা আমার জন্য হল?'

'তোর জন্য মানে, তোকে বাঁচাতে গিয়ে হয়েছে?'

গুড়িয়া সঙ্গীতার বুকে মুখ গুঁজে আবার কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বুকের মধ্যেই বলল, 'আমি কি করব ভাবী। তখন ভয়ে কেমন যেন হয়ে যায় আমার শরীর। আমি বুঝতে পারি না?'

সঙ্গীতা আলতো হাতে গুড়িয়ার মুখ আবার তুলল বুক থেকে। মিষ্টি গাঢ় স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কেন হয় বুঝতে পারিস না?'

'না!' গুড়িয়া গম্ভীর হয়ে সরে গেল জানলার কাছে। মুখ ঘুরিয়ে শিক ধরে বসল আবার।

সঙ্গীতা তাকাল গভীর ভাবে। গুড়িয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। সেই মোক্ষম প্রশ্নের উত্তরটি আর পাওয়া গেল না। যে প্রশ্ন সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর মোহন, তামিয়ার ডক্টর ভাটনাগরও অনেক বার জিজ্ঞেস করেছেন গুড়িয়াকে। কেন হয় এমন গুড়িয়ার? কোনো যুবকের সামনে ও একা আসতে পারে না। আর নির্জন পরিবেশে সেই যুবকটি যদি অরবিন্দর মত দেখতে হয় তাহলে সাথে সাথে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। কেন?

এ মুহূর্তে এই নিয়ে আর বেশী চাপ দিল না সঙ্গীতা। ডক্টর মোহন ও ডক্টর ভাটনাগরের পরিকল্পনা অনুযায়ী অরবিন্দকে যদি গুড়িয়ার কাছাকাছি আনা যেতে পারে তাহলে সে-ই খুঁজে বের করবে এর রহস্য।

মনে হয়, বরফ সেদিকে গলতে শুরু করেছে। দেখা যাক। সঙ্গীতা লুডোর বোর্ড টেবিল থেকে তুলে এনে, বসল আবার বিছানায়।

সন্ধ্যেব সময় মনীশের কোয়ার্টারে ফোন বেজে উঠল।

মনীশ চেয়ার থেকে উঠে রিসিভার্ তুলল কানে।

'ডক্টর ভাটনাগর বলছি—'

মনীশ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'ইয়েস্ ডক্টর, বলুন!'

'শরীর এখন কেমন? এ্যানি প্রবলেম্?'

'না। ঠিক আছে।'

'ব্যথা বেদনা?'

'এখন নেই ডক্টর।'

'একটা ব্যাপাবে আপনাকে ফোন করছি।'

'বলুন।'

'একটু আগে শিমলা থেকে ডক্টর মোহন ফোন করেছিলেন। অ্যাজ পার হিজ সাজেশন আপনাকে একটা অনুরোধ করব?'

'গুড়িয়ার ব্যাপারে কিছু বলবেন?'

'অফ কোর্স!'

'ডক্টর ভাটনাগর—' মনীশ স্বরে অকপট আন্তরিকতা নিয়ে বলল, 'আপনি ও ডক্টর মোহন গুড়িয়াকে সুস্থ করার জন্য যে আপ্রাণ প্রয়াস করছেন, তাতে আমি সামান্যতম সাহায্য করতে পারলেও নিজেকে সার্থক মনে করব। অনুরোধ নয় নির্দেশ দিন। বলুন কি করতে হবে?'

ডক্টর ভাটনাগর তবু কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, 'ডক্টর মোহন বলছেন, গুড়িয়াকে সুস্থ করতে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আপনি যদি মাথার চুল একটু ছোটো করে কাটিয়ে নিতেন খুব ভাল হত। অন্তত কয়েকদিনের জন্য। গুড়িয়া সুস্থ হলে তারপর না হয় আবার বাড়িয়ে নেবেন।'

মনীশ আচমকা এই প্রস্তাব শুনে একটু থমকে গেলেও মনে মনে হেসে উঠল। কয়েকদিন কি চিরকালের জন্য এই চুলের ভার থেকে সে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু…এই মুহূর্তে…

মনীশকে নিরুত্তর দেখে ডক্টর ভাটনাগর ওপারে বলে উঠলেন, 'মিঃ সেন—।'

'ইয়েস ডক্টর—' মনীশ বলল, 'কেটে ফেলব। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।'

'থ্যাঙ্কস এ লট!' ডক্টর ভাটনাগর উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, 'একটা বিরাট চিন্তা আপনি দূর করে দিলেন। এখন আমরা পরবর্তী স্টেপ নিয়ে ভাবতে পারব। ও. কে. মিঃ সেন, আপনি বিশ্রাম নিন। আমি ডক্টর মোহনকে সুখবরটা জানাই।'

ডক্টর ভাটনাগরের উচ্ছ্বাস মনীশের ঠোঁটে অনাবিল হাসি এনে দিল। আস্তে আস্তে সে নামিয়ে রাখল রিসিভার্।

যাক্, গুড়িয়ার জন্য আপাতত পরচুলা থেকে মুক্তি পেল মনীশ। আজকেই সে খুলে ফেলবে উইগ। যা হয় হোক। এখন আর এই ছদ্মবেশ ধারণ করার ইচ্ছেও নেই মনীশের। অরবিন্দ নাম থেকেও সে নিবৃত্তি পেতে চায়। বেকারিত্বের জ্বালা ঘোচাতে গিয়ে এই মেকী খোলসের জ্বালা ওর কাছে বড় দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

হাল্কা পায়ে বাথরুমের দিকে এগোলো মনীশ। উইগ খুলতে।

পরেরদিন মনীশের উইগবিহীন নতুন রূপ দেখে অফিসে প্রত্যেকেই হকচকিয়ে গেল। চুল কাটার কৈফিয়ত একে একে সবাইকে দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত মনীশ সাকসেনা সাহেবের কাছে পৌঁছল।

তিনি খানিকক্ষণ মনীশকে বিস্মিত চোখে নিরীক্ষণ করে বললেন, 'হোয়াটস দ মেটার মিঃ সেন, চুল এভাবে কেটে ফেললেন ?'

'ইয়েস স্যার। একটু অসুবিধে হচ্ছিল।' অন্যান্য অফিস সংক্রান্ত কথা শুরু করার আগে ওইটুকু বলল মনীশ। এই একই কথা সবাইকে সে বলেছে।

যদিও সাকসেনা সাহেবের দৃষ্টিতে কোনো সন্দেহের ভাব বা প্রকাশ ছিল না। এবং মনীশ জানে তাঁর কাছে অরবিন্দর ছবি সমেত সার্ভিস ফাইল আছে। যে ছবির সাথে মনীশের এখন বিস্তর পার্থক্য। কিন্তু তা নিয়ে আর ভয় নেই মনীশের। অরবিন্দ-রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক সব এখন সে কাটিয়ে ফেলেছে। বরং মনীশ এখন চায় আবার মনীশের মধ্যে ফিরে যেতে। ছদ্মবেশ উন্মোচন থেকে শুরু হল যখন, দেখা যাক কি হয় এর শেষ পরিণতি ?

মনীশ স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি নিয়ে প্রবেশ করল ওর চেম্বারে।

চেয়ারে বসে প্রথমে সে ফোন করল হাসপাতালে। কাল সন্ধ্যের সময় ডক্টর ভাটনাগরকে দুটো প্রশ্ন করতে সুযোগ পায়নি মনীশ।

ডক্টর ভাটনাগর ফোন ধরতে সেই প্রথম প্রশ্নটা করল মনীশ, 'মহাবীরের মা কেমন আছে ডক্টর ?'

'যে অবস্থায় এসেছিল তার চেয়ে অনেক ভাল।' ডক্টর ভাটনাগর জবাব দিলেন, 'প্যাথলজিকল ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়ে গেছে। ওকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। প্রপার ট্রিটম্যান্ট খুব শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে।'

'আর গুড়িয়া ?' এটা ছিল মনীশের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

'একেবারে সুস্থ। আই মিন শারীরিক।' ডক্টর ভাটনাগর বললেন 'কাল রাতে দেখে এসেছি। আজ সকালে আমার কোয়ার্টার থেকে দেখলাম, মিঃ সাহানীর বাগানে ফুল তুলছে।'

'গুড!—ডক্টর, ফর ইয়োর ইনফরমেশন, চুল আমি কেটে ফেলেছি।'

'খবর পেয়েছি!' ডক্টর ভাটনাগর খুশীর স্বরে বললেন, 'আপনার প্রতিবেশী মিঃ রাও একটু আগে হাসপাতালে এসেছিলেন। তিনি বললেন।—রিয়েলী মিঃ সেন, আপনার যা সহযোগিতা পাচ্ছি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস গুড়িয়া এবার সুস্থ হবেই।'

'আমার তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।' মনীশ মৃদু হেসে বলল, 'ডাক্তার

পেশেন্টের এরকম মধুর সম্পর্ক আমি কোথাও দেখিনি। আপনাদের আন্তরিক সদিচ্ছা সার্থক হবে এ আমারও বিশ্বাস।'

'এখন সব কিছু নির্ভর করছে আপনার ওপর।'

'আমায় যা দায়িত্ব দেবেন আমি যথাসাধ্য করব।' মনীশের গম্ভীর কণ্ঠে গুরুত্বের আভাস. 'তবে একটা ভয়, আবার কোনো অঘটন ঘটবে না তো?'

'অঘটন যাতে আর না ঘটে সে জন্যেই আমাদের এই প্রয়াস।' ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'শুরুতে কিছু ঘটলে আমি তো আছি। ও নিয়ে চিন্তা করবেন না।'

'ঠিক আছে।—ছাড়লাম।'

মনীশ গুড়িয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই নামাল রিসিভার। ঠিক সেই মুহূর্তে দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে সে দেখল, গুড়িয়া কোয়ার্টারের আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে নীচে নামছে। বাবার বাঁ হাত নিজের ডান হাতে জড়িয়ে।

সম্মোহিতের মত চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল মনীশ। জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গুড়িয়ার জন্য তীব্র সমবেদনায় ভরে উঠল ওর বুক।

অসুখ মানেই শরীরের যাতনা-যন্ত্রণা। আর যে মানসিক অসুস্থ, তার যন্ত্রণা আরো কণ্টকর, আরো মর্মান্তিক। কারণ সেটা মনের ব্যথা। তার আবেগ তার অনুভূতি কখনো এমন কোনো আঘাত পেয়েছে যে আঘাত সে ভিতর থেকে এখনো ভুলতে পারেনি।

অথচ গুড়িয়া আজও বাবাকে নিয়ে আসছে ওর সেই স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে। বাবার হাতে হাত জড়িয়ে অফুরন্ত হাসি আর অনর্গল কথার ফুলঝুরি ছড়াতে ছড়াতে। প্রতি ক্ষণ হাসে মেয়েটা। ফুরফুরে প্রজাপতির মত যেন উড়ে বেড়ায়। উচ্ছলতা ওর প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। শুধু কখনো কখনো এক বিশেষ মুহূর্তে সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। এই বিশেষ অভিশাপগ্রস্ত মুহূর্তটি ওর জীবন থেকে মুছে ফেলতে হবে। ডক্টর মোহন ও ডক্টর ভাটনাগর তার ভার দিতে চাইছেন মনীশকে। তাঁরা মনীশকে তাঁদের চিকিৎসার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে চান। খুব কঠিন দায়িত্ব। পারবে কি মনীশ?

কে যেন হাত রাখল মনীশের পিঠে। মনীশ চমকে ঘুরে তাকাল। পেছনে দাঁড়িয়ে রাজেশভাইয়া। কখন যে ঢুকেছে ঘরে বুঝতেই পারেনি।

রাজেশ জানলা দিয়ে গুড়িয়া ও শর্মাজীকে লক্ষ্য করে মনীশের পিঠে হাতটা গাঢ় করল।

'অরবিন্দ—' রাজেশ মনীশের মুখ নিরীক্ষণ করে বলল, 'গুড়িয়া এমন মেয়ে ওকে না ভালবেসে পারা যায় না।'

মনীশের মুখ রক্তিম হয়ে উঠতে উঠতে গম্ভীর হল। সাবধান হল মনীশ। সে এখানে অরবিন্দ। গুড়িয়াকে এভাবে সে লুকিয়ে দেখে মনীশের চোখে। অবশ্য দেখতে ভাল লাগে বলে। ওকে নিয়ে ভাবতেও এক অপূর্ব আনন্দ বোধ করে সে। কিন্তু গুড়িয়াকে ভালবাসার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ ভালবাসায় মিথ্যের কোনো স্থান নেই।

মনীশ ঘুরে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'কি আবোল তাবোল বলছ রাজেশভাইয়া!

গুড়িয়াকে আমি ভালাসব ? এই দুদিন, তোমাদের কাছে গুড়িয়ার অসুখের কথা শুনে ওকে আমি অন্য চোখে লক্ষ্য করছিলাম আজ।'

'যে চোখেই লক্ষ্য কর,' রাজেশ মনীশের সাথে ওর টেবিল অব্দি এগিয়ে এসে বলল, 'আমার ধারণা। তুমি ওকে প্রথম দিন থেকেই ভালবেসে ফেলেছ। তা না হলে গুড়িয়াকে দেখামাত্র ওরই জন্য ওর কাছ থেকে এ ভাবে দূরে সরে আসতে না ?'

'ভুল ধারণা তোমার।' মনীশ আরো গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু তিক্ত স্বরে বলল, 'গুড়িয়ার পরিবর্তে কোনো পুরুষও যদি আমার জন্য অসুবিধে বোধ করত আমি দূরে সরে আসতাম।'

রাজেশ মনীশের বিরক্তি ভরা গাঢ় গাম্ভীর্য দেখে ঘাবড়ে গেলেও হাল ছাড়ল না। সামনের চেয়ারে বসে বলল, 'মানছি। তোমাকে এতদিন দেখার পর সেটা যে সত্যি, বুঝতে পারছি। কিন্তু রাগ করছ কেন ? গুড়িয়াকে ভালবাসা কি অন্যায় ?'

রাজেশের দিকে তাকাল মনীশ। একবার ভাবল সজোরে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ ওর পক্ষে গুড়িয়াকে ভালবাসা অন্যায়। কারণ ওর মিথ্যে পরিচয়। এই মিথ্যের ওপর কোনো ভালবাসা গড়ে উঠতে পারে না।'

নিজেকে সংযত করল মনীশ।

চোখে মুখে যন্ত্রণার ভাবটা প্রশমিত করে চেয়ারে বসে বলল, 'রাজেশভাইয়া, তোমরা নিশ্চিন্তে থাক। আমি গুড়িয়াকে সুস্থ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু এ নিয়ে দয়া করে মনে কোনো অলীক ভাবনা এনো না। প্লিজ...'

গাম্ভীর্য, বেদনা, বিরক্তির সংমিশ্রণে মনীশের মুখের গ্রন্থিগুলো তখন যেন অবশ হয়ে গেছে। সেই থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে রাজেশ আর কথা বাড়াতে সাহস পেল না।

ধীরে ধীরে প্রসঙ্গ পালটালো সে।

নিউ জার্সি। বিকেল।

রোদ উধাও হওয়ার সাথে সাথে হাড় কাঁপানো শীত ঘন হতে শুরু করেছে সারা শহরে। অরবিন্দ মাথায় হ্যাট ও গায়ে ওভারকোট পরে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ধারে পাব্লিক ফোন-বুথের কাছে এল।

বুথের ভেতর এখন কেউ নেই। দরজা ঠেলে ফোনের কাছে যেতেই পেছনে দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

কোটের পকেট হাতড়ে কাগজের একটা টুকরো বের করল অরবিন্দ। তাতে একটা ফোন নম্বর লেখা। কয়েন ফেলে নম্বর গুলো পুশ করতে লাগল সে।

এক মুহূর্তের বিরতি। তারপর ওপার থেকে ভেসে এল কর্কশ এক পুরুষকণ্ঠ —'হ্যালো ? হু ইজ দেয়ার ?'

অরবিন্দ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'মে আই স্পিক টু আজীজ।'

'স্পিকিং।'

'আজীজ'। আমি অরবিন্দ বলছি।'

'অরবিন্দ !' আজীজের বিস্মিত স্বর, 'অরবিন্দ সেন ?'

'ইয়েস ম্যান। আয় অ্যাম স্পিকিং ফ্রম নিউ জার্সি নট ফ্রম ইণ্ডিয়া।'

'নিউ জার্সি !' ওপারে আজীজ আরো অবাক। জিজ্ঞেস করল, 'কবে এসেছিস ?'

'এক মাস হয়ে গেল।'

'মায় গড ! আমার ফোন নম্বর কে দিল ?'

'সে অনেক কথা। ইট ওয়াজ আ টাফ্ জব ম্যান টু গেট ইয়োর ফোন নাম্বার। দেখা হবে কোথায় বল ?'

'তুই উঠেছিস কোথায় ?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল আজীজ।

'ঠিকানা দিতে পারি, কিন্তু কি হবে ?'

'তুলে নিয়ে আসছি এখুনি।'

'না। অসুবিধে আছে।' অরবিন্দ বুথের দেয়ালে গা এলিয়ে বলল, 'যেখানে উঠেছি সেখান থেকে সেজন্যেই ফোন করছি না। দিস ইজ পাব্লিক ফোন ম্যান।'

'ঠিক আছে জায়গাটার নাম কি ? নিউ জার্সির কোথায় ?'

'সামার্গ---। কিন্তু এখানে আমি থাকতে চাই না। কেটে পড়ব, তোর ঠেক পেলে। ডু ইয়ু ফলো মি ?'

'নো প্রবলেম্।' আজীজ বলল, 'তুই এক কাজ কর, মালপত্র সমেত কাল সকাল দশটায় সামার্গ রেল স্টেশন থেকে অ্যাম ট্র্যাক ট্রেন ধরে, নে ওয়ার্ক স্টেশনে চলে আয়।'

'নে ওয়ার্ক ?' অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণের জার্নি ?'

'তা ঘণ্টা খানেকের ওপর লাগবে।' আজীজ জবাব দিল, 'নে ওয়ার্কে নেমে টিউব ধরে চলে আয় পোর্ট অথারিটি স্টেশনে। আমি ওখানে দুপুর বারোটা নাগাদ থাকব।'

'ঠিক আছে, কিন্তু ওটা দশটা না করে আরো সকালে হয় না ?' অরবিন্দ বলল, 'ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, বাড়ির লোক ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে আমি পালাতে চাই।'

সামান্য বিরতির পর আজীজ বলল, 'ও. কে. তুই সকালে বেরো। আমি পোর্ট অথারিটি স্টেশনে ন'টায় যাব। তোকে হয়ত অপেক্ষা করতে হবে কিছুক্ষণ।'

'দ্যাট ডাজ্‌নট ম্যাটার। আমি থাকব ওখানে।'

বুথ থেকে হাল্কা পায়ে বেরিয়ে এল অরবিন্দ। সুমিতের বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করল।

আজীজ অরবিন্দর পুরোনো বন্ধু। কলকাতার ডক এলাকায় বছর দেড়েক আগে পর্যন্ত সে কুখ্যাত এক মস্তান ছিল। তখন আজীজ যেমন অরবিন্দকে নানা ব্যাপারে সাহায্য করেছে তেমনি আজীজকেও অরবিন্দ বহু সঙ্গিন বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। অরবিন্দকে সাহায্য বলতে, প্রধানত ভাল বিদেশী মদ ও লাস্যময়ী নারী যোগান দেওয়া। তার পরিবর্তে অরবিন্দ ওর মামির প্রভাব কাজে লাগিয়ে আজীজকে বহুবার পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করেছে। বলা বাহুল্য, এই দেয়া-নেয়ার দৌলতে ওদের ইয়ার-দোস্তি এক সময় বেশ গাঢ় হয়েছিল। কিন্তু বছর দেড়েক আগে কলকাতায়

হঠাৎ দুজনকে খুন করে ফেলে আজীজ। খুন যারা হল তাদের মধ্যে একজন ছিল এক প্রভাবশালী সংগঠনের লোক। অরবিন্দর মামির প্রভাব তাদের কাছে ফিকে হয়ে যায়। তাই শেষ পর্যন্ত আজীজকে পালাতে হল সেখান থেকে। এবং পালিয়ে সে একেবারে ডেরা বাঁধল নিউ ইয়র্কে এসে ওর এক দূর সম্পর্কের দাদার আশ্রয়ে।

তারপর অরবিন্দ অনেক উড়ো খবরে জানতে পারে যে আজীজ এখন নিউইয়র্কে বহাল তবিয়তে আছে। দাদার ড্রাগ স্মাগলিং দলের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী হয়ে। শুধু ঠিকানাটা অরবিন্দ কিছুতেই হাসিল করতে পারছিল না।

নিউ জার্সিতে একমাস থেকে বিভিন্ন সূত্রে প্রচেষ্টা চালাতে চালাতে শেষ পর্যন্ত হদিশটা পাওয়া গেল। এখন অরবিন্দ সব দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত।

সত্যি কথা বলতে, সে আজীজের ভরসাতেই এসেছে স্টেট্স্-এ। রঞ্জনাকে সে ব্যবহার করেছে গাছে ওঠার সিঁড়ির মত। সিঁড়িটা এবার সে ফেলে দিতে চায়। কারণ তার কাজ হয়ে গেছে।

দ্রুত পায়ে হাঁটা শুরু করল অরবিন্দ। এখান থেকে রঞ্জনাদের বাড়ি অনেক দূর। লুকিয়ে ফোন করার উদ্দেশ্যে বহুদূরে সে চলে এসেছিল।

তামিয়া। সন্ধ্যে ছ'টা।

ডক্টর ভাটনাগর তার কোয়ার্টারের বাগানে বসে রাজেশ ও সঙ্গীতার জন্য অপেক্ষা করছেন। চারপাশে ছোটো ছোটো ফুলের কেয়ারী দিয়ে ঘেরা সবুজ ঘাসে আবৃত একটা গোল চত্বর। তাতে বেতের একটা টেবিল ও চারটে চেয়ার পাতা।

ডক্টর ভাটনাগর আধ ঘণ্টার ওপর বসে আছেন চেয়ারে।

ছ'টা দশে রাজেশ ও সঙ্গীতা পেঁছিল সেখানে। ডক্টর ভাটনাগর চেয়ার থেকে উঠে গেটে গিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানালেন।

দুজনেই গম্ভীর মুখ নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

ডক্টর ভাটনাগর রাজেশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার মিঃ সারীন, আপনি বলেছিলেন সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আসবেন। সাড়ে ছ'টায় কোথায় নাকি আপনাদের যাবার কথা।'

জবাবটা দিল সঙ্গীতা। থমথমে মুখে বলল, 'হ্যাঁ সাড়ে ছ'টায় যেখানে যাবার কথা সেখানে আমরা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে পেঁছে গিয়েছিলাম। আর আপনার এখানে সাড়ে পাঁচটায় আসার কথা, এলাম প্রায় সাড়ে ছ'টায়।'

'তাই তো দেখছি!' ডক্টর ভাটনাগর চেয়ারগুলোর দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'কিন্তু কারণ কি?'

'কারণ মিঃ সারীনকে জিজ্ঞেস করুন।' সঙ্গীতা ক্রোধ মিশ্রিত গম্ভীর স্বরে বলল, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট দুটো সে-ই করেছে। আমাকে যেভাবে বলেছে, আমি গুড়িয়াকে নিয়ে পাঁচটা কুড়িতে পেঁছে গেছি ভিডিও পার্লারে, সিনেমা শো দেখতে। গিয়ে দেখি শো সাড়ে ছ'টায়। তারপর উনি অফিস থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, ভুল হয়েছে, সাড়ে পাঁচটায় আপনার এখানে আসার কথা, ওখানে নয়।'

ডক্টর ভাটনাগর হেসে উঠলেন। রাজেশের ভুলো মনের সঙ্গে তিনিও পরিচিত। হাসতে হাসতে বললেন, 'তারপর ?'

'আপনি হাসছেন ডক্টর ভাটনাগর।' সঙ্গীতা রাগতস্বরে বলল, 'প্লিজ এরও একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন—। মগজের। দেখছেন তো এর ভুলের জন্য আমার কি বেহাল! সিনেমা দেখা তো হলই না, গুড়িয়াকে কোয়ার্টারে রেখে ছুটতে ছুটতে আসছি এখানে। পাছে আপনি আবার বেরিয়ে যান।'

রাজেশ খুকখুক করে কাসতে কাসতে নির্বিকার ভঙ্গীতে চেয়ারে বসে বলল, 'ঠিক আছে এখন বসো! ডক্টর ভাটনাগর আমাদের খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ডেকেছেন।'

'প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা তুমি ভুলে গেলে কি করে?' সঙ্গীতার রাগ তখন কাটেনি।

'ভুলিনি তো!' রাজেশ সরল সহজ স্বরে বলল, 'এখানে আসতে হবে পুরোপুরি মনে ছিল। তবে ভেবেছিলাম সাড়ে ছ'টায় বোধহয়।'

'ও-ও-', সঙ্গীতা ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'আর সত্যি যদি সাড়ে পাঁচটায় শো শুরু হত'? সেটা তো আড়াই ঘণ্টার আগে শেষ হত না। তখন ?'

'আমি অতো বেআক্কেল নই।' রাজেশ মুখ তুলে বলল, 'সাড়ে পাঁচটায় এই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল বলেই সাড়ে ছ'টার শোর টিকিট কেটেছি, বুঝলে!'

সঙ্গীতা কোমরে হাত তুলে ডক্টর ভাটনাগরের দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'বলছি না এরও চিকিৎসা করুন। ভুল করবে তবুও দেখছেন কেমন উল্টোপাল্টা বোঝাবে!'

'প্লিজ, এবার বসুন মিসেস সারীন।' ডক্টর ভাটনাগর মৃদু হেসে বললেন, 'আমি এও জানি মিঃ সারীনের এরকমই এক ভুলের জন্য আপনাদের দুজনের প্রেমের সূত্রপাত হয়েছিল।'

'কি করে জানলেন?' সঙ্গীতা অবাক।

'মিঃ সারীন সে গল্প করেছেন আমায়।'

'আচ্ছা!' চেয়ারে বসতে বসতে সঙ্গীতা স্বামীর দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল, 'ভুলের রুগী সে ঘটনা তাহলে ভোলে নি এখনো?'

'ভুলবেন। ডক্টর ভাটনাগর হেসে বললেন, 'সেই ঘটনা মিঃ সারীনের জীবনে সবচেয়ে অবিস্মরণীয় দিন। উনি নিজে আমায় বলেছেন, ভাগ্যিস ঘটনাটা ঘটেছিল! তাই আপনাকে তিনি পেয়েছেন।'

ইস্—' সঙ্গীতার মুখে লজ্জা মিশ্রিত হাসি।

'যাক্ যে জন্য আপনাদের ডেকেছি—' ডক্টর ভাটনাগর এবার আসল প্রসঙ্গের উত্থাপন করলেন, 'মিসেস সারীন, আপনি আপনার স্বামীর লেটেস্ট আবিষ্কারের কথা শুনেছেন? আই মিন, মিঃ সেন যে তার চেম্বারের জানলা থেকে গুড়িয়াকে—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি।' সঙ্গীতা উৎফুল্ল হয়ে পরমুহূর্তে মুখ গম্ভীর করে বলল, 'কিন্তু ডক্টর ভাটনাগর, অরবিন্দভাই গুড়িয়াকে লুকিয়ে দেখে বটে, ভালবাসবে কি ?'

'আপাতত ভালবাসার অভিনয়টা করুক।' ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'হতেও তো পারে, অভিনয় করতে করতে একদিন তিনি দেখবেন, ওকে সত্যিকারের ভালবেসে ফেলেছেন।'

'আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব সেই দিনটির জন্য।' সঙ্গীতা হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, 'আমার বিশ্বাস, ঈশ্বর অরবিন্দকে এখানে পাঠিয়েছে, দুটি সুন্দর জীবনের যোগাযোগের জন্য।'

'ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে গুড়িয়াকে আমরা সুস্থ দেখতে চাই।' ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'এবং এ ব্যাপারে আপনি তো অনেকটা এগিয়ে গেছেন মিসেস সারীন?'

'হ্যাঁ কিছুটা এগিয়েছি।' সঙ্গীতার চিন্তিত স্বর, 'তবে এখনো গুড়িয়ার হাব-ভাবে বুঝতে পারছি না, কতটা ওর ভয় কেটেছে।'

'প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। আমিও চেষ্টা করছি।' ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'আমার কিন্তু ধারণা, গুড়িয়ার মনে আমরা একটা নতুন ভাবনা সৃষ্টি করতে পেরেছি। অরবিন্দ সেনকে নিয়ে ভাবছে সে। অবশ্য মনে মনে। তার বহিঃপ্রকাশ এখনও হয়নি। সেটা আমরা বুঝতে পারব ওদের দুজনের তৃতীয় সাক্ষাতে।'

'কবে হবে সেটা?' সঙ্গীতার অধীর প্রশ্ন।

'খুব শীঘ্রই, আপনাদের কোয়ার্টারে কোনো প্রীতি অনুষ্ঠানে।'

'উপলক্ষ?' সঙ্গীতার উৎসাহ চোখে-মুখে উপচে পড়ল।

'উপলক্ষ একটা খুঁজে বের করতে হবে।' ডক্টর ভাটনাগর রাজেশের দিকে তাকালেন, 'মিঃ সারীন কাছাকাছির একটা বিশেষ তারিখ বলুন না? আপনার জন্মদিন কিংবা মিসেস সারীনের জন্মদিন অথবা আপনাদের বিবাহ বার্ষিকী?'

'কাকে জিজ্ঞেস করছেন?' সঙ্গীতার ভ্রূকুটি সহ প্রশ্ন, 'আজকের তারিখ ওর মনে আছে? শুনুন, ওর জন্মদিন সেকেণ্ড নভেম্বার, আমার জন্মদিন এইটথ ডিসেম্বর আর আমাদের বিবাহ বার্ষিকী তিরিশে জানুয়ারী। কোনোটাই অবশ্য আমরা পালন করিনা। তবে সব তারিখ দূরের।'

'একটা তারিখ কাছাকাছি আছে।' রাজেশ বেশ গাম্ভীর্য নিয়ে বলল।

'কোন্ তারিখ?' সঙ্গীতা চোখ মুখ কুঁচকে তাকাল রাজেশের দিকে।

'সেটাও একটা বিয়ের।' রাজেশ বেশ নির্লিপ্ত স্বরে বলল, 'মানে, আমি দুবার বিয়ে করেছিলাম তো?'

'দু'বার!' ডক্টর ভাটনাগর থতমত খেয়ে তাকালেন।

'কি বলছ তুমি!' সঙ্গীতা প্রায় আতঙ্কগ্রস্তের মত আর্তনাদ করে উঠল।

'ভুলে গেলে?' রাজেশ তাকাল সঙ্গীতার দিকে, 'ভুলো মন শুধু আমার? মনে নেই বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে আমরা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে পৌঁছলাম। ফিফথ এপ্রিল।'

ডক্টর ভাটনাগর অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। সঙ্গীতা একটা জোর নিঃশ্বাস নিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। ওর আরক্ত মুখ।

ডক্টর ভাটনাগর হাসতে হাসতে রাজেশের দিকে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললেন,

'রিয়েলী ! এই স্মৃতি-শক্তিতে আপনি মিসেসকে ছাড়িয়ে গেছেন। গুড, তাহলে ফিফথ এপ্রিল হবে আপনাদের লিগেল বিবাহ বার্ষিকীর অনুষ্ঠান। কত নম্বর ?'

'ইয়ে···সেটা তো মনে নেই ?' রাজেশ সঙ্গীতার দিকে তাকাল।

সঙ্গীতা মৃদু হেসে বলল, 'পাঁচ নম্বর !'

'বাঃ ! ডক্টর ভাটনাগর উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন, 'তাহলে প্রথম পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠান খুব ধুমধাম করে হবে। উইথ গ্র্যান্ডার অ্যান্ড একসটেসি !'

ফিফথ এপ্রিল। শুক্রবার।

সকাল থেকে গুড়িয়া সঙ্গীতাদের কোয়ার্টার সাজাচ্ছে। সঙ্গীতা ব্যস্ত রান্নায়। কুড়ি জনের মত লোক আসবে বিকেলে। তাদের জন্য নানা রকমের খাবার তৈরী করছে সঙ্গীতা। গুড়িয়া অবশ্য ঘর সাজাতে সাজাতে মাঝে মাঝেই রান্নাঘরে এসে সাহায্য করছিল সঙ্গীতাকে। ভীষণ উৎসাহ আজ গুড়িয়ার। অসীম আনন্দে উছলে পড়ছে ওর খুশী। এদিক-ওদিক বাগান থেকে কত রকমের ফুল তুলে তার মালা তৈরী করে নানাভাবে লাগাচ্ছে দরজায় জানলায়। বাস্তবের ঘরে একটা টেবিলে গোলাপের পাপড়ী ছড়িয়ে তার মাঝে রেখেছে রাজেশ ও সঙ্গীতার ছবি।

বাগানটা ঝাড়পোঁছ করে আশে পাশের কোয়ার্টার থেকে চেয়ার এনে বসিয়ে দিচ্ছে চারপাশ ছড়িয়ে। ফুল পাতা দিয়ে একটা তোরণও তৈরী করেছে গেটে। আবার রান্নাঘরে ছুটে এসে সঙ্গীতাভাবীর মশলাও পিষে দিচ্ছে হামাল দিস্তায়।

মশলা পিষতে পিষতে গুড়িয়া বলল, 'ভাবী গত বছরও তো ফিফথ জুলাই তোমরা ছিলে এখানে। তখন করলে না কেন পার্টি ?'

'তখন নতুন এসেছি। পরিচিতি আর কতটুকু হয়েছিল। তাই করিনি।' সঙ্গীতা উনোনে মাংস সাঁতলাতে সাঁতলাতে উত্তর দিল।

'আহা, আর কেউ নাই আসত।' গুড়িয়া ডান হাতে কপালের চুলের গোছ সরিয়ে বলল, 'তুমি, আমি আর রাজেশভাইয়া না হয় হৈ চৈ করতাম। কত মজা হতো বলতো।'

'তা হতো।' সঙ্গীতা প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা বন্ধ করতে করতে বলল, 'তবে এবার আরো হচ্ছে অরবিন্দর জন্য।'

'অরবিন্দ !' সঙ্গীতা পেষাই থামিয়ে বিড় বিড় করে উঠল।

ওর মুখের দিকে আড়চোখে একবার তাকাল সঙ্গীতা। তারপর হাতা নাড়তে নাড়তে বলল, 'অরবিন্দ জোর না করলে এবারও হত কিনা সন্দেহ ?'

'উনি কি আসবেন ভাবী ?'

'বাঃ আসবে না !' সঙ্গীতা আবার তাকাল গুড়িয়ার দিকে। মৃদু হেসে বলল, 'তুই যেমন আমাদের ভীষণ ভালবাসিস, অরবিন্দও তো আমাদের আপন জন। তুই জানিস ও বেচারী কেন আসে না আমাদের কাছে ?'

'কেন ?'

'তোর জন্য।' সঙ্গীতা ওর কোমরের অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে গুড়িয়ার

সামনে এসে বলল, 'ও চায় না ওর এখানে আসাতে তুই কোনো দুঃখ পাস, কষ্ট পাস। আমাদের ছেড়ে সে নিজে কষ্ট পেয়েছে তবু তোর ভালর জন্য এখানে একবারও আসেনি।'

গুড়িয়া এক মুহূর্ত নীরব থেকে আবার মশলা পিষতে শুরু করল। সঙ্গীতা লক্ষ্য করল, গুড়িয়ার মুখে ভাবনার রেশ। একাগ্র মনে কিছু ভাবছে। স্বাভাবিক ভাবেই ভাবছে। ভাল লক্ষণ।

উনোনে ফিরে যাওয়ার আগে শেষ মোক্ষম কথাটা বলল সঙ্গীতা।—'জানিস আজকে আসার ব্যাপারেও বেশ দ্বিধা ছিল অরবিন্দর। তারপর আমিই জোর করেছি। বলেছি, তুমি এস অরবিন্দ, গুড়িয়া আর কষ্ট পাবে না। আর দুঃখ পাবে না তোমাকে দেখে। তোমাকে সারা তামিয়া ভালবাসে। তুমি আমাদের সবার এত আপন জন আর গুড়িয়া তোমাকে ভুল বুঝবে, তা কি হয়?'

তারপরেও গুড়িয়া কিছু বলল না। হামাল দিস্তার পেষাই থামিয়ে শুধু চুপ করে শুনল কথাগুলো। তারপর আবার শুরু করল পেষাই। আপন মনে কি ভাবতে ভাবতে।

বাগানে বিকেল ছ'টার একটু পরে শুরু হল রাজেশ ও সঙ্গীতার পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠান। আমন্ত্রিতরা সবাই তখন উপস্থিত। বেশীর ভাগ অতিথি প্রতিবেশী। আশে-পাশের কোয়ার্টারের স্বামী-স্ত্রী। তাছাড়া ডক্টর ভাটনাগর ও মনীশ।

সবাই গোল করে ঘিরে রয়েছে বাগানের চারপাশ। মাঝখানে একটা টেবিল। টেবিলে থরে থরে সাজানো কিছু মালা ও কয়েক তোড়া ফুল।

ডক্টর ভাটনাগব, শর্মাজী, মনীশ ও রাজেশ পাশাপাশি চেয়ারে বসে। রাজেশের পরনে সিল্কের চোস্ত পাজামা ও কুর্তা। মাথায় শেরওয়ানী টুপি। তারপর দুটো চেয়ার রিক্ত। সঙ্গীতা ও গুড়িয়ার জন্য।

ডক্টর ভাটনাগর হঠাৎ বললেন, 'মিসেস সারীনকে গুড়িয়া সাজিয়ে নিয়ে আসছে। ততক্ষণ আমি মিঃ সেনকে অনুরোধ করব একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে।'

মনীশ বিব্রত চোখে তাকাল। এমনিতেই বেশ লাজুক সে। একটু মুখচোরা। কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের জন্য নয়। এর একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। একজনকে মানসিক দিক দিয়ে স্বাভাবিক করে তুলতে হবে।

এই গান গাওয়ার লক্ষ্য সেই। ডক্টর ভাটনাগর রাজেশ ও সঙ্গীতা মিলে কাল রাতে এই পরিকল্পনা করেছে। মনীশ ও গুড়িয়ার তৃতীয় সাক্ষাত হবে মনীশের গাওয়া একটা মধুর সঙ্গীতের মধ্যে। গুড়িয়ার ওপর ডক্টর ভাটনাগরের নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির এটা হল দ্বিতীয় ধাপ। প্রথম ধাপ শেষ হয়েছে গুড়িয়ার মনে মনীশ সম্বন্ধে নতুন এক ভাবনা সৃষ্টি করে।

মনীশ একটু বিরতির পর গাইতে শুরু করল—

"তোমার গোপন কথাটি, সখী, রেখো না মনে
শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে।"

সুন্দর গাইছে মনীশ। কাল রাতে একা একা বসে এই গানের বহু মহড়া করেছে সে। কিন্তু আজ ওর গীত মাধুর্য্য ছড়িয়ে পড়ছে কণ্ঠ থেকে নয়, একেবারে অন্তর থেকে। ওর চোখে এখন ভাসছে শুধু গুড়িয়া। যার হাসি, যার মাধুর্য্য, যার উচ্ছলতা অটুট রাখার জন্য ওর এই গান গাওয়া।

গানের প্রথম কলির পরেই গুড়িয়া স্বপ্ন চারিণীর মত আর্বিভূত হল ওর দৃষ্টিপটে। সঙ্গীতা যথা সময়ে গুড়িয়ার হাত ধরে কোয়ার্টারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সঙ্গীতার পরনে সবুজ বেনারসী শাড়ী। গায়ে সামান্য অলংকার। গুড়িয়া পরেছে ঘন বাসন্তী রঙের পাড় ঘেরা সাদা শাড়ী। মাথায় আঁটসাঁট দুটো দীর্ঘ বিনুনি। কপালে ছোট্টো টিপ। মুখে চিরাচরিত প্রসাধন, সেই পবিত্র এক সরলতা। দীঘল কালো চোখ দুটো বিস্ফারিত করে সে তাকিয়ে আছে মনীশের দিকে। অভিভূত হয়ে শুনছে মনীশের গান। শুনতে শুনতে ধীর পদক্ষেপে বাগানের সমাবেশে এসে উপস্থিত হল। দুজনে দাঁড়াল মনীশের চোখের সোজাসুজি। সমবেত অতিথিবৃন্দের এক পাশে।

ডক্টর ভাটনাগর চিকিৎসকের চোখে তাকিয়ে আছেন গুড়িয়ার দিকে। রাজেশ ও শর্মাজীরও উদগ্রীব দৃষ্টি। সঙ্গীতা পাশ থেকে আড়চোখে মাঝে মাঝে লক্ষ্য রাখছে। ওরা প্রত্যেকে গুড়িয়াকে নিরীক্ষণ করছে গুড়িয়ার অলক্ষ্যে।

শুধু মনীশ গানের মাঝে বেশ কয়েকবার চাইল গুড়িয়ার চোখে। গুড়িয়ার ঘন নিবদ্ধ দৃষ্টি মনীশের দিকে। একবারও সে চোখ সরালো না মনীশের চোখ থেকে।

ডক্টর ভাটনাগর নিশ্চিন্ত হলেন। রাজেশ ও শর্মাজীর বুক থেকে হাল্কা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। সঙ্গীতার রুদ্ধশ্বাস উদ্বিগ্ন মুখে ফুটে উঠল তৃপ্তির হাসি।

গান শেষ হল এক সময়। গুড়িয়ার আবিষ্ট ভাবটা হঠাৎ ভাঙ্গল চারপাশের করতালি ধ্বনি শুনে। তারপর সেও আলতো হাতে তালি দিয়ে উঠল। তখন সবার করতালি শেষ।

অপ্রস্তুত হয়ে হাততালি থামাল গুড়িয়া। সঙ্গীতা ওর হাত ধরে রিক্ত আসন দুটোর দিকে এগোলো। বসল ওরা। রাজেশের পাশে সঙ্গীতা। তারপর গুড়িয়া।

ডক্টর ভাটনাগর উঠে দাঁড়িয়ে রাজেশ ও সঙ্গীতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের সুখী সমৃদ্ধিশালী বিবাহিত জীবন আরো সুখের হোক, আরো সমৃদ্ধ হোক, দীর্ঘ হোক অন্তবিহীন!'

সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। সমবেত কণ্ঠে একই সম্ভাষণ পুনরাবৃত্তি করল তারা। সামনে থেকে কেউ ফুল ছড়িয়ে দিল রাজেশ ও সঙ্গীতার ওপর।

রাজেশ ও সঙ্গীতা উঠে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে হাত জোড় করে ওদের সম্ভাষণের উত্তরে মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ জানাল।

তারপর সঙ্গীতা সবার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'এই উপলক্ষ্যে এবার আমি গুড়িয়া রাণীর একটা ইচ্ছা পূরণ করতে চাই। আপনারা কি তার অনুমতি দেবেন?'

—'কী ইচ্ছা ?' দু-তিনজন জিজ্ঞেস করল এক সাথে।

গুড়িয়া লজ্জা মিশ্রিত মৃদু হাসির আভাস নিয়ে মুখ নামাল নীচে।

সঙ্গীতা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'গুড়িয়া রাণীর ইচ্ছে, ঠিক যে ভাবে বিয়েতে আমরা মালা বদল করেছিলাম সে ভাবে এখানে সবার সামনে করতে হবে।'

চারপাশ থেকে সবাই হৈ হৈ করে বলে উঠল, 'বাঃ সুন্দর প্রস্তাব। আমরাও চাই। হয়ে যাক! হয়ে যাক!'

দুজন টেবিল থেকে দুটো সেরা মালা নিয়ে ছুটে এল ওদের কাছে। একটা মালা রাজেশের হাতে দেওয়া হল। আরেকটা সঙ্গীতার হাতে।

একজন ক্যামেরা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

গুড়িয়া ওর চোখেমুখে শিশুসুলভ খুশীর বান নিয়ে তাকিয়ে। মনীশ মাঝে মাঝেই আলতো চোখে লক্ষ্য করছে ওর বিভিন্ন ভাব-ভঙ্গী। যত লক্ষ্য করছে ততই ওর শিরায় শিরায় ভাল লাগার এক অপূর্ব অনুভূতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

রাজেশ ও সঙ্গীতা মালা বদল করার জন্য যেই পরস্পরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'মিঃ সারীন দেখবেন, ভুলে মালাটা আর কারো গলায় পরিয়ে দেবেন না।'

হো হো করে হেসে উঠল সবাই। গুড়িয়ার হাসি সবচেয়ে উচ্ছসিত। ডক্টর ভাটনাগরের কথা শুনে মুখে হাত চাপা দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ দুলিয়ে হাসছে সে।

মনীশের মুগ্ধ দৃষ্টি।

শেষ পর্যন্ত মালা বদল হল দু'জনের। ক্যামেরার ফ্ল্যাশও জ্বলে উঠল। এক সঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল সবাই।

ফ্ল্যাশের আলোয় গুড়িয়ার উচ্ছসিত মুখের এক বিশেষ ভঙ্গী আঁকা হয়ে গেল মনীশের চোখে।

সঙ্গীতা এবার গুড়িয়াকে নিয়ে কোয়ার্টারের ভেতর ছুটল অতিথিদের শীতল পানীয় পরিবেশন করতে।

খানিক পরেই দুটো গোল ট্রেতে করে শরবতের গ্লাস নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। সমাবেশে প্রবেশ করে এগিয়ে গেল দু'দিকে। সঙ্গীতা ইচ্ছে করে বাঁ দিক নিল। ডান দিকে মনীশ বসে। গুড়িয়া ট্রে হাতে ডান দিকে পা বাড়াল।

সমবেত অতিথিদের মধ্যে তখন চলছে মৃদু গুঞ্জন হাসি-ঠাট্টা। সঙ্গীতা ও গুড়িয়া প্রতিজনের কাছে গিয়ে পানীয়ের গ্লাস পরিবেশন করছে। গুড়িয়া রাজেশকে দিল, ডক্টর ভাটনাগরকে দিল, শর্মাজীর কাছে এসে বলল, 'পাপাজী আমি তোমাকে পরে এসে খাইয়ে যাচ্ছি।'

শর্মাজী ঘাড় হেলিয়ে মৃদু হাসলেন। গুড়িয়া মনীশের দিকে এগোলো।

মনীশ তুলে নিল একটা গ্লাস। তুলতে গিয়ে গুড়িয়ার চোখে চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কি যে হল, গুড়িয়ার হাত থেকে পড়ে গেল ট্রেটা। কাঁচের গ্লাস ক'টা ঝন ঝন করে ভেঙে ছত্রখান। মনীশ অপ্রস্তুত। গুড়িয়া নত মুখে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বসে পড়ল মাটিতে, কাঁচের টুকরোগুলো তুলতে। সঙ্গে সঙ্গে মনীশ নীচু হয়ে বাধা দিতে

গেল। মনীশের দিকে তাকিয়ে আবার কেমন যেন হয়ে গেল গুড়িয়ার মুখ। অস্বাভাবিক বিবর্ণ। অন্যমনস্কতায় কাঁচের একটা টুকরো বিঁধে গেল ডান হাতের অনামিকায়। রক্ত ঝরছে গুড়িয়ার আঙুল থেকে।

মনীশ তড়িৎগতিতে হাঁটুগেড়ে বসে রক্ত-ঝরা আঙুলটা চেপে ধরল ওর হাতে। ভীত-সন্ত্রস্ত গুড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। ত্রস্ত পায়ে ছুটে গেল রাজেশদের কোয়ার্টারের দিকে।

'গুড়িয়া!' সঙ্গীতা ডাকল পেছন থেকে।

গুড়িয়া দাঁড়াল না। দ্রুত বেগে ঢুকে পড়ল কোয়ার্টারের ভেতর। সঙ্গীতা পা বাড়াল কোয়ার্টারের দিকে। কাঁচ ভাঙ্গার শব্দে সবাই থমকে তাকিয়ে ছিল গুড়িয়া ও মনীশের দিকে। গুড়িয়ার ভীত বিহঙ্গীর মত ছুটে যাওয়ায় প্রত্যেকেই তখন বিস্মিত হতবাক। শুধু রাজেশ ও শর্মাজী বাদে। ওদের চেহারায় বিস্ময়ের পরিবর্তে ছিল শঙ্কা ও হতাশা। একমাত্র ডক্টর ভাটনাগর সামান্য শঙ্কিত হলেও হতাশ হন নি। সম্পূর্ণ ঘটনা তার নজরের মধ্যে ঘটেছে। তিনি এখনো আশান্বিত। ঘটনার আকস্মিকতা মুহূর্তের জন্য তাকে স্তব্ধ করলেও আশার রেশ তার চোখ থেকে একেবারে মুছে যায়নি।

ওদিকে মনীশ বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে। স্তব্ধ চোখে সে তাকিয়ে আছে ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোয় ছড়িয়ে পড়া ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দিকে। সে বিস্মিত নয়, শঙ্কিতও নয়। আশা-নিরাশার কোনো ভাব ছিল না ওর মুখে। মনীশের সারা মুখ তখন আপ্লুত বেদনাময় এক আকুলতায়। যন্ত্রণায় কাতর ওর চোখ। গুড়িয়ার আঙুল থেকে সদ্য ঝরা রক্ত সেই অসহ্য যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিচ্ছিল ওর বুকে।

সঙ্গীতা কোয়ার্টারের ভেতর ঢুকে দেখল, বাইরের ঘরে গুড়িয়া নেই। সঙ্গীতা পাশের ঘরে গেল। সেখানেও গুড়িয়া নেই।

'গুড়িয়া!' সঙ্গীতা উৎকণ্ঠায় দ্রুত পায়ে ওদের বেডরুমে এল। গুড়িয়া সেখানেও অনুপস্থিত।

'গুড়িয়া!' সঙ্গীতার চিন্তিত স্বর।

খুঁজতে খুঁজতে কোয়ার্টারের পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে ছুটে এল সঙ্গীতা। বেড়া পেরিয়ে গুড়িয়াদের কোয়ার্টারের পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

গুড়িয়া ওর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বালিশে মুখ গুঁজে।

'গুড়িয়া।' সঙ্গীতা ওর পিঠে হাত রাখল। গুড়িয়া উঠল না, কেঁদে চলেছে।

'গুড়িয়া!' সঙ্গীতা ওর কাঁধে ঝাঁকুনি দিল, 'কি হয়েছে গুড়িয়া? এত কাঁদছিস কেন?'

গুড়িয়া উঠে সঙ্গীতার বুকে মুখ গুঁজল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ভাবী, আমায় ক্ষমা করে দাও। তোমাদের কি সুন্দর আনন্দের অনুষ্ঠান মাটি করে দিলাম।'

'কিছু মাটি করোনি গুড়িয়া।' ডক্টর ভাটনাগর পেছন থেকে বললেন। তিনি কখন যে ঘরে ঢুকেছেন সঙ্গীতাও টের পায়নি। গুড়িয়ার কাছে এসে মধুর স্বরে বললেন, 'গ্লাসগুলো তোমার হাত ফসকে হঠাৎ পড়ে গেছে। তাতে কি হয়েছে? তোমার সঙ্গীতাভাবীর হাত থেকেও পড়তে পারত। তুমি এভাবে চলে এলে কেন?'

ডক্টর ভাটনাগরকে দেখে গুড়িয়া নিজেকে সংযত করল। সঙ্গীতাকে ছেড়ে তাকিয়ে রইল নীচের দিকে।

টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল মেজের ওপর।

ডক্টর ভাটনাগর হাতে একটা ব্যাণ্ড-এইড নিয়ে এসেছিলেন। গুড়িয়ার আহত হাতখানা ধরে নিজের হাতে তুলে রক্তঝরা আঙুলে ব্যাণ্ড-এইডটা লাগিয়ে দিলেন।

'কিচ্ছু হয় নি।' ডক্টর ভাটনাগর গুড়িয়ার হাতটা নামিয়ে দরদ ভরা স্বরে বললেন, 'তুমি লজ্জায় চলে এসেছ, আমি জানি। চলো আবার যাবে তো?'

'না!' গুড়িয়ার নত মুখ আরো নত হল।

'কেন?'

গুড়িয়া কিছু বলল না। অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে সঙ্গীতার দিকে তাকাল। মনে হল কি যেন বলতে চায় কিন্তু বলতে পারছে না।

সঙ্গীতা ওর শাড়ীর আঁচল দিয়ে গুড়িয়ার অশ্রু মুছিয়ে আদরের স্বরে বলল, 'গুড়িয়া, তুই না গেলে বেচারী অরবিন্দ কি ভাববে বল্ তো। নিজেকে আবার অপরাধী মনে করবে। অথচ ওর তো কোনো দোষ নেই।'

'ওর কেন দোষ হবে ভাবী!' বলতে বলতে গুড়িয়ার ঠোঁট কেঁপে উঠল, 'আমারই কি যেন হয় তখন, আমি বুঝতে পারি না।'

'কখন, কোন্ সময় হয় গুড়িয়া?' ডক্টর ভাটনাগর ঝুঁকে গাঢ় স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি জানিনা—আমি জানিনা ডক্টর আঙ্কল।' গুড়িয়া ডক্টর ভাটনাগরের মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মুখ আবার নামিয়ে নিল। ওকে বেশ বিহ্বল, অপ্রতিভ মনে হচ্ছে এখন।

'বেশ! আর হবে না। তুমি দেখো!' ডক্টর ভাটনাগর গুড়িয়ার পিঠে গাঢ় হাত রেখে বললেন, 'চলো তোমাকে আর কিছু পরিবেশন করতে হবে না। শুধু বসে থেকো আমার কাছে। যাবে গুড়িয়া?'

'না।' গুড়িয়ার দৃঢ় কণ্ঠ। নত মুখেই বলল, 'যদি আবার হয়। আমি আর যাব না ডক্টর আঙ্কল।'

ডক্টর ভাটনাগর সঙ্গীতার চোখের দিকে তাকালেন। ইশারায় বললেন, গুড়িয়াকে এখন আর চাপ দেওয়া উচিত হবে না।

'ঠিক আছে—তুই একটু বস। সঙ্গীতা ওকে জড়িয়ে বলল, 'আমি ওদের খাবার দিয়ে আসছি।'

'না। তোমাকে এখন আসতে হবে না।' গুড়িয়ার গম্ভীর কণ্ঠ, 'অনুষ্ঠান পুরোপুরি শেষ হলে এস।'

'আচ্ছা!' সঙ্গীতা ঘাড় হেলিযে ডক্টর ভাটনাগরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

গুড়িয়া বসল বিছানায়। ওর চোখ বেয়ে আবার টপটপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। গুড়িয়াকে এ মুহূর্তে বড় অসহায় লাগছে। বড় বিষন্ন।

কলকাতা। সময় দুপুর।

মনীশদের বাড়ির ভাঙ্গা ছাদ সারানো হয়েছে।

কাকাবাবু ও গায়ত্রী দাঁড়িযে দেখছেন সারানো অংশটা।

'যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।' কাকাবাবু সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম, ছাদটা কোনোদিন ভেঙ্গে না পড়ে।'

'গত রোববার প্রবীর দাঁড়িয়ে থেকে সারিয়েছে।' গায়ত্রী বলল, 'যেমন মনীশ তেমন ওর বন্ধু। মনীশের অভাব ওই অনেকটা দূর করে দিয়েছে দাদা।'

'তা তো দেখছি।' কাকাবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, 'তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়মিত নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে লীলাকে পড়ানো অব্দি এখন সবই করছে সে। গত শনিবার তোমার ওই ঘরে ঢুকে যখন দেখলাম লীলাকে মাদুরে বসে পড়াচ্ছে, আমি ভাবলাম মনীশ বুঝি এসেছে।—আচ্ছা, কবে আসবে মনীশ?'

'আর মাস তিনেক পর।' গায়ত্রী উত্তর দিল, 'ছ'মাসের আগে ছুটি পাবে না।'

'আরো তিন মাস!'

'হ্যাঁ। কি করা যাবে!' গায়ত্রী বলল, 'যদিও ছেলেটাকে দেখার জন্য মন আমার আনচান করে ওঠে। কিন্তু হাজার হোক নতুন চাকরী। চাকরীর দাবি আগে। এই চাকরীর জন্য কি না করেছে মনীশ। কত কিছু আটকেও ছিল বলুন। এখন সব আবার কি সুন্দর ভাবে শুরু হয়েছে।'

'তা আর বলতে!' কাকাবাবু খাটে বসে বললেন, 'মনীশের এই চাকরীর জন্য তোমাকেও আজ কত সুস্থ মনে হচ্ছে। কথায় বলে না, মন ভাল তো সব ভাল।'

'সে তো নিশ্চয়ই।' গায়ত্রীর ঠোঁটে সুখের হাসি। উচ্ছাসের স্বরে বলল, 'মনীশ এতদিন পর একটা ভাল চাকরী পেল, পৃথিবীতে আমার চেয়ে বেশী আজ কেউ খুশী নয় দাদা। এখন আমি সুখে মরতেও পারব।'

'ছিঃ! ওসব অলক্ষুণে কথা বলো না।' কাকাবাবু ধমকের সুরে বললেন, 'এই তো সবে তোমার সংসারে সুখের দিন ফিরে এসেছে, এখন তুমি বহুদিন বাঁচবে দিদি।'

'আমারও এখন বাঁচতে ইচ্ছে হয় দাদা।' গায়ত্রী সজল চোখে বলল, 'জন্ম থেকে দুটি ভাই বোনের শুধু ম্লান-দুঃখী মুখ দেখে আসছি। এখন ওদের মুখে হাসি ফুটছে আমারও তাই বাঁচতে ইচ্ছে করে ভীষণ।'

গায়ত্রী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখের জল মুছল।

কাকাবাবু প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য জিজ্ঞেস করলেন, 'লীলার কি আজ একটা পরীক্ষা?'

'হ্যাঁ।' গায়ত্রী আবার স্বাভাবিক হয়ে বলল, 'বাঁচা গেল। যে ভাবে দিন রাত বইয়ের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল মেয়েটা।'

'ফিরবে কখন?'

'আজকে ওর শেষ পরীক্ষা।' গায়ত্রী মৃদু হেসে বলল, 'বলে গেছে, মা একটু দেরি করে ফিরলে চিন্তা করো না। প্রবীর ওকে রোজ আনতে যায়। হৈ চৈ আনন্দ কিছুই তো করে না মেয়েটা। করে না মানে করতে পারে না। একটু যদি ওরা আমোদ করে, আহ্লাদ করে, আমার বুক ঠাণ্ডা হয়, ভীষণ ভাল লাগে।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই!' কাকাবাবু মাথা আবার দোলালেন, 'এই তো বয়স ওদের আমোদ আহ্লাদ করার। আর করবে কবে?'

টাকী স্কুলের বাইরে তখন পরীক্ষা-ভাঙ্গা মেয়েদের সঙ্গে অভিভাবকদের ভীড়। তারই মধ্যে এক কোণে লীলা ও প্রবীর দাঁড়িয়ে।

প্রবীরের হাতে প্রশ্নপত্র। লীলা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলছে, 'প্রবীরদা, ছ'টার মধ্যে তোমার সাজেশনের তিনটে কোশ্চেনই মিলে গেছে।'

'কোন্ কোন্‌টা দেখি?' প্রবীর তাকাল প্রশ্ন পত্রের দিকে।

'এই তিনটে—' লীলা ঝুঁকে প্রশ্নগুলো দেখিয়ে দিল।

প্রশ্নগুলো পড়ে লীলার করা বাকী তিনটে প্রশ্নও দেখল প্রবীর। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কেমন করলি?'

'মনে তো হয় ভাল।' লীলার মুখে খুশীর হাসি।

'সেভেন্টি পার্সেন্ট মার্কস থাকবে?'

'দেখি—' লীলার চোখে আশার ঝিলিক।

'গুড!' প্রবীর প্রশ্নগুলো নিয়ে আরো কিছু আলোচনা করে প্রশ্নপত্রটা ভাঁজ করে লীলার হাতে দিয়ে বলল, 'তাহলে এখন? বাড়ি যাবি না অন্য কোথাও?'

লীলা ডান পায়ের চটি দিয়ে মাটি ঘষতে ঘষতে বলল, 'তুমি যে বললে, কোথায় নিয়ে যাবে?'

'তুই বল্ কোথায় যাবি?'

'তুমি যেখানে বলবে। আমি জানি না।'

'চল্। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কিছুক্ষণ বসে তারপর তোকে বাড়ি দিয়ে আসব।'

ওরা পা বাড়াল বড় রাস্তার দিকে।

বাসে উঠল দু'জন। লীলা বসল লেডীজ সীটে। প্রবীর তার সামনের সারিতে। এখন দুপুর বেলা। যাত্রীদের বেশী ভীড় নেই। বাস ছুটে চলেছে মন্থর গতিতে।

লীলা ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। প্রবীর একটু এদিক-ওদিক নড়ে-চড়ে তাকাল লীলার মুখের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টি আর ফেরাতে পারল না। মনীশের সঙ্গে ক্লাস টেনে পড়ার সময় থেকে লীলাদের বাড়িতে ওর আসা যাওয়া। লীলার আন্তরিক সহজ সরল মনের সঙ্গে তখন থেকে ওর পরিচয়। কিন্তু মনীশ দূরে চলে যাওয়ার পর লীলার অনেক কাছাকাছি এসেছে প্রবীর। ওর দৃষ্টিতে লীলার এখন অন্য রূপ। ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় বোধহয় পা পড়েছে লীলার। ওর সদ্য প্রস্ফুটিত যৌবনের সৌন্দর্য, ওর কথাবার্তা ব্যবহারের মতই স্নিগ্ধ। এই দুইয়ের সমন্বয়ে লীলা প্রবীরের চোখে অতুলনীয়া।

বাসের জানলায় লীলার ঘোরানো মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল প্রবীর। ওর চোখে এ মুহূর্তে ভেসে উঠলো লীলার অন্য কিছু অভিব্যক্তি। লীলাকে পড়ানোর মুহূর্তে যে ভাব ভঙ্গীগুলো ভাল লেগেছে প্রবীরের। কালো গভীর চোখে নিবিড় একাগ্রতা নিয়ে লীলা পড়া শুনছে প্রবীরের। কখনো হাঁটুতে চিবুক ঠেকিয়ে স্থির অভিনিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে আছে প্রবীরের দিকে। লীলার গভীর মনোনিবেশের এমন কত টুকরো টুকরো ছবি প্রবীরের মানসপটে আঁকা হয়ে আছে। পড়ার মাঝে নিবিড় একাগ্রতা মনোরম গাম্ভীর্য লীলার মুখে অপূর্ব এক লাবণ্য এনে দেয়। লীলাকে পড়াতে পড়াতে সেই লাবণ্য দিনের পর দিন আস্বাদন করে প্রবীর শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করল লীলাকে সে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু এই ভালবাসার কথা লীলাকে সে বলতে পারে না। কি করে যে বলবে বুঝতে পারে না। তাই শেষ পরীক্ষার আগের দিন পড়া শেষে সে লীলাকে বলেছিল, 'লীলা কাল তো পরীক্ষা শেষ। তারপর কোথাও ঘুরতে যাবি ?'

'কোথায় প্রবীরদা ?' লীলা সরল মনে সহজ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'যে কোনো জায়গায়। ঘন্টা খানেকের জন্য।' প্রবীর বলল, 'পড়াশোনায় এত পরিশ্রম করলি, এখন তোর একটু রিল্যাক্সেশনের দরকার।'

'ঠিক বলেছ।' লীলা মাথা নেড়ে বলল, 'তোমারও দরকার। আমার সঙ্গে তুমিও কি কম পরিশ্রম করলে, তাহলে মা'কে বলি ?'

'তোকে বলতে হবে না। তুই পড়, আমি বলে যাচ্ছি মাসীমাকে।'

গত কাল লীলাদের বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় মাসীমাকে বলেছিল প্রবীর। মাসীমা শুনে খুশী হয়েছেন। বলেছিলেন, 'হ্যাঁ বাবা লীলা তো আমার জন্য এমনিতেই ঘরে আটকে থাকে। তোমরা বরং বেড়িয়ে এলে আমারও ভাল লাগবে।'

বাস থেকে নেমে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রাচীরের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লীলা বলল, 'আজ দাদা থাকলে আমার পরীক্ষার সব কথা শুনে কি যে খুশী হত !'

'মনীশকে পরশু আমি চিঠি দিয়েছি, তোর পরীক্ষার সব ডিটেলস্ দিয়ে। শুধু আজকের রিপোর্টটা বাকী।'

'আজ আমি দাদাকে একটা বড় চিঠি দেবো। তুমি কবে দেবে প্রবীরদা ?'

'কাং। আজ লিখে রাখিস।' প্রবীর উত্তর দিল। তারপর একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'লীলা তুই এবার কি পড়বি? আর্টস, সাইন্স না কমার্স?'

'কমার্স।' লীলা ওর চুলের বিনুনিতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'কেন জানো?'

'কেন?' প্রবীর তাকাল।

'দাদা আর তুমি দুজনেই কমার্স পড়েছো। তোমাদের কাছ থেকে সাহায্য পাব।' লীলা বিনুনিটা ঘাড়ের পেছনে ছুঁড়ে বলল, 'আর্টস পড়ে কোনো লাভ নেই। আর ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়লে সাইন্স নিয়ে কি হবে? আমি তো অতদূর পড়তে পারব না।'

'কমার্স পড়ে তোর চাকরী করার ইচ্ছে?'

'হ্যাঁ প্রবীরদা।' লীলা বলেই গম্ভীর হল। ম্লান স্বরে বলল, 'কিন্তু চাকরী পেলে তো? দাদা কত কষ্ট করে এতদিন পর যোগাড় করতে পারল একটা। আর তুমি কত চেষ্টা করেও পাচ্ছ না।'

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের কাছে তখন এসে গেছে ওরা। লীলা ভেতরে প্রবেশ করল। লীলার শেষ কথায় প্রবীরের হাঁটার গতি হঠাৎ একটু কমে এসেছিল। লীলাকে অনুসরণ করল সে। তারপর ওরা ধীর পদক্ষেপে ডান দিকের লেকের ধারে এসে দাঁড়াল।

লীলা লেকের জলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রবীরদা তোমার জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হয়। দাদার সঙ্গে তুমিও যদি একটা চাকরী পেতে!'

লীলার মুখের দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকাল প্রবীর। প্রবীরের জন্য ওর কষ্টটা সত্যি যে কত গভীর ও আন্তরিক সেটা লীলার আলোড়িত চেহারায় স্পষ্ট।

প্রবীর ভারী পরিবেশটা পাল্টানোর জন্য বলল, 'আর চাকরী না খুঁজে আমি একটা ব্যবসা করব। দাদা ও বাবা কিছু কিছু টাকা দেবে বলেছে।'

'কিসের ব্যবসা প্রবীরদা?' লীলা তাকাল।

'স্টুডেন্ট হেল্পিং বক্স।' প্রবীর মৃদু হেসে বলল, 'বুদ্ধিটা আমার। এই ধর্ স্টুডেন্টদের যা যা প্রয়োজনীয় সব একটা বাক্সে একত্র করে সস্তায় ছাত্রদের বিক্রী করব। তার মধ্যে থাকবে ডট পেন, কালীর পেন। সফট্ পেনসিল, হার্ড পেনসিল। ইরেজার পেনের কালীর ছোট্টো শিশি। এরকম যা যা ছাত্রদের স্কুলে ও পরীক্ষায় প্রয়োজন হয়। অনেকটা ইন্স্ট্রুম্যান্ট বক্সের মত।'

'বাঃ ভাল বার করেছ তো। শুরু করে দাও প্রবীরদা।' লীলার স্বরে ভরপুর উৎসাহ।

'হ্যাঁ ভাবছি। তবে পরিশ্রম আছে। সব পাইকারী বাজার থেকে কিনে আনতে হবে। তারপর ছাপানো কার্টনে ঢুকিয়ে স্কুলে স্কুলে গিয়ে বিক্রী করা।'

'তুমি সব যোগাড় করো। আমি সুন্দর করে গুছিয়ে দেবো।'

প্রবীর লীলার খুশী ভরা মুখের দিকে তাকাল।

'লীলা!' প্রবীর ওর আরো কাছে এগিয়ে গাঢ় স্বরে বলল, 'ধর্ এই ব্যবসা ধীরে

ধীরে আরো বড় হল। তুই তার মধ্যে বি কম পাস করলি তারপরেও আমাকে সাহায্য করবি ?'

কেন করব না ? নিশ্চয়ই করব।'

'এতটা জোর দিয়ে বলিস না। কত বছর পরের কথা। তখনো কি আমাদের সম্পর্ক এরকম থাকবে ?'

'হ্যাঁ থাকবে।' লীলা লেকের জলের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

আবার তাকাল প্রবীর। লীলার মুখ এখন আরক্ত। লজ্জা মিশ্রিত চাহনি ওর ঠোঁটের প্রচ্ছন্ন হাসির ইঙ্গিত প্রবীরের বুকে আনন্দের ঢেউ বইয়ে দিল।

তোকে আমি ভালবাসি।' এ কথাটা আর বলতে হল না প্রবীরকে। লীলার হাসি, লীলার লজ্জায় তার প্রতিধ্বনি ছিল। লীলাই আগ বাড়িয়ে কথাটা যেন বলে দিল প্রবীরকে।

তামিস্রা। দুপুর একটা বাজতে পাঁচ।

গুড়িয়া টিফিন ক্যারিয়ার হাতে সেই আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে নীচে নামছে। আজ ওর নামার ছন্দে উচ্ছলতা নেই। এক্কা-দোক্কা খেলাও নেই। নামছে ধীর বহমান নদীর মত। নিস্তরঙ্গ, নিষ্প্রাণ ওর গতি।

মনীশ চেয়ার থেকে উঠে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। গুড়িয়া অনেক কাছে আসতে দেখল, ওর উদাস দৃষ্টি। সারা মুখে ভাবনার রেশ। গম্ভীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে, চারপাশে নিবিড় চিন্তার একটা বলয় নিয়ে।

জানলা থেকে হারিয়ে গেল গুড়িয়া। মনীশ আবার চেয়ারে এসে বসল। ওর চোখেও চিন্তার ছায়া। গুড়িয়াকে এরূপে কখনো সে দেখেনি। প্রথম দিন মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ দেখেছিল একবার। তারপর সেই বেহুঁশ হওয়ার আগে। তাছাড়া প্রতিক্ষণ প্রতি মুহূর্তে গুড়িয়াকে সে দেখেছে চঞ্চল, পাহাড়ী ঝরনার মত উচ্ছল। এমন কি বেহুঁশ হওয়ার পরেও যেদিন দেখা, সেদিনও সেই উচ্ছাস সেই উচ্ছলতা ছিল গুড়িয়ার মধ্যে। তাহলে আজ এই মলিন রূপ কেন ? কেন এই পরিবর্তন ?

গ্লাস ভাঙা কাঁচের ভগ্ন স্তুপে রক্তের ফোঁটাগুলো ভেসে উঠল মনীশের চোখে। গত রাতে ওই বিন্দু বিন্দু রক্ত ঘুম কেড়ে নিয়েছে মনীশের। কিভাবে যে ঘটল এই বিপর্যয়, কেন ঘটল কিছুতেই সে বুঝতে পারছে না। শরবতের গ্লাস ট্রে থেকে তোলার পর একবার গুড়িয়ার গভীর চোখে চোখ পড়েছিল। এমন দৃষ্টি বিনিময় গান গাওয়ার মাঝে বহুবার হয়েছে। কিন্তু তীব্র ভয়ের ছায়াটা এবারই সে দেখেছিল গুড়িয়ার চোখে। দুজনে এত কাছাকাছি হওয়াই কি তার কারণ ? মনীশের নিবিড় দৃষ্টিতে ভয় পেয়ে গিয়েছিল গুড়িয়া ? সেই ভয়ে হাত কেঁপে পড়ে গেল ট্রেটা ? কিন্তু কিসের ভয় ? কেন এমন হয় গুড়িয়ার ?

তামিস্রায় প্রথম দিন আর মৌলী লেকের পাশে সামনাসামনি দেখা হওয়ার মুহূর্তে

একই আতঙ্ক সে দেখেছে গুড়িয়ার চোখে। মনীশের সান্নিধ্যে এই ঘটনা তিনবার ঘটল। তৃতীয়বার রক্ত ঝরা দিন।

ভাবতে ভাবতে হতাশার বেদনায় মনীশের বুক গুমরে উঠল। গুড়িয়া বোধ হয় আর ভাল হবে না। এই কষ্ট, এই গুপ্ত যন্ত্রণা ওকে হয়ত সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে।

কিন্তু দুপুর তিনটের সময় ডক্টর ভাটনাগর ওর চেম্বারে বসে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'গুড়িয়া ভাল হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে এ ব্যাপারে এখন আমি সুনিশ্চিত। তার লক্ষণীয় দুটো পূর্বাভাস হল, গত কাল সে আপনার গান খুব আকর্ষণ নিয়ে শুনেছে। দু নম্বর, ওর মনে আপনার প্রতি তীব্র একটা সমবেদনা গড়ে উঠেছে।'

রাজেশ পাশে বসেছিল। বলল, 'হ্যাঁ সঙ্গীতা বলছিল, গতকালের ঘটনার জন্য গুড়িয়া খুব অনুতপ্ত।'

মনীশ কিছু বলল না। মনে মনে শুধু ভাবল, তাহলে কি তারই প্রভাব আজ সে দেখল গুড়িয়ার চোখে মুখে ?

ডক্টর ভাটনাগর আরো বললেন 'মিঃ সেন, আপনি বোধহয় জানেন না—গতকাল অনুষ্ঠানে আবার ফিরে আসার অদম্য ইচ্ছে ছিল গুড়িয়ার। কিন্তু এ ব্যাপারে বেচারী অসহায়। পাছে আবার কিছু ঘটে যায়, তাই ও আসেনি।'

'ঘটে যায় !' মনীশ বিস্মিত স্বরে বলল, 'কেন, ও কি বুঝতে পারে না ঘটনাটা যে ঘটবে বা ঘটতে পারে।'

'না পারে না।' ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'সব কিছু ঘটে হঠাৎ। ওর চেতনার বাইরে। আমাদের ধারণা, সেই মুহূর্তে কোনো এক ভয়ংকর স্মৃতি ওর মনকে কাবু করে আবার হারিয়ে যায়।'

বিস্ময়ে মনীশের মুখ নিথর হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'ভয়ংকর স্মৃতি বলতে আপনাদের ধারণা, কোনো ভীতিজনক ঘটনা ঘটেছিল ওর জীবনে ?'

'অফ কোর্স ! এ ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। তার কিছু তথ্যও আমরা পেয়েছি।'

'কি রকম ?'

'প্রথম কথা, ঘটনাটা ঘটেছে শিমলায়। বছর দুয়েক আগে।'

'শিমলায় ! ওরা কি আগে শিমলায় থাকত ?'

'হ্যাঁ। গুড়িয়া ম্যাট্রিক ওখানেই পাশ করেছে। তারপর শর্মাজী পোস্টমাস্টারের প্রমোশন পেয়ে এখানে চলে আসেন।' ডক্টর ভাটনাগর থেমে বললেন, 'গুড়িয়া ভাল আঁকতে পারে, আপনি জানেন ?'

'না !' মাথা নাড়ল মনীশ।

রাজেশ বলল, 'খুব সুন্দর আঁকে। আমার কোয়ার্টারে ড্রয়িং রুমে পাহাড়ের যে ছবিটা আছে ওটা গুড়িয়ার আঁকা।'

এবার সত্যি বিস্মিত হল মনীশ। প্রথম দিনই সে ছবিটা লক্ষ্য করেছে। ভেবেছিল কেনা। তাহলে তো দক্ষ শিল্পী বলতে হয় গুড়িয়াকে।

ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'গুড়িয়ার এটা জন্মগত পাওয়া গুণ। তবে শিমলায় থাকতে একটা আর্ট স্কুলে সে কিছুদিন তালিম নিয়েছে। আমাদের ইনভেস্টিগেশন অনুযায়ী ঘটনাটা ঘটেছে এই স্কুলে একদিন যাওয়ার পথে—'

মনীশের দৃষ্টি গাঢ় হল।

ডক্টর ভাটনাগর তখন বলছেন, 'শর্মাজীরা শিমলায় শহরতলীতে থাকতেন। সেখান থেকে এই আর্ট স্কুলে যাওয়ার পথটা ছিল একটু বিদঘুটে, নির্জন। গুড়িয়া প্রতি রোববার সেখানে আঁকা শিখতে যেত। শর্মাজীর বক্তব্য অনুযায়ী, এক বর্ষার দিন গুড়িয়া সেই স্কুল থেকে বেশ দেরি করে বাড়ি ফেরে। সেদিন গুড়িয়ার অবস্থা ছিল খুব বিপর্যস্ত। হাতে পায়ে আঁচড়ের দাগ ছিল বিস্তর; তার সাথে ওর মাথায় কপালের কাছে ছিল মস্ত বড় আঘাতের একটা চিহ্ন। বস্তু ঝ'ব তখন শুকিয়ে গেছে সেই ক্ষতস্থান। শর্মাজী জিজ্ঞেস করাতে, গুড়িয়া বলেছিল রাস্তায় সে পড়ে গেছে। কিন্তু কি ভাবে পড়ল, কোথায় পড়ল তার উত্তর শত প্রশ্নেও সে দিতে পারেনি। শর্মাজী এ নিয়ে আর উচ্চ বাচ্য করেননি। ব্যাপারটায় গুরুত্বও দেননি। শুধু লক্ষ্য করেছিলেন, সেদিন গুড়িয়ার হাতে আঁকা শেখার কাগজপত্র সমেত ঝোলাটা ছিল না। তার পরের রোববার থেকে সে আর্ট স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়।'

'কারণ ?' মনীশ নিবিষ্ট মনে সব শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করল।

'কারণ গুড়িয়াও কিছু বলেনি। শর্মাজীও কিছু জিজ্ঞেস করেননি। আসলে মা না থাকলে যা হয়। গুড়িয়ার ওই বয়স। ওই বয়সে মেয়েদের শারিরীক মানসিক কত পরিবর্তন আসে। কত কথা ওরা তখন বলতে চায়, কিন্তু পারেনা বলতে। মা মাসী থাকলে তারা যা অনুধাবন করতে পারত, শর্মাজী সেটা পারেন নি। তা নাহলে তিনি যদি তখনই কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিতেন, কেস হয়ত এতটা দুরূহ হত না। কমিউনিকেশন গ্যাপ আর গুড়িয়ার নিঃসঙ্গতা সব কিছু জটিল করে দেয়।

–যাই হোক,' ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'গুড়িয়ার জীবনে সেদিন যে একটা মারাত্মক এবং ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের ধারণা, ওই ঘটনাটা ঘটার সময় বা পরে মাথায় সে আঘাতটা পেয়েছে। সেই আঘাতের দরুণ স্মৃতির ভয়ংকর কয়েকটা মুহূর্ত হারিয়ে ফেলেছে গুড়িয়া।'

'আর্ট স্কুলে আপনারা খোঁজ খবর নিয়েছিলেন ?' মনীশ জিজ্ঞেস করল।

'ডক্টর মোহন ইনভেস্টিগেশনে কোনো ত্রুটি রাখেন নি।' ডক্টর ভাটনাগরের উত্তর, 'ওই আর্ট স্কুলটি একজন মহিলা চালাতেন। ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের আঁকা শেখাতে। এবং সেখানে গুড়িয়া ছিল একমাত্র বড় ছাত্রী। রহস্যটা কোথায় জানেন ?'

আবার গভীর চোখে তাকাল মনীশ।

ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'সেই রোববার গুড়িয়া আর্ট স্কুলে যায় নি। আই মিন, ঘটনার দিন।'

'তাহলে ?' মনীশ বিস্মিত হতবাক, 'কোথায় গিয়েছিল ?'

'গুড়িয়া জানে না, আমরা জানিনা, কেউ জানে না।' ডক্টর ভাটনাগর একটা ঘন

নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'গুড়িয়ার স্মৃতিতে শুধু আছে, সেদিন যখন সে আর্ট স্কুলে যাচ্ছিল তখন চারপাশ ছিল শুকনো খট খটে। যাওয়ার অর্ধেক পথের কথা মনে আছে ওর। তারপর বিশাল এক শূন্যতা। এই শূন্য স্মৃতির পর ওর মনে পড়ে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি ফিরছে।'

ডক্টর ভাটনাগর থামলেন। রহস্যের ঘোরে মনীশ তখন স্তব্ধ। রাজেশ তো অনেকক্ষণ থেকেই নীরব।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ডক্টর ভাটনাগর আবার বললেন, 'ডক্টর মোহন শর্মাজীর সেই বাড়ি থেকে আর্ট স্কুল যাওয়ার পথের কিছু বাসিন্দার কাছেও খোঁজ খবর নিয়েছেন। কিন্তু তখন প্রায় এক বছর কেটে গেছে। তার ওপর শর্মাজীরা ওখানে আর থাকেন না। শুধু তাই নয়, ওই পাহাড়ী রাস্তায় আশে-পাশে কটা আর বাড়ি ঘর। কারো কাছ থেকে কিছুই জানা যায়নি।'

আবার একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে।

মনীশের চোখে এখন ভাসছে গুড়িয়ার সেই ভীত সন্ত্রস্ত চোখ। গতকাল খুব কাছ থেকে মুহূর্তের জন্য যে অসহায় যন্ত্রণা কাতর চোখ দুটো সে দেখেছিল।

'হাওএভার মিঃ সেন-' ডক্টর ভাটনাগর বললেন 'এই ভয়ংকর ঘটনার জন্য গুড়িয়া যে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে সেটা আবার ওর মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে। ডক্টর মোহনের লাইন অব ট্রিটমেণ্টে ভালই রেসপণ্ড করেছে গুড়িয়া। আপনার পারফরমেন্স শুরুতেই দারুণ। আমার মনে হয়, ক্রাইসিস ফিফটি পার্সেণ্ট কেটে গেছে। আর ফিফটি পার্সেণ্ট বাকী। এবার আমি ওষুধের ডোজটা একটু বাড়াতে চাই। আশা করি আপনি সহযোগিতা করবেন?'

'বলুন কি করতে হবে আমাকে?' মনীশ এমন ভাবে বলল, যেন গুড়িয়াকে সুস্থ করতে সে অঙ্গীকার বদ্ধ।

ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'মিসেস সারীনের প্রস্তাব অনুযায়ী আপনাকে আমি মিঃ সারীনের কোয়ার্টারে দুবেলা খেতে যেতে অনুরোধ করব।'

'শুধু সঙ্গীতার প্রস্তাব নয়।' রাজেশ বলল, গুড়িয়ারও অনুরোধ।'

'গুড়িয়ার অনুরোধ!' মনীশ অবিশ্বাসের চোখে তাকাল।

হ্যাঁ অরবিন্দ।' রাজেশ বলল, 'গুড়িয়া সঙ্গীতার কাছে আগেই শুনেছিল, তুমি ওর জন্য আমাদের কোয়ার্টারে খেতে যাও না। আজ সকালে উঠে সঙ্গীতাকে সে প্রথম এই কথাটাই বলেছে। তোমাকে বলতে, তুমি যাতে খাওয়াটা শুরু কর। এবং আরো কি বলেছে জানো?'

মনীশের উৎসুক দৃষ্টি।

'বলেছে, তুমি যদি আমাদের কোয়ার্টারে খেতে না যাও তাহলে ও বুঝবে তুমি ওকে ক্ষমা করোনি।'

মনীশের ঠোঁটে অপ্রস্তুত হাসির রেশ ফুটে উঠল।

'দিস আর দ সিম্পটমস।' ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'গুড়িয়া যে সুস্থ হয়ে

উঠছে, ওর এই কথা হাবে-ভাবেই স্পষ্ট। এখন আপনাকেও এই সিমটম অনুযায়ী রেসপণ্ড করতে হবে। হতে পারে, গুড়িয়া এখুনি আপনার সামনে উচ্ছসিত হয়ে আসবে না। তবে আমার বিশ্বাস, মিঃ সারীনের কোয়ার্টারে আপনার দু বেলা যাতায়াত হলে, ও আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয়ে উঠবে। আমরা ধীরে ধীরেই এগোতে চাই। স্লো অ্যাণ্ড স্টেডি প্রোসেসে।'

'ঠিক আছে।' মনীশ ওর শক্ত দেহটাকে শিথিল করে বলল, 'তাই যখন বলছেন, যাবো আমি।'

'আজ রাত থেকে?' রাজেশের খুশীব চোখ।

'না!' নিষেধ করলেন ডক্টর ভাটনাগব। 'শুরু হোক দিনের আলোয়। রাতের অন্ধকারে নয়। কাল লাঞ্চ থেকে।'

'তাই হোক।' রাজেশ সায় দিল।

ওয়ান থিং মিঃ সেন—' ডক্টর ভাটনাগব হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার চশমার পাওযার কত?'

'জিরো।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল মনীশ।

'জিরো!' ডক্টর ভাটনাগর অবাক। বিস্ময়েব স্বরে বললেন, 'তাহলে আপনি চশমা পরেন কেন?'

মুহূর্তের জন্য থমথমে হয়ে উঠল মনীশেব মুখ। তবে পলকেই সামলে নিল। মৃদু হেসে বলল, 'এমনি। এই চাকরীর ইন্টারভিউ দেবার উদ্দেশ্যে পরেছিলাম। ভাবতাম এতে বোধহয় স্মার্ট দেখায়। তারপর আর ছাড়িনি।'

'বুঝেছি!' ডক্টর ভাটনগর মৃদু হাসলেন। খুশী হয়ে বললেন 'আমি এমন ভাবতে পারিনি। ভেবেছিলাম, পাওয়ার কম হলে বলব, ফর দ টাইম বিয়িং গুড়িয়ার সামনে অন্তত না পরতে। তবে পাওয়ার যখন নেই, আমার রিকোয়েস্ট মিঃ সেন, চশমাটা এবার ছেড়ে দিন।'

'ছেড়ে দেব?'

'হ্যাঁ ফর দ সেক অফ গুড়িয়া।'

চশমাটা চোখ থেকে নামাল মনীশ। 'ঠিক আছে—'

'থ্যাঙ্কস! থ্যাঙ্কস এ লট মিঃ সেন।' ডক্টর ভাটনাগর উঠে দাঁড়ালেন। রাজেশও উঠল চেয়ার ছেড়ে।

দুজনের দৃষ্টিতে অপার খুশী ও প্রশংসার ঝিলিক।

তার পরের দিন থেকেই রাজেশদের কোয়ার্টারে খেতে যাওয়া শুরু হল মনীশের। মনীশ ওর চেম্বারের জানলা দিয়ে প্রথমে দেখে নিল, গুড়িয়া সেই আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে নেমে নীচের পোস্ট অফিসে এসে গেছে। তারপর সে রাজেশের সঙ্গে বেরলো ওর চেম্বার থেকে। যাতে গুড়িয়ার সঙ্গে পথে দেখা না হয়ে যায়।

গুড়িয়াকে আজও টিফিন ক্যারিয়ার হাতে চিন্তিত বিষন্ন দেখাল। মনীশও

বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেল, পর পর দু'দিন গুড়িয়াকে ওর আসল রূপে না দেখতে পেয়ে।

কিন্তু সঙ্গীতা সেদিন মনীশের খেতে আসায় ভীষণ খুশী। চশমা বিহীন মনীশকে দেখে বলে উঠল, 'বাঃ চশমা ছাড়াই তো তোমাকে সুন্দর লাগে অরবিন্দভাই, কে বলেছে চশমায় তোমাকে স্মার্ট দেখায়!'

'কেউ না।' ম্লান হেসে মনের দুঃখটা অন্যভাবে প্রকাশ করল মনীশ, 'চাকরী না পেতে পেতে এই ইণ্টারভিউর জন্য চশমাটা পরেছিলাম।'

বাইরের ঘরে তুষার শৃঙ্গের ছবিটার দিকে একবার তাকাল মনীশ। অপূর্ব ছবি-খানা। তবে দেখল বিমর্ষ দৃষ্টিতে। কারণ এই আঁকার সাথে জড়িয়ে আছে গুড়িয়ার জীবনের এক ভয়ংকর স্মৃতি।

খাবার টেবিলে খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল মনীশ, 'ভাবী, তোমাদের ড্রয়িংরুমের ছবিটা মনে হচ্ছে তামিয়ায় বসে আঁকা।'

'ঠিক বলেছ।' সঙ্গীতা খাবার পরিবেশন করতে করতে বলল, 'ওই ছবি দিয়েই গুড়িয়া আবার আঁকা শুরু করেছিল এখানে।'

'শুরু করেছিল মানে?' মনীশ তাকাল, 'ও কি আঁকা বন্ধ করে দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, শিমলায় আর্ট স্কুলে যাওয়া বন্ধ করার পর থেকেই আঁকা ছেড়ে দিয়েছিল গুড়িয়া।' সঙ্গীতা বলল, তারপর এখানে আমাদের অনুরোধে কিছুদিন আঁকল। এখন আবার বন্ধ।'

'আবার বন্ধ?' খাওয়া থামাল মনীশ। বিস্মিত চোখে তাকাল, 'আর আঁকে না গুড়িয়া?'

'না।' রাজেশ বলল, 'এর আগের দুটো ঘটনাও এখানে আঁকতে গিয়েই হয়েছে।'

আঁকতে গিয়ে! সেই দুটো ঘটনাও আঁকতে গিয়ে ঘটেছে! মনীশ ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটেছিল?'

'বছর খানেক আগের কথা—' রাজেশ বলল, 'পাইনের জঙ্গলের ওপাশে বসে আঁকছিল গুড়িয়া—'।

একা একা?' মনীশের দৃষ্টি গাঢ় হল।

হ্যাঁ এই পাহাড়ী জায়গায় এখনও কোনো ভয় নেই।' সঙ্গীতা বলল, 'একাকী বসে একটু এদিক ওদিক যে কোন মেয়ে আঁকতে পারে।'

'তারপর?' মনীশ রাজেশের দিকে তাকাল।

'যেখানে বসে আঁকছিল সেখানে হঠাৎ আমাদেরই এক নেপালী সহকর্মী বেড়াতে বেড়াতে চলে যায়। তাকে দেখে ভয়ে ছবি-টবি ছেড়ে ছুটতে ছুটতে কোয়ার্টারে চলে আসে গুড়িয়া।'

'বেহুঁশ হয়নি?' মনীশের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, বাড়িতে এসে একেবারে বেঁহুশ। তারপর নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে কোয়ার্টারেই ছিল কয়েকদিন।' সঙ্গীতা বলল, 'বেরোয়নি কোথাও।'

'দ্বিতীয় ঘটনা ঘটেছিল তার ছ'মাস পর।' রাজেশ বলল, 'তখন গুড়িয়া দূরে কোথাও যেত না। ডক্টর ভাটনাগরের অনুরোধে ক্যানভাস-স্ট্যান্ড নিয়ে এই রাস্তার কাছাকাছি বসত। সেদিন পাইনের জঙ্গলের এপাশে বসে আঁকছিল। হঠাৎ ওর সামনে এসে পড়ে এখানকার পুলিশ ইন্সপেক্টরের ছোটো ভাই। শিমলার ছেলে। সেও আর্টের ছাত্র। উৎসুক হয়ে গুড়িয়ার পাশে দাঁড়িয়ে ওর আঁকা দেখছিল। ওকে দেখে সেখানেই বেঁহুশ হয়ে পড়ে গুড়িয়া। তারপর থেকে গুড়িয়া আর আঁকে না। আমাদের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও।'

মনীশের মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। গুড়িয়ার আঁকা বন্ধ শুনে যতটা না হল তার চেয়ে বেশী দুঃখ পেল এই আঁকার সাথে সব ঘটনার যোগাযোগ লক্ষ্য করে।

সঙ্গীতা বলল, 'জানো অরবিন্দভাই, ওই দুজনেরই মাথায় ঝাঁকড়া চুল ছিল। চোখে ছিল কালো চশমা। তুমি দুটোই ছেড়েছ বলে আমার এত ভাল লাগছে না—'

মুহূর্তের জন্য মনীশের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এল। তবে ব্যাপারটা সে এতদিনে অনেকটা সামলে নিয়েছে। ওই রূপ মনীশ নিজেও এখন ভুলে যেতে চায়।

খাওয়া শেষ করে টেবিল থেকে যখন উঠছে মনীশ, সঙ্গীতা জিজ্ঞেস করল, 'রান্না কেমন হয়েছে অরবিন্দভাই?'

'ভালো।' মনীশের উত্তর।

'শুধু ভাল বললে চলবে?' সঙ্গীতা হেসে বলল, 'চাপাতি ও ভাত ছাড়া সবজি তরকারী সব গুড়িয়ার রান্না। তুমি তো দেখলাম চেটে-পুটে খেলে।'

'ভাল হয়েছে।' মনীশের মন্তব্যটা খুব ছোট্টো হলেও স্বরে ভাল লাগার প্রকাশ ছিল বিশাল।

গুড়িয়া পোস্ট অফিসে বাবাকে খাইয়ে কখন কোয়ার্টারে ফিরে আসে সেটা মনীশের জানা ছিল। তার মিনিট দশেক পর রাজেশের কোয়ার্টার থেকে বেরলো মনীশ। অর্থাৎ গুড়িয়া তখন পাশের কোয়ার্টারের ভেতর।

কিন্তু মনীশ জানতে পারল না, রাজেশের সঙ্গে সে যখন সেই আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে নামছে, গুড়িয়া প্রথমে ওদের কোয়ার্টারের জানলা থেকে তারপর সন্ত্রস্ত পায়ে বাইরে এসে গেটের আড়াল থেকে ঘন নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর যাওয়ার দিকে।

এভাবে বেশ কিছুদিন চলল ওদের লুকোচুরি খেলা। গুড়িয়া দুবেলাই মনীশের যাতায়াত লক্ষ্য করে দূর আড়াল থেকে। দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক আবেশ থাকে তখন। উষ্ণ অনুরাগে পরিপূর্ণ তৃষিত চাতকের চাহনির মত। কিন্তু ওর এই তৃষ্ণা অতৃপ্ত থেকে যায় মনীশের সামনে আসতে না পারার দুঃখে। গুড়িয়া পারে না আসতে মনীশেরই স্বার্থে। যদি আবার কিছু অঘটন ঘটে যায়? মনীশ তাহলে অপ্রস্তুত হবে। মনীশকে আর লজ্জিত, অপদস্থ করতে চায় না গুড়িয়া। তাই ওর অন্তরের দুঃখ আড়ালে ও অন্তরালে করুণভাবে প্রকাশ পায় ওর অসহায় দৃষ্টিতে।

ওদিকে মনীশও সতর্ক। সে সাবধান পায়ে রাজেশের কোয়ার্টারে আসা যাওয়া করে। কখনো এক পলকের জন্যেও যাতে গুড়িয়ার সঙ্গে দেখা না হয় সেদিকে ওর সজাগ দৃষ্টি। অথচ অফিসের জানলা থেকে গুড়িয়াকে এখনো সে লক্ষ্য করে যায়। যে ভাবে প্রথম দিন থেকে করে আসছে।

অদ্ভুত পরিস্থিতি। দুজনেই দুজনের অলক্ষ্যে চেয়ে থাকে পরস্পরের দিকে। ভালবাসার আবেশে। যে ভালবাসা দুজনের কাছেই অনুক্ত অব্যক্ত।

তারপর ডক্টর ভাটনাগরের নির্দেশে একদিন সঙ্গীতা প্রায় জোর করেই গুড়িয়াকে মনীশের উপস্থিতিতে খাবারের টেবিলে নিয়ে আসল। ওকে দিয়ে টুক টাক খাবার পরিবেশন করাল। তখন সবারই রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। কি হয় কি হয় ভাব। সবচেয়ে বেশী উত্তেজিত আতঙ্কিত ছিল গুড়িয়া নিজেই। মনীশকে সে খুব যত্ন করে খাবার পরিবেশন করল। কিন্তু মনীশের দিকে না তাকিয়ে। মনীশ নত মুখে বসে ছিল তখন। গুড়িয়া সামনে থেকে সরে না যাওয়া অব্দি এক পলকের জন্যেও সে মুখ তুলল না।

মনীশকে খাবার পরিবেশন করে গুড়িয়া ধীর পায়ে সঙ্গীতার পাশে এসে চেয়ারে বসল। শুরু করল ওর খাওয়া। খেতে খেতেই একবার অকস্মাত তাকাল মনীশের খাবারের দিকে। মনীশও তাকাল সেই মুহূর্তে। এক অসতর্ক অবস্থায় দুজনেই দেখল দুজনকে। পরমুহূর্তে সতর্ক হয়ে ওরা ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি।

কোনো অঘটন ঘটল না। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়ের।

তার কয়েকদিন পর হাসপাতালের চেম্বারে সঙ্গীতার কাছে সব রিপোর্ট শুনে নিশ্চিন্ত হলেন ডক্টর ভাটনাগর।

'ওয়েল ডান মিসেস সারীন!' ডক্টর ভাটনাগর সপ্রশংস স্বরে বললেন, 'আপনার প্রচেষ্টায় এবার আমাদের লক্ষ্য সফল হবেই।'

'আর কবে হবে ডক্টর ভাটনাগর?' সঙ্গীতা অসহিষ্ণু স্বরে বলল, 'এতদিন হয়ে গেল, দুজন সামনাসামনি আসছে কিন্তু ওদের কথা এখনো শুরু হল না।'

'হবে।' ডক্টর ভাটনাগর আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আসলে এতদিনের জখম, শুকোতে একটু সময় লাগবে। তারপর এই আঘাত ওর অবচেতন মনের। যদি কষ্টটা ওর চেতনার মধ্যে থাকত, ওর নিয়ন্ত্রণে, আমরা অনেক আগেই ওকে সুস্থ করতে পারতাম।'

'সেজন্যই ভীষণ দুঃখ হয়, ডক্টর ভাটনাগর।' সঙ্গীতা উদাস স্বরে বলল, 'মেয়েটা ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে অরবিন্দকে। অপরিসীম দরদ ওর প্রতি। কিন্তু বেচারী ত' প্রকাশ করতে পারে না ওর সামনে।'

'আপনার কাছে প্রকাশ করছে তো?'

'নিরন্তর করছে।' সঙ্গীতা বলল, 'সোজাসুজি নয়। আকারে ইঙ্গিতে হাবে-ভাবে।'

'যেমন— ?' ডক্টর ভাটনাগর জানতে চাইলেন।

'অরবিন্দ দুবেলা ঠিকমত খাচ্ছে কিনা খোঁজ খবর নেয়। ওর জন্য রোজ কিছু না

কিছু খাবার বানিয়ে রাখে। ওর সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে। ওর মা'র কথা, বোনের কথা। সব অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করে বলতে হয় ওকে।'

'ভেরী গুড!' ডক্টর ভাটনাগর খুশী হয়ে বললেন, 'এই তো গুড়িয়ার সুস্থ হওয়ার লক্ষণ। তাহলে আমি এবার মিঃ সেনকে ফরেস্ট সাইড কোয়ার্টারে আসতে বলতে পারি?'

'ফরেস্ট সাইড কোয়ার্টার!' সঙ্গীতা তাকাল।

'হ্যাঁ, আপনাদের দুটো রো পেছনে।' 'ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'যেটা মিঃ সেন ইচ্ছে করে নেন নি। এখনো খালি আছে ওটা।'

'তাই?' সঙ্গীতা খুশীতে লাফিয়ে উঠল প্রায়। উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, 'বাঃ, তাহলে তো দারুণ হয়!—কবে নিয়ে আসছেন?'

'খুব শীঘ্রই।' ডক্টর ভাটনাগর মৃদু হেসে বললেন, 'গুড়িয়ার চিকিৎসার সুবিধের জন্য।'

নিউ জার্সি।

সুমিত সন্ধ্যের একটু আগে নিউইয়র্ক থেকে ফিরে গাড়ি ঢোকাল গ্যারেজে। গাড়ি থেকে নেমে ক্লান্ত পদক্ষেপে লিভিং রুমে যখন প্রবেশ করল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রঞ্জনা।

সুমিত গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকাল রঞ্জনার দিকে। সোফায় গা ছেড়ে দিয়ে বিরক্ত স্বরে বলল, 'ভার্জিনিয়া, শিকাগো ওয়াশিংটন সব শহর থেকে খবর এসে গেছে। কোথাও তোমার দোসর নেই।'

'গেল কোথায় তাহলে?' রঞ্জনা উদগ্রীব স্বরে বলল, 'নিউইয়র্কে নেই! নিউ জার্সিতেও নেই! একটা বাঙ্গালী ছেলে এখানে দু'মাস ধরে আছে আমরা তার হদিস পাব না?'

'বাঙ্গালী ছেলে বটে।' সুমিত রুক্ষ স্বরে বলল, 'বেছে বেছে নিয়ে এসেছ এবার। একেবারে সোনার চাঁদ! আমাদের কত ওপরে যায় দেখছো?'

রঞ্জনার মুখ মুহূর্তে বীভৎস হয়ে উঠল। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝাঁঝালো স্বরে বলল, 'দাঁড়াও! যেতে দিচ্ছি। ওর ভিসার মেয়াদ আর ক'দিন! তার আগেই ওকে আমি খুঁজে বার করব।'

'আর খুঁজবে কোথায়? আয় হ্যাভ স্টর্মড অল দ স্পটস।'

'আমারও কানেক্‌শনস্‌ আছে!' রঞ্জনার চোয়াল শক্ত হল—'লেট মি ট্রায়। কারো না কারো চোখে অরবিন্দ ধরা পড়বেই।'

'আয় ডোন্ট বিলিভ।' সুমিত একটা ঝোড়ো নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোমার চোখ যে ইণ্ডিয়াতে ফাঁকি দিয়েছে আর আমাকে পুরো একমাস, সে কি জিনিস আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি এখন।'

'রিয়লি! আমি ওকে চিনতে পারিনি সুমিত।' রঞ্জনা হাত দুটোয়

শক্ত মুঠো করে বলল, 'অথচ ইণ্ডিয়ায় আমার ওপর অরবিন্দ বহু টাকা উড়িয়েছে।'

'দোজ ওয়ের ইণ্ডিয়ন মানি ?' সুমিত প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'তার পরিবর্তে হি এঞ্জয়েড ইয়ু। কিন্তু আমি কি পেলাম ? এই এক মাসে আমি কয়েকশো ডলার খরচ করেছি ওর ওপর। প্লাস ফুডিং অ্যাণ্ড লজিং। এর মধ্যে এক সেণ্টও তুমি ওর কাছ থেকে আদায় করতে পার নি ?'

রঞ্জনা অস্থির পদক্ষেপে ঘরে দু-একবার পায়চারি করল। তীব্র আক্রোশে ওর শরীর কাঁপছে তখন। সত্যি, অরবিন্দ যে এভাবে ওদের বোকা বানিয়ে পালিয়ে যাবে একবারও সে ভাবতে পারেনি। বরং ভেবেছিল প্রচুর টাকার দাও মারবে ওর ওপর। কারণ রঞ্জনা জানত, অরবিন্দ ব্ল্যাকে হুণ্ডিতে ইণ্ডিয়া থেকে বহু ডলার নিয়ে এসেছে সঙ্গে। তার এক কপর্দকও পাওয়া গেল না। তার আগেই পাখি উধাও। ঠিক আছে, দেখা যাক্ কে ওপরে যায় অরবিন্দ না রঞ্জনা !

রঞ্জনা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বলল, 'সুমিত গাড়ির চাবি দাও ! আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঘুরে আসছি।'

'কোথায় যাবে ?' সুমিতের প্রশ্ন।

'কার্লোব কাছে।' রঞ্জনা উগ্র দৃষ্টি হেনে বলল, 'ওকে দিয়ে আমি খুঁজে বার করব অরবিন্দকে।'

সুমিত তাকাল। চাবিটা ধীরে ধীরে পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দিল রঞ্জনার হাতে।

রঞ্জনা চাবি নিয়ে গ্যারজের এণ্ট্রেন্সের দিকে এগোতে গিয়ে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। তারপর পেছন ফিরে ঢুকে পড়ল বেডরুমে। কার্লোর কাছে যেতে হলে ওকে একটু অন্যভাবে সাজতে হবে।

সুমিতও জানে সেটা। রঞ্জনাকে গাড়ির চাবি দেওয়ার আগে সে কথাই সে ভেবেছিল একবার। কার্লো একটি মাফিয়া গোষ্ঠির কুখ্যাত লোক। রঞ্জনা তার ডেরা থেকে আজ রাতে নাও ফিরতে পারে। কারণ কার্লোর এশিয়ান মেয়েদের ওপর একটা বিশেষ ঝোঁক আছে। অন্য সময় হলে সুমিত চাইত না রঞ্জনা এতটা ঝুঁকি নিক। কিন্তু প্রতারকরা যখন প্রতারণার শিকার হয়, ওদের মগজে প্রতিশোধ নেওয়ার আক্রোশ ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

সেই আক্রোশে রঞ্জনা ও সুমিত দুজনেই এখন হিংস্র হয়ে উঠেছে।

তামিয়া হাসপাতাল। সময় দুপুর বারোটা দশ।

আউটডোরে পেশেণ্ট দেখা শেষ হওয়ার পর ডক্টর ভাটনাগর ওষুধপত্রের কিছু রিকুইজিশন স্লিপে সই করছেন। টেবিলে ফোন বেজে উঠল।

ডক্টর ভাটনাগর তুলে নিলেন রিসিভার।

'ডক্টর ভাটনাগর ?' ওপাশে সঙ্গীতার গলা।

'ইয়েস মিসেস সারীন, বলুন ?

'অরবিন্দর নতুন কোয়ার্টার থেকে ফোন করছি।'

কবে শিফট করলেন মিঃ সেন ?'

'আজকেই। মানে জিনিসপত্র আজ সকালে এসে গেছে।'

'তাহলে, আপনার ইচ্ছা পূরণ হল তো? মিঃ সেনকে কাছাকাছি আনতে চাইছিলেন।

'তা হল।' সঙ্গীতা খুশীর স্বরে বলল, 'আমার কাছাকাছি তো বটেই তার চেয়ে বড় কথা গুড়িয়ার কাছাকাছি এল।—জানেন, আমি আর গুড়িয়া সকাল থেকে এই কোয়ার্টার গোছ-গাছ করছি ?'

'ভেরী গুড!'

'গুড়িয়ার উৎসাহ দেখলে আপনি বুঝতেন, কি ভালবাসায় পড়ে গেছে মেয়েটা। নিজের হাতে নতুন পর্দা সেলাই করেছে। টেবিল ক্লথ বানিয়েছে। আরো কত কি ?'

'বাঃ আর তাহলে বাকী রইল কি ? সবই তো শেষ করিয়ে এনেছেন।'

'বাকী—ওদের মধ্যে সংলাপ আর একাকী সাক্ষাত। তারও আজ একটা ব্যবস্থা করেছি।'

'কি ব্যবস্থা ?'

'বলব। আপনি বিকেল পাঁচটা নাগাদ কাইন্ডলি একবার আমাদের কোয়ার্টারে আসুন। আমি আর মিঃ সারীন থাকব।'

'কিন্তু ওদের একাকী সাক্ষাৎটা হবে কোথায় ?' ডক্টর ভাটনাগর জিজ্ঞেস করলেন।

'কেন, অরবিন্দর নতুন কোয়ার্টারে। ওই পাঁচটার সময়।'

'জানে ওরা ?'

না। অরবিন্দ জানে না। গুড়িয়াও জানে না। সেজন্যই আপনাকে কাছাকাছি থাকতে বলছি।' সঙ্গীতার স্বরে কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠার আভাস 'হাজার হোক একাকী সাক্ষাৎ। যদি কিছু ঘটে যায়!'

'ঘটবে না।' ডক্টর ভাটনাগর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'তবে আমি আসব। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।'

'আচ্ছা। রাখছি!'

'ও কে. মিসেস সারীন।'

রিসিভার নামিয়ে মৃদু হাসলেন ডক্টর ভাটনাগর। মিসেস সারীনের উচ্ছাস এখনো কানে বাজছে। সত্যি কথা বলতে গুড়িয়াকে সুস্থ করার ব্যাপারে মিসেস সারীন ডাক্তারের সহকারীর কাজ করছেন। তার নিজস্ব উৎসাহ, আন্তরিকতা ঘটনাকে আরো মধুর, সুন্দর করে তুলেছে। সব কিছুই করছেন তিনি ডক্টর ভাটনাগরের নির্দেশ মত। এখন দেখা যাক্ আজকের একাকী সাক্ষাৎটা নির্বিঘ্নে ঘটে কিনা। গুড়িয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে কি হয়নি এটাই তার শেষ পরীক্ষা।

ডক্টর ভাটনাগরের চোখে-মুখেও বিন্দু বিন্দু চিন্তার রেশ ফুটে উঠল।

ডক্টর ভাটনাগরের রিসিভার নামানোর পরেই অফিসে রাজেশের টেবিলে ফোন বেজে উঠল। রাজেশ রিসিভার তুলে ওপাশের গলাখাঁকারী শুনেই বুঝল সঙ্গীতা।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রাজেশ।

'রিমাইণ্ডার সার্ভিস!' সঙ্গীতা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আপনি যাতে ভুলে না যান তাই আবার জানাচ্ছি—'

বাধা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল রাজেশ, 'আমি আজ অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের কোয়ার্টারে ফিরব. এই তো? যদিও লাঞ্চের সময় অরবিন্দর সামনে তুমি আমাকে বলেছো সোজা ওর নতুন কোয়ার্টারে যেতে।'

'কারেক্ট!' সঙ্গীতা বলল, 'ভুলে আবার তাই করে বসো না। আমি আমাদের কোয়ার্টারেই থাকব। ওখানে তখন শুধু গুড়িয়া থাকবে।'

'ভুল হবে না বাবা। তুমি নিশ্চিন্তে থাক।'

'ঠিক আছে। অরবিন্দ কিন্তু জানে, আমি ও গুড়িয়া ওর নতুন কোয়ার্টারে থাকব। ওকে আবার উল্টো-পাল্টা বলে বসো না!'

'বলবো না। বি সিওর!'

সঙ্গীতা ছেড়ে দিল ওপারে।

বিকেল পাঁচটা দশ।

মনীশ অফিস থেকে বেরিয়ে সেই আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে ওর নতুন কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছে। এই কোয়ার্টারের অবস্থান রাজেশদের কোয়ার্টারের চেয়েও উঁচুতে। দক্ষিণের পাহাড়ের মাঝামাঝি কোলে রাজেশ ও গুড়িয়াদের কোয়ার্টারের দু সারি পেছনে। এখানে বাঁ দিক ঘেঁষে পাইনের ঘন জঙ্গল। পেছন ফিরলেই অর্থাৎ কোয়ার্টারের বারান্দা থেকেও দেখা যায় উত্তরের তুষার শ্রেণী। যেটা রোড সাইড কোয়ার্টার থেকে ভাল মত দেখা যেত না।

এই মনোরম কোয়ার্টার এক সময় গুড়িয়ার জন্যেই গ্রহণ করেনি মনীশ। আজ কি অদ্ভুত সংযোগ. সেই গুড়িয়ার জন্যেই এখানে আসতে হল ওকে। গুড়িয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুক সেটা মনে-প্রাণে চায় মনীশ। তাই ডক্টর ভাটনাগরের এই প্রস্তাব সে এক কথায় মেনে নিয়েছে।

মনীশের এখন এই একটাই সান্ত্বনা, অরবিন্দর পরিচয় নিয়ে যে অপরাধ সে করছে তার কিছুটা যদি লাঘব হয় গুড়িয়াকে সুস্থ করে।

গুড়িয়ার কথা ভাবতে ভাবতে মনীশ নতুন কোয়ার্টারের সামনে এসে পৌঁছল। কোয়ার্টারের নতুন রূপ দেখে থমকে গেল ওর চোখ। সকালে এই রূপ তো ছিল না এখানকার?

সামনের লন ও বাগান এখন ঝকঝকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ঝোপঝাড়, ময়লা সুদ্ধ অবিন্যস্ত ভাবটা আর নেই। প্রবেশ পথের দুপাশে কিছু নতুন ফুলের চারাও লাগানো হয়েছে। দরজায় জানলায় ঝুলছে নতুন পর্দা।

নতুন পর্দা ঠেলে বাইরের ঘরে ঢুকল মনীশ।

গুড়িয়া বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে। শাড়ীর আঁচল কোমরে শক্ত করে জড়ানো। মাথায় বজ্র আঁটুনিতে বাঁধা খোঁপা। পেছন ফিরে উঁচু পেরেকে চীনে মাটির একটা ওয়াল প্লাক লাগাতে ব্যস্ত। কিন্তু পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে গোড়ালি তুলেও সে পেরেকের নাগাল পাচ্ছে না।

মনীশ এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাক দিল—'ভাবী!'

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল গুড়িয়া। গোড়ালি নামিয়ে পেছন ফিরে তাকাল। তাতেই হাত থেকে পড়ে গেল প্লাকটা। চীনে মাটির টুকরো ছত্রখান মেজে।

মনীশ সাবধান হল। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল গুড়িয়ার দিকে। গুড়িয়াও মেজের দিকে চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে।

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ কানে বাজছে। তার সাথে দুজনেই শুনছে নিজেদের বুকের দুরুদুরু আওয়াজ।

দীর্ঘ নীরবতার পর মনীশ লক্ষ্য করল, গুড়িয়া ওর ডান হাতের অনামিকায় শাড়ীর আঁচল জড়াচ্ছে। অঘটন কিছু কি ঘটল আবার, নাকি ঘটবে? মনীশের উদগ্রীব দৃষ্টি গাঢ় হল এক পা এগিয়ে দেখল, না গুড়িয়া স্বাভাবিকই আছে। ওর মুখে লজ্জার ছটা। অপ্রস্তুত অবস্থায় আঙুলে একবার আঁচল জড়াচ্ছে আর খুলছে।

নিশ্চিন্ত হল মনীশ। খানিক পর জিজ্ঞেস করল, 'সঙ্গীতাভাবী কোথায়?'

গুড়িয়া পেছন না ফিরে অস্ফুট স্বরে বলল, 'একটু বেরিয়েছে। এখুনি আসবে।'

গুড়িয়া চেয়ার থেকে নামতে উদ্যত হল। ত্রস্ত পদক্ষেপে ছুটে এল মনীশ। বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও গুড়িয়া!'

গুড়িয়া থতমত খেয়ে পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল চেয়ারে।

মনীশ ঝুঁকে চেয়ারের পাশে ছড়িয়ে পড়া চীনে মাটির টুকরোগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিল এক পাশে। সোজা হয়ে বলল, 'নামো এবার।'

গুড়িয়া আলতো দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল সব। নামল এবার।

নেমে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। মনীশ এক ঝলক তাকিয়ে দেখল। গুড়িয়ার লজ্জায় রাঙা মুখ আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। কপালে ঘামের রেশ। শক্ত করে বাঁধা খোঁপা। তবু সামনে অবিন্যস্ত মাথার চুল। পায়ের গোছের ওপর তোলা শাড়ী। আঁচল আঁটসাঁট বাঁধা কোমরে। ঘর সাজানোর কর্মব্যস্ততা ওর মধ্যে অন্য এক আকর্ষণ এনে দিয়েছে।

মনীশ গুড়িয়ার অপ্রস্তুত ভাবটা কাটানোর জন্য চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'বাঃ সুন্দর সাজিয়েছ তো ঘরখানা!'

সত্যি বাইরের মত ভেতরটাও সুন্দর সাজানো। দরজা জানলায় যে কাপড়ের পর্দা তারই ঢাকনা লাগানো সোফা-কোচে। সেণ্টার টেবিলে লেসের কাজ করা টেবল ক্লথ। তার মাঝখানে ওক কাঠের একটা ফুলদানী। তাতে সদ্য প্রস্ফুটিত লাল গোলাপের গুচ্ছ বসানো।

গুড়িয়া তখন মেঝেতে বসে চীনে মাটির টুকরোগুলো কুড়োচ্ছে।

মনীশ আরো নিশ্চিন্ত হল। গুড়িয়ার সঙ্গে এভাবে একা দেখা হওয়া ওর কাছে অপ্রত্যাশিত। চীনে মাটির প্লাকটা ভেঙ্গে পড়ায় থমকে গিয়েছিল ভীষণ। তবে এতক্ষণ যখন কিছু ঘটেনি মনে হয় সংকট কেটে গেছে। কিন্তু সঙ্গীতা ভাবী গেল কোথায় ?

গুড়িয়া কোমর থেকে আঁচল খুলে সেই আঁচলে চীনে মাটির টুকরোগুলো তুলে উঠে দাঁড়াল।

মনীশ ওর প্রতিটি ভাব-ভঙ্গী মুগ্ধ চোখে লক্ষ্য করছে। গুড়িয়া ভরা আঁচল দু'হাতে ধরে একবার তাকাল দেয়ালে লাগানো পেরেকটার দিকে। ওর হতাশ দৃষ্টি।

মনীশ পাশে এল। গুড়িয়ার প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ওই দেয়ালে কি লাগাবে, তাই ভাবছ তো ?

ভরা আঁচল হাতে গুড়িয়া মুখ নত করল। তারপর ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল মনীশের চোখে। মনীশ তামিয়ায় এসে ওর প্রথম দৃষ্টিতে যে দুটি জীবন্ত সন্ধ্যামণি ফুল ফুটতে দেখেছিল, সঙ্গীতাভাবীর দেহে জড়ানো পুষ্পলতায়, সেই দীঘল কালো চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে আছে গুড়িয়া। এই চোখ একবারও কাঁপল না। ভীত হল না।

গুড়িয়ার চোখে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত কিছু দেখার তৃষ্ণা ছিল। এত কাছ থেকে এত অন্তরঙ্গ অবস্থায় এই তৃষ্ণা পূর্ণ হবে কোনোদিন সে ভাবতে পারে নি। তাই এখন যেন আকণ্ঠ পান করছিল মনীশের আপন করা চাহনিকে। সবশেষে ঘোর ভাঙ্গতে আরম্ভ হয়ে উঠল ওর মুখ। দৃষ্টি নামিয়ে নিল আবার।

মনীশ বলল, 'আমি বলব কি ঝোলাবে ওই দেয়ালে ?'

গুড়িয়া মুখ তুলে তাকাল সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে।

মনীশ গাঢ় স্বরে বলল 'তোমার আঁকা একটা ছবি। তবে পুরনো নয়। যে ছবি তুমি আঁকবে শুধু—এই দেয়ালের জন্য।'

গুড়িয়া নীরব। ওর চোখে ভাবনার রেশ।

মনীশ আবার বলল, 'আঁকবে তো গুড়িয়া ?'

গুড়িয়া কাঁধ হেলিয়ে সম্মতি জানাল। তারপর ঘুরে পা বাড়াল দরজার দিকে আঁচল শূন্য করতে। ওর মুখে তখন প্রাণোচ্ছল হাসি। নিশ্চিন্তির হাসি।

জীবনে প্রথম আজ সে এমন এক আনন্দের স্বাদ পেল যার ঘোরে ভেসে যেতে ইচ্ছে করছে ওর আকাশে। পাখির মত ডানা মেলে উড়ে উড়ে বলতে ইচ্ছে করছে সবাইকে, আজ ওর ভাল লাগছে। ভীষণ ভাল লাগছে।

তারপর···এই নতুন অনুভূতি গুড়িয়াকে নতুন জীবন প্রদান করল। সবাই লক্ষ্য করল ওর পরিবর্তন। শর্মাজী নিশ্চিন্ত হলেন। সঙ্গীতা ও রাজেশ খুশী হল। ডক্টর ভাটনাগর দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'গুড়িয়া এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।'

গুড়িয়া পরের রোববার সকালেই পাইনের জঙ্গলের ধারে ক্যানভাস নিয়ে আবার বসল ছবি আঁকতে। ওর প্রিয়জনকে দেবার জন্য মনের মত একটা ছবি।

নিউ জার্সি। রাত দশটা।

বিছানায় রাগের তলায় ঢেউ তুলছে সুমিত ও রঞ্জনা। পাশে ফোন বেজে উঠল। সুমিত হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিল কানে।

'হু ইজ স্পীকিং প্লিজ ?'

'মে আয় স্পিক টু রানজানা ?' ভরাট পুরুষকণ্ঠ ওপারে।

সুমিত চিনতে পারল। বলল, 'হোল্ড অন প্লিজ—'

ঝুঁকে রঞ্জনার দিকে সে এগিয়ে দিল রিসিভার।

রঞ্জনা বালিশের ওপর ভর দিয়ে উঠে হাতে নিল রিসিভার। সুমিতের চোখের ইঙ্গিতে বুঝতে পারল কার ফোন। চোস্ত ইংরেজীতে বলল, 'রঞ্জনা বলছি।'

'কার্লো !' ভরাট গলা বলল ওপার থেকে—'খবর আছে তোমার জন্য।'

'খুঁজে পেয়েছ ?' রঞ্জনার উদগ্রীব প্রশ্ন।

'কার্লোর চোখ স্টেট্স-এ কেউ এড়াতে পারে না, হনি ! তোমার দেওয়া ছবির সাথে মিলিয়ে নিও !'

'কোথায় আছে ?

'একেবারে তোমার নাকের ডগায়।—ব্রুক্স-এ।'

'ব্রুক্স ! নিউইয়র্ক !' রঞ্জনা হাঁস ফাঁস করে উঠল।

'ইয়েস হনি, তোমাদের ইণ্ডিয়ান এক স্মাগলিং পার্টির খালি ফ্ল্যাটে মৌজ করছে।'

'কার স্মাগলিং পার্টি ?'

'ওই সব চুনোপুঁটির নাম মনে থাকে না। ওর পুরনো কোনো ইয়ার—আরো শুনবে, তোমার স্যাঙ্গাত বিয়ে করবে খুব শিগ্গির। এক আমেরিকান ছুঁড়িকে। গ্রীন কার্ডের জন্য।'

ফোঁস করে উঠল রঞ্জনার বুক। অস্থির কণ্ঠে বলল, 'ঠিকানাটা দাও কার্লো !'

'দেবো হনি। হাতে হাতে।' ভরাট গলাটা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'কাল সন্ধ্যের পর এস !'

রঞ্জনা উত্তেজনায় উঠে বসেছিল বিছানায়। একটা জোর নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ঠিক আছে, কাল যাবো কার্লো।'

রিসিভারটা সুমিতের দিকে এগিয়ে দিল রঞ্জনা।

সুমিত ওটা যথাস্থানে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় আছে ?'

রঞ্জনা থমথমে স্বরে বলল, 'ব্রুক্স্-এ। ঠিকানাটা কাল পাওয়া যাবে। এবার আমি অরবিন্দকে বোঝাবো, আমাকে চীট করার পরিণতি কি হতে পারে ?...বিয়ে করবে ? গ্রীন কার্ডের জন্য ?—দিচ্ছি আমি বিয়ে !'

রঞ্জনার হিংস্র, ক্রুর মুখের দিকে তাকিয়ে সুমিত রাগটা টেনে নিল আবার গায়ে।

তামিয়া। বিকেল পাঁচটা।

অফিস থেকে ফিরে কোয়ার্টারের দরজা খুলে মনীশ দেখল বাইরের ঘরে সেণ্টার টেবিলের ওপর কাগজে মোড়া ঢাউস একটা প্যাকেট পড়ে আছে।

বিস্মিত পায়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল মনীশ। প্যাকেটের ওপর বাঁধা দড়ি ও কাগজ খুলে দেখল, এতদিন পাইনের জঙ্গলের ধারে বসে যে ছবিটা আঁকছিল গুড়িয়া, সেটাই সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো।

ফ্রেমটা টেবিলের ওপর দাঁড় করাল মনীশ। মৌলী লেকের ধারে পূর্ণিমার আলোয় তুষার শৃঙ্গ। আকাশে পূর্ণ চাঁদ। লেকের নিস্তরঙ্গ জলে তার প্রতিচ্ছবি। নীল সাদা আর হলুদের সংমিশ্রণে চাঁদনি রাতের অপূর্ব এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে গুড়িয়া। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছবিখানা হাতে তুলে ভাল করে দেখতে গেল মনীশ। কি যেন পড়ল নীচে। মনীশ তাকিয়ে দেখল একটা কার্ড।

ছবিখানা টেবিলে নামিয়ে মনীশ ঝুঁকে কার্ডটা তুলে নিল মেজে থেকে। দুপাতার ভাঁজ করা কার্ড। ওপরে ছোট্টো একটা ছবি। মৌলী লেকের ওপর ঝড় বৃষ্টির রাতের দৃশ্য। গুড়িয়ার আঁকা। বিদ্যুতের ঝলকানিতে যেন বিদীর্ণ আকাশ। অস্পষ্ট চাঁদ। উত্তাল লেকের জলে তার ভগ্ন প্রতিচ্ছবি। ছবির নীচে সাদা অংশে সুন্দর মেয়েলী হাতে লেখা—

যখন আমার ভুবনখানি ভাঙল ঝড়ে,

প্রথম পাতাটা উল্টে পরের পাতায় মনীশ দেখল, লেখা—

তুমি এসে দিলে সব সুধায় ভরে।

তার নীচে ফ্রেমের বড় ছবির হুবহু একটা অনুলিপি। সৌম্য তুষার শৃঙ্গ। টলমলে পূর্ণ চাঁদ। নিস্তরঙ্গ লেক।

একেবারে নীচে লেখা—'তোমাকে, গুড়িয়া।'

ছবির ফ্রেম দেয়ালের সেই শূন্য পেরেকে ঝুলিয়ে দিল মনীশ। তারপর কার্ডটা হাতে নিয়ে সামনে সোফায় বসল। বসে বসে নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগল একবার দেয়ালের ছবি আরেকবার কার্ডের তলায় লেখা—তোমাকে, গুড়িয়া।

সে রাতে বহুক্ষণ ঘুম এল না মনীশের।

গুড়িয়া এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ও যে পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে মনীশও তা বুঝতে পারে। ডক্টর ভাটনাগর তো আগেই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু গুড়িয়াকে সুস্থ করতে গিয়ে যে এক নতুন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সেটাই মনীশকে এখন বিচলিত করছে ভীষণ।

গুড়িয়া মনীশকে ভালবাসে। তার প্রমাণ ওর ছবির সঙ্গে পাওয়া আজকের কার্ডখানা। আরো কত ভূরি ভূরি প্রমাণ যে মনীশ পায় রোজ অফিস থেকে ফিরে সেটা এখন অনুভব করছে মনীশ। এই কোয়ার্টারের একটা চাবি সঙ্গীতাভাবীর কাছে আছে। গুড়িয়া সেই চাবি নিয়ে রোজ মনীশের কোয়ার্টার সুন্দর করে গুছিয়ে

রাখে। মনীশ আসার আগেই। ডাইনিং টেবিলে ফ্ল্যাস্কে করে রাখে চা। নতুন নতুন কিছু খাবার। অফিস থেকে কোয়ার্টারে ফিরে প্রতিটি ঘরে মনীশ পায় গুড়িয়ার ছোঁয়া, গুড়িয়ার সুবাস।

গুড়িয়ার এই অপ্রত্যক্ষ উপস্থিতি মনীশের মনেও কি ভাললাগার জন্ম দেয়নি? মনীশ নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পায়। এর সূত্রপাত বহুদিন আগেই হয়েছে। তিল তিল করে ওর মনের গহনে. শুধু সবার অগোচরে নয়. মনীশেরও অগোচরে। অফিসের জানলা দিয়ে গুড়িয়াকে নিয়মিত লক্ষ্য করতে করতে কবে যে এর শুরু মনীশ নিজেই জানে না।

কিন্তু এই ভাললাগার জন্য চিন্তিত নয় মনীশ। কারণ মনীশ জানে গুড়িয়াকে ভাল লাগলেও তাকে সে ভালবাসতে পারে না। অরবিন্দ-রূপে, মিথ্যে পরিচয়ে এই ভালবাসার পথ অবরুদ্ধ। মনীশের চোখে যদিওবা সে ভালবেসে থাকে গুড়িয়াকে সেই মনীশের কোনো অস্তিত্ব নেই তামিয়ায়। যে মনীশের অস্তিত্ব আছে, সে নিঃস্ব অসহায়। ভালবাসার সামর্থ্য নেই তার। তাকে চেনেওনা গুড়িয়া।

নিষ্ঠুর বাস্তব কোনোরূপেই কোনোমতেই ভালবাসার অধিকার দেয়নি মনীশকে। মনীশ এ জন্য প্রস্তুত। মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

কিন্তু গুড়িয়াকে ভালবাসতে না পারলেও তাকে সে দুঃখ দিতে পারবে কি? পারবে ওর মনের একটি মর্মঘাতী ক্ষত এত যত্ন করে সারিয়ে তুলে আবার আরেকটি ক্ষত সৃষ্টি করতে? তাহলে কী হবে গুড়িয়ার ভালবাসার পরিণতি? এই ভালবাসার প্রতিদানে কী দেবে তাকে মনীশ?

মনীশ ভাবতে পারল না। কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। এই নতুন পরিস্থিতি মনীশের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে এক নতুন মাত্রা যোগ করল আজ।

সারা মুখে গভীর চিন্তার রেশ নিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল মনীশ। তখন প্রায় শেষরাত।

নিউইয়র্ক। সময় সকাল।

আজীজের ফ্ল্যাটে অরবিন্দ ও জেন রাতভর সরীসৃপের মত পড়ে ছিল বিছানায়. এখন জেন্ শুয়ে আছে, অরবিন্দ ঢুকেছে বাথরুমে।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী জেন্ নিউইয়র্কের নিষিদ্ধ জগতের এক লাস্যময়ী নারী। সৌন্দর্যে পুরোপুরি না হলেও দেহের গঠনে বহু পুরুষের চোখে আকর্ষণীয়া। আজীজের স্মাগলিং দলের জবরদস্ত এক মক্ষীরাণী সে। অরবিন্দ আমেরিকান নাগরিকত্বের জন্য জেন্‌কে খুব শীঘ্রই খাতা-কলমে বিয়ে করবে। আজীজের মধ্যস্থতায় তিন হাজার ডলারে রফা হয়েছে এই বিয়ের। নির্দিষ্ট সময়ের পর আবার ওদের ডিভোর্স হয়ে যাবে। অর্থাৎ অরবিন্দ গ্রীন কার্ড হাসিল করার পর। এই বিয়ে ছাড়াও আইনের আরো কিছু মারপ্যাঁচ আছে। সেগুলোর জন্য আরো কিছু খরচ লাগবে।

অরবিন্দ বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। বাইরে বেরনোর জন্য পোশাক পরে সে

প্রস্তুত। বিছানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি উঠবে জেন্। আমি একটু বেরুচ্ছি।'

'যাও!' জেন্ আধবোজা চোখে তাকাল। ওর জড়ানো স্বর। দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'আমি পরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরুবো।'

'ঠিক আছে!' অরবিন্দ বাইরের ঘরের দিকে এগোলো।

সে মুহূর্তে কলিং বেল বেজে উঠল সুর করে।

জেন্ চোখ মেলে তাকাল। অবাক দৃষ্টি। এই খালি ফ্ল্যাটে কে এল আবার?

অরবিন্দ ঢুকল লিভিং রুমে। বাইরের দরজা খুলে সে আরো অবাক। সামনে ট্রাউজার ও শার্ট পরে রঞ্জনা দাঁড়িয়ে। 'তুমি!'

'আকাশ থেকে পড়লে?' রঞ্জনা বাঁ হাতের চেটো দিয়ে ওর চিবুক ঘষে ঢুকে পড়ল ঘরে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল পেছনে। কোমর সোজা করে রঞ্জনা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'এটা নিউ ইয়র্ক অরবিন্দ, কলকাতা নয়। তোমার আজীজ না শামিম কেউ এখানে তোমাকে বাঁচাতে পারবে না!'

মুহূর্তের ধাক্কাটা সামলে নিল অরবিন্দ। দরজার পাশের দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে বলল, 'কি চাও তুমি? এখানে এসেছ কেন?'

'এসেছি পাখি ধরতে।' রঞ্জনা অরবিন্দর পাশ কাটিয়ে আরো ভেতরে এগিয়ে এল। ট্রাউজারের ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল, 'পাখি আমার খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল অরবিন্দর। দেয়াল থেকে সরে ব্যাঙ্গের স্বরে বলল, 'সব পাখি পোষার নয় রঞ্জনা। এবার বোধহয় ভুল করে কোনো বাজ পাখি নিয়ে এসেছ।'

'আমি বাজপাখীও পুষতে জানি।' রঞ্জনা তড়িৎগতিতে পেছন ফিরল।

অরবিন্দ বিস্ময়ের ঘোরে দেখল, রঞ্জনার ডান হাতে পিস্তল।

'কি হচ্ছে রঞ্জনা!' অরবিন্দ অবিশ্বাসের চোখে তাকাল।

'কি হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছ।' রঞ্জনা পিস্তলটা দুলিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, 'নিউ ইয়র্কের জিনিস। কলকাতার টোটা বন্দুক নয়।'

'হোয়াট ডু ইয়ু ওয়ান্ট?' অরবিন্দর উত্তেজিত স্বর, 'কিসের জন্য এসেছ এখানে?'

'ফর টুয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার। তোমাকে স্টেট্স্-এ নিয়ে এসেছি। তুমি এক মাস ছিলে আমাদের কাছে। তার খরচ বাবদ টাকাটা আমার চাই।'

'টুয়েন্টি থাউজেণ্ড ডলার! আর ইয়ু ম্যাড? অত টাকা আমি পাব কোথায়?'

'ব্যাংকে, হুণ্ডিতে তুমি কত টাকা নিয়ে এসেছ, আমি জানি, হনি।' রঞ্জনা ভুরু টানটান করে বলল, 'তা ছাড়া আজিজ তোমার দোস্ত। এইটুকু পুঁজি যোগাড় করা তোমার পক্ষে কিছুই নয়। টাকাটা আমার চাই।'

অরবিন্দ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'সাহিল বাজাজকে সর্বস্বান্ত করেও তুমি খুশী হওনি ?'

'আচ্ছা !' রঞ্জনার চোখে বিস্ময়ের ঝিলিক। —'তুমি তাহলে সাহিলের লোক ?'

'আমি কারো লোক নই।' অরবিন্দ রঞ্জনার হাতে উদ্যত পিস্তলের দিকে তাকিয়ে এবার সহজ হওয়ার চেষ্টা করল. 'রঞ্জনা, আমরা একটা পার্টনারশিপে আসতে পারি। ধরো আমি যদি তোমাদের সাহায্য করি ? আরো অনেক সাহিল বাজাজ যোগাড় করতে ?'

'না ডার্লিং !' রঞ্জনার গম্ভীর স্বর—'তোমার সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই। আপাতত আমার টাকাটা চাই। যা আছে এখন মানে মানে দিয়ে দাও। কুড়ি হাজারের বাকীটুকু আমার ঠিকানায় পরে পৌঁছে দিও।'

'এখন আমার কাছে একশ ডলারও নেই।' অরবিন্দরও গম্ভীর স্বর।

'চলো দেখব !' রঞ্জনা পিস্তল নাড়িয়ে রুক্ষ স্বরে বলল, 'তোমার স্যুটকেশ, জিনিসপত্র কোথায় ?'

অরবিন্দ কথা বলতে বলতে বারবার আড় চোখে বেডরুমের দরজার দিকে তাকাচ্ছিল। জেনকে যে কোনো মুহূর্তে আশা করছিল সে। কিন্তু অরবিন্দ তখন জানে না, জেন অনেক আগেই উঁকি মেরে দেখে নিয়েছে রঞ্জনাকে। ভারতীয় মেয়েটিকে দেখেই ঘটনা জটিল ভেবে সে দ্রুত জামা-কাপড় পরে সটকে গেছে পেছনের দরজা দিয়ে।

'কুইক !' রঞ্জনা পিস্তলটা বিপজ্জনক ভাবে দুলিয়ে আবার কর্কশ স্বরে বলল, 'আমি তোমার স্যুটকেশ দেখতে চাই !'

অরবিন্দ লক্ষ্য করল, রঞ্জনার চোখে প্রতিহিংসার আগুন। অদ্ভুত এক আক্রোশের ঘোর। বাধ্য হয়ে সে এগোলো বেডরুমের দিকে। হাতে পিস্তল নিয়ে ওকে অনুসরণ করল রঞ্জনা। যেতে যেতে বলল. 'অরবিন্দ এখানে দেশী চালাকি করতে যেও না। তোমার আজীজের মত দশটা দলকে পিষে মারতে পারে এমন লোক আমার হাতে আছে। সেই দিয়েছে তোমার ঠিকানা। অতএব সব নগদ দিলেই ভাল। বাকী বেশী রেখো না। হয়ত ওই আজীজকে দিয়েই বাকীটুকু পাঠাতে হবে তোমাকে।'

অরবিন্দ বেডরুমে ঢুকল। বিছানায় জেন নেই। তাকাল আশে-পাশে। তারপর নীরবে ওয়াল কেবিনেটের দিকে এগোলো। পেছনে রঞ্জনা। কেবিনেটের পাল্লা খুলে অরবিন্দ ওর স্যুটকেশটা খুলতে গেল।

'না !' পিস্তলের বাঁটটা অরবিন্দর পিঠে ঠেকিয়ে বাধা দিল রঞ্জনা—'ওটা বাইরে নিয়ে এস ডার্লিং। বিছানার ওপর রাখো। যা করবে আমার চোখের সামনে। যাতে একটু এদিক-ওদিক হলেই ট্রিগারটা টিপতে পারি।'

অরবিন্দ জোর একটা শ্বাস নিল। তারপর তাই করল। স্যুটকেশটা নিয়ে এল বিছানায়।

স্যুটকেশের পাল্লা খুলে অরবিন্দ হাতড়াতে লাগল ভেতরটা।

রঞ্জনার গাঢ় দৃষ্টি। গাঢ় স্বরে বলল, 'যা আছে বের করো। নোট, ট্র্যাভেলার্স চেক সব।'

অরবিন্দ প্রথমে ট্র্যাভেলার্স চেকের বইগুলো বের করে রাখল বিছানার ওপর। তারপর কড়কড়ে ডলারের তোড়াগুলো। ডলারের নোটগুলো হাতে নিতে নিতে এক ফাঁকে তার নীচে যে স্প্রিং লাগানো ছুরিও নিল সেটা রঞ্জনার চোখে পড়ল না। রঞ্জনার দৃষ্টি তখন কত ডলার সুটকেশ থেকে বেরোচ্ছে শুধু তার ওপর।

দু হাতে ডলারের নোটগুলো নিয়ে ফিরে দাঁড়াল অরবিন্দ। বলল, 'এখন এই আছে আমার রঞ্জনা।'

রঞ্জনা কাঁধের ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল বিছানার ওপর। নির্দেশের সুরে বলল, 'নোট-গুলো আগে ভরো এতে।'

অরবিন্দর হাত ভরা নোট বলে রঞ্জনা মুহূর্তের জন্য শিথিল হয়েছিল। পিস্তলটা একটুর জন্য নামিয়েছিল নীচে। অরবিন্দ ছাড়ল না এই সুযোগ। যেন বিছানার দিকেই ঘুরছে এমন ভাব দেখিয়ে অতর্কিতে একটা লাথি কষাল রঞ্জনার পিস্তল ধরা হাতে। পিস্তলটা ছিটকে পড়ল রঞ্জনার পেছনে। অরবিন্দর ডান হাতে সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিং খোলা ছুরিটা সাপের ফণার মত বেরিয়ে এল। কিন্তু তার আগেই রঞ্জনা পিস্তলটা ধরার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে পেছনে। অরবিন্দও লাফ মারল। রঞ্জনা পিস্তল ধরার আগে ওর বুকে বসিয়ে দিল ছুরি। মুহূর্তে রক্তে ভিজে গেল রঞ্জনার পোশাক।

'ইয়ু বাসটার্ড—' রঞ্জনা হাঁপাতে হাঁপাতে লুটিয়ে পড়ল কার্পেটে।

অরবিন্দ ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে। ওর উত্তেজিত বুক। কিন্তু শান্ত চোখ। সরীসৃপের মত স্থির চোখে অরবিন্দ দেখল, ওর পায়ের কাছে আরেকটি সরীসৃপের মাথা তখন ধীরে ধীরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ঢলে পড়েছে এক দিকে। ছুরিটা বুকের মোক্ষম স্থানে ঢুকে ছিল।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে অরবিন্দ বেড সাইড কেবিনেটের কাছে এল।

রামের একটা বোতল ছিল সেখানে। ছিপি খুলে গলায় ঢকঢক করে ঢেলে নিল অনেকটা। তারপর আবার তাকাল কার্পেটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে থাকা নিষ্প্রাণ রঞ্জনার দেহটার দিকে। বোতল রেখে এবার বিছানার কাছে এগিয়ে এল অরবিন্দ। খোলা সুটকেশের জিনিসপত্র বিছানায় নামিয়ে সুটকেশটা সম্পূর্ণ খালি করল। ওয়াল কেবিনেটের কাছে গেল তারপর। পাল্লা খুলে বের করল আরেকটা সুটকেশ। নিয়ে এল বিছানায়। সেটায় ভর্তি পোশাক। পোশাকগুলো বিছানায় বের করে বোতলের বাকীটুকু রাম ঢেলে দিল গলায়।

সব শেষে পা বাড়াল কিচেনের দিকে। বড়ো ধারালো ছুরির জন্য।

তার ঠিক দু ঘন্টা পর অরবিন্দ ম্যানহাটানে আজীজের গারমেন্ট এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের অফিসে গিয়ে হাজির। এই অফিস আজীজের আইন মাফিক ব্যবসার দপ্তর। এর আড়ালেই ওর বেআইনি লেনদেনের সব কারবার।

অরবিন্দ শান্ত পায়ে আজীজের চেম্বারে প্রবেশ করে ওর সামনের চেয়ারে বসল। ধীর কণ্ঠে বলল, 'আজীজ, আমি ইণ্ডিয়ায় ফিরে যেতে চাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ?

'ফি.র যাবি !' আজীজ হতবাক। বিস্মিত স্বরে বলল, 'কেন, তুই নাকি এখানে সেট্‌ল্‌ করতে এসেছিস !'

'হ্যাঁ এসেছিলাম –' অরবিন্দ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'তবে এবার সম্ভব নয়। আবার আসতে হবে।'

আজীজ তাকাল। কিছু বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'কবে যেতে চাস ?'

'আজ। আজকের কোনো ফ্লাইটে।'

কি ব্যাপার বলতো ? আজীজের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। 'আজকেই ফিরবি, কারণ ?

'কারণ আমি পরে জানাচ্ছি তোকে।' অরবিন্দ চোয়ালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'তুই আগে ফোন কর। দেখি আমার যাওয়ার কি ব্যবস্থা হয়।'

আজীজ ওর রিভলভিং চেয়ারে দুলতে দুলতে বলল, 'অনেক বেশী পড়ে যাবে। ডাইরেক্ট কোনো ফ্লাইট যদি না পাওয়া যায়, ঘুরে যেতে হতে পারে। দু-তিনটে এয়ার লাইন্সে বেশ কয়েকটা পয়েন্টে কানেকটিং ফ্লাইট ধরতে ধরতে '

যাবো ! এ্যানি হাউ আয় হ্যাভ টু রিচ ইণ্ডিয়া অ্যাট আর্লিয়েস্ট।'

আজীজ অরবিন্দর চোখে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফোনের দিকে ঘুরল।

কারো সঙ্গে কথা বলে রিসিভার নামিয়ে বলল 'হয়ে যাবে। একটু পরে জানাচ্ছে কোন ফ্লাইট। তুই তৈরী আছিস তো ?'

'হ্যাঁ, একেবারে তৈরী।' অরবিন্দ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন। শিথিল হল ওর শরীর।

'বায় দি বায়।' আজীজ বলল, 'কিছুক্ষণ আগে জেন্‌ ফোন করেছিল।'

অরবিন্দ আবার শক্ত হল। রুদ্ধশ্বাস স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলেছে ?'

'বলল, তোর নাকি ভারতীয় বৌ এসে ঝামেলা করেছে ফ্যাটে ? তাই ও কেটে পড়েছে ওখান থেকে।'

যাক্‌ নিশ্চিন্ত হল অরবিন্দ। জেন্‌ তাহলে খুন করতে দেখেনি ওকে।

আজীজ জিজ্ঞেস করল, 'কে এসেছিল ফ্ল্যাটে ?'

'রঞ্জনা।' অরবিন্দ বলল।

'রঞ্জনা ?'

'ওই যে বেশ্যা মাগীটা ! যার কথা বলেছিলাম তোকে।'

'ও—' মাথা ঝাঁকাল আজীজ, 'কেন এসেছিল ?'

অরবিন্দ সিদ্ধান্তটা নিয়েই এসেছে এখানে। আজীজকে সব কথা সে খুলে বলবে। ওকে খুলে বলা যায়। কারণ আজীজও খুনী। এবং ওর একটি খুনের অরবিন্দ নিজে সাক্ষী। সব চেয়ে বড় কথা-এজন্যই বলবে, এখন একমাত্র আজীজ ওকে বাঁচাতে পারে।

অরবিন্দ তারপর আজীজকে সব বিশদভাবে বলল।

আজীজ শুনে গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। আগে নিজের অবস্থানটা সে ভেবে দেখল। কারণ খুনটা হয়েছে ওর মালিকানার একটা ফ্ল্যাটে। তবে খুন করে ইণ্ডিয়ায় পালিয়ে যাচ্ছে অরবিন্দ। ঘটনাটা আজীজের জানার কথা নয়। তাছাড়া জেন্‌ও এ বিষয়ে কিছু জানে না। অথচ সে গত কাল ওই ফ্ল্যাটে অরবিন্দর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। মোদ্দা কথা, পরিস্থিতি যা, আজীজকে কিছু না জানিয়েই খুনী পালিয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে আজীজের করার কিছু নেই। অরবিন্দ যে ওকে ঘটনাটা বলেছে তার কোনো সাক্ষী নেই। প্রমাণও থাকছে না। কিন্তু অরবিন্দ খুনী তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে, থাকবে।

'লাশ কোথায় ?' সবশেষে জিজ্ঞেস করল আজীজ।

'দুটো স্যুটকেশে কিছু পাথরের সঙ্গে ভরে ফেলে দিয়ে এসেছি লং আইল্যাণ্ডের জলে।'

'অরবিন্দ' আজীজ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'খুন করে আমি ইণ্ডিয়া থেকে পালিয়ে বেঁচেছি বলে ভাবিস না তুই এখান থেকে পালিয়ে বাঁচবি। দুই পুলিশে অনেক তফাৎ।'

'জানি।' অরবিন্দ থমথমে স্বরে বলল, 'কিন্তু এ মুহূর্তে পালাতে আমাকে হবেই।'

'নিশ্চয়ই।' আজীজ মাথা দুলিয়ে বলল, 'এবং এ ব্যাপারে আমি তোকে সাহায্যও করব। বাঁচার চেষ্টা পরে। কিন্তু এখানে পুলিশ যদি কোনো সূত্রে আমার ফ্ল্যাটে ধাওয়া করে—'

অরবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল 'তুই ঘটনার কিছু জানিস না—'

'আলবৎ। আমি সেকথাই বলতে চাই—' আজীজ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি ঘটনার কিছু জানি না। কিন্তু তুই যে ওই ফ্ল্যাটে ছিলিস, গত রাতেও ছিলি তার সাক্ষী জেন্ মনে রাখিস!'

'সাক্ষী শুধু জেন্ নয় তুইও।' অরবিন্দ বলল, 'কারণ ফ্ল্যাটটা তুই দিয়েছিলি। কিন্তু আমাকে নয় একে।'

অরবিন্দ পকেট থেকে উইগ আর চশমা পরা মনীশের একটা ছবি বের করে আজীজের সামনে রাখল।

আজীজের কপালে ভাঁজ পড়ল। ছবিটা হাতে তুলে দেখল ভাল করে।

'অনেকটা তোর মত দেখতে।' আজীজ ভুরু কুঁচকে তাকাল, 'কে লোকটা ?'

'এর সম্বন্ধে ডিটেলসে জানার প্রয়োজন নেই। জেনে তোর কোনো লাভও নেই। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, ছেলেটা আমার নামে আমারই ছদ্মবেশে ভারতবর্ষের কোনো জায়গায় চাকরী করছে।'

'তোর নামে! তোর ছদ্মবেশে ?' আজীজের হেঁয়ালীর স্বর, 'আর তুই জানিস ?'

'হ্যাঁ, আমিই সাহায্য করেছি ওকে চাকরীটা নিতে।' অরবিন্দ বলল, 'কারণ ওটা আমার পড়ে পাওয়া চাকরী। ভাবলাম, পরে ছোঁড়াটাকে ব্ল্যাকমেল করা যেতে পারে। ওর একটা ছোটো বোন আছে। শুনেছি সুইট সিকস্টিন। সেই ভেবেই ওকে ছদ্মবেশ পরিয়ে ছবিটা তুলে নিয়েছিলাম। সেটা যে এভাবে কাজে লাগবে ভাবতে পারিনি।'

'কি বলতে চাস তুই ?' আজীজ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

এই ছোঁড়া আমার এখানে আসার দু'মাস আগে থেকে চাকরীটা করছে। আমি এখন সেখানে গিয়ে ওর বদলে চাকরীটা করব। তাহলে আমি যে স্টেট্স্-এ এসেছিলাম তার কোনো প্রমাণ থাকবে না।'

'কেন তোর পাসপোর্ট, প্লেনের টিকিট ?'

'পাসপোর্ট চুরি হয়ে গেছে। ইণ্ডিয়াতে পুলিশের কাছে আমি সে ভাবেই ডায়েরী করব।'

'আচ্ছা ! তার মানে তোর পাসপোর্ট চুরি করে, তোর ছদ্মবেশে এই ছেলেটি এখানে এসেছিল ?'

'হ্যাঁ, রঞ্জনাকে এই খুন করেছে। তোর আর জেন্-এর সঙ্গে এখানে এরই যোগাযোগ হয়েছে। আমার নয়।' অরবিন্দ বেশ সহজ স্বরে বলল, 'তুই আর জেন্ এক সাক্ষী দিলে রঞ্জনার দোসর সুমিত যদি কিছু গড়বড়ও করে ধোপে টিকবে না।'

আজীজ সেই মুহূর্তে কিছু বলল না। ভাবল কিছু।

অরবিন্দ ঝুঁকে অসহায় স্বরে বলল, 'আজীজ, ঘটনা এভাবেই সাজাতে হবে। এ ছাড়া এখন উপায় নেই।'

আজীজ মনীশের ছবির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ যে তোর নামে তোর ছদ্মবেশে এখনো চাকরী করছে এ ব্যাপারে তুই সিওর ?'

ড্যাম সিওর !' অরবিন্দ দৃঢ় স্বরে বলল, 'ভারতবর্ষে চাকরীর কি অবস্থা তুই জানিস না ? আমার নামে যে ছেলেটা চাকরী নিতে বাধ্য হয়েছে সে চাকরী ছেড়ে যাবে কোথায় ?'

আজীজ আবার মনীশের ছবির দিকে তাকাল। ভাবতে ভাবতে বলল, 'ছবি যা দেখছি যে কেউ ধোঁকা খেয়ে যেতে পারে। আর জেন্-এর কাছ থেকে দু হাজার ডলার ফেরত না নিলে ও রাতকে দিন বানিয়ে ছাড়বে। কিন্তু পুলিশ যখন এই ছেলেটিকে ধরবে ?'

'কাকে ? একে ?' অরবিন্দ মনীশের ছবিটা ইঙ্গিত করে তির্যক ভঙ্গীতে হাসল, 'পেলে তো ধরবে ? তার আগেই আমি ওকে খতম করে ফেলব। ছেলেটা আছে পাহাড়ে। ওই পাহাড়ে আমিও একবার কাজ করেছি। ওখানে লাশ হাপিশ করা কোনো—'

ফোন বেজে উঠল টেবিলে। আজীজ রিসিভার তুলে নিল কানে।

'ইয়েস—ও. কে. ওয়ান মিনিট প্লিজ, লেট মি নোট ডাউন দ ফ্লাইট নম্বর অ্যাণ্ড টাইম—'

অরবিন্দ হাল্কা হাতে প্যাড ও পেন এগিয়ে দিল আজীজের দিকে।

কলকাতা। দুপুর বারোটা।

আজ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরনোর দিন।

লীলা ঘরের মধ্যে ছটফট করছে : গায়ত্রী খাটে হাঁটু ছড়িয়ে বসে।

লীলাকে এ ঘর ও ঘর করতে দেখে গায়ত্রী বলল, 'যা না, বড় রাস্তায় এতক্ষণ রেজাল্ট নিশ্চয়ই এসে গেছে। দেখে আয়।'

'না, আমার ভয় করছে ভীষণ!' লীলা খোলা দরজার দিকে মুখ কাচুমাচু করে তাকাল. 'তাছাড়া প্রবীরদা আমাকে বেরোতে বারণ করেছে। রেজাল্ট নিয়ে যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে।'

'তাহলে এত দেরি করছে কেন।' গায়ত্রীর চোখে চিন্তার রেশ, 'একটা তো বাজে।'

তার মিনিট দশেক পর এক হাতে রেজাল্টের বুলেটিন আরেক হাতে মিষ্টির বাক্স নিয়ে ঝড়ের বেগে ঢুকল প্রবীর। ঢুকেই 'হুররে' বলে একটা চিৎকার করে বুলেটিন আর বাক্সটা খাটের ওপর রেখে গায়ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মাসীমা, লীলা তিনটে লেটার পেয়েছে! সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্ট মার্কস!'

লীলার মুখ অসীম খুশীতে ভরে উঠল। হাত দুটো বুকের ওপর তুলে নিজের উত্তেজনা প্রশমিত করল সে। তারপর পাশের ঘরে ছুটল বাবার ছবিতে প্রণাম করতে।

গায়ত্রী নামল খাট থেকে

লীলা ফিরে আসতে প্রবীর মিষ্টির বাক্সটা খুলে একটা সন্দেশ বের করে বলল, 'আয় লীলা। তোর আগে মিষ্টি মুখ করা উচিত, পরিশ্রম তো তোর।'

'আহা, আর তোমার পরিশ্রম হয়নি বুঝি!' লীলা হেসে বলল, 'আগে তুমি খাও।'

গায়ত্রী হেসে ঠাকুরের বেদীর দিকে যেতে যেতে বলল, 'লীলা কাকাবাবুকে প্রণাম করে আয়। তারপর দাদাকে—'

'মনীশকে আমি টেলিগ্রাম করেই আসছি মাসীমা।' প্রবীর সঙ্গে সঙ্গে বলল।

'তাই?' লীলার চোখ মুখ খুশীতে উছলে উঠল—'কখন করলে?'

'এই তো আসার পথে। সেজন্যেই দেরি হল।'

গায়ত্রী প্রবীরের দিকে তৃপ্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করতে মাটিতে বসল হাঁটু ভেঙে।

সেই ফাঁকে প্রবীর ও লীলা পরস্পরকে সন্দেশ খাওয়াতে ব্যস্ত হল। তারপর বাক্সটা খাটের ওপর রেখে লীলা বলল, 'মা তুমি একটা সন্দেশ খেও। আমরা কাকাবাবুর কাছ থেকে আসছি।'

দুজন দ্রুত পায়ে বেরলো বাইরে।

রাস্তায় যেতে যেতে লীলা বলল, 'জানো, দাদা এই রেজাল্ট নিয়ে এলে প্রথমে কি করত ?'

'কি করত ?' জিজ্ঞেস করল প্রবীর।

'আমায় জাপটে একেবারে শূন্যে তুলে ধবত।'

প্রবীর তাকাল লীলার চোখে। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'আমিও তুলে ধরব। আগে তোর ওপর অধিকারটা অর্জন করে নি।'

'ইস্, আমার বি কম পাশ করার আগে হচ্ছে না বলে দিচ্ছি!'

'তুই যদি ডক্টরেট করা অব্দিও বলিস, আমি অপেক্ষা করব লীলা।' প্রবীর যেন মিনতির স্বরে বলল কথাটা।

'সত্যি ? লীলা মুখে হাত চেপে হাসতে হাসতে আরেকটা হাত প্রবীরের দিকে এগিয়ে দিল। প্রবীব ধরল হাতটা। ওরা হাত ধরে এগিয়ে চলল গলি দিয়ে।

তামিয়া। সময় দুপুর।

সোধাব ইণ্ডিয়ার অফিস। জেনাবেল ম্যানেজার মিঃ সুন্দরমের চেম্বারে অ্যাডমিনি-স্ট্রেটিভ অফিসাব সাকসেনা সাহেব প্রবেশ করলেন।

'কাম আন! সিট ডাউন মিঃ সাকসেনা।' সেক্রেটেরিয়ট টেবিলে ব্যস্ত মিঃ সুন্দরম মুখ তুলে সামনের চেয়ারে বসতে নির্দেশ দিলেন তাকে।

সাকসেনা সাহেব বসলেন চেয়ারে।

মিঃ সুন্দরম হাতের চিঠিগুলো দেখে সই সবুদ করে একটা ফাইল সামনে টেনে চেয়ারে গা এলিয়ে বললেন, 'ইয়োর অ্যাসিস্টেণ্ট মিঃ সেন হ্যাজ অ্যাপ্লাইড ফর লিভ ফ্রম সিক্সথ জুলাই টু ফোর্টিনথ জুলাই ?'

ইয়েস স্যাব ?'

'ফাইলটা আপনি পাঠিয়েছেন, বাট ইয়ু হ্যাভ নট রেকমেণ্ডেড হিজ লিভ—?'

'নো স্যার।' সাকসেনা সাহেব ঝুঁকে বললেন, 'বাবোদিন ছুটির মধ্যে শুরুতেই ন'দিন ছুটি নেওয়া কোম্পানীর পক্ষে ক্ষতিকর হবে।'

'দ্যাটস্ রাইট।' মিঃ সুন্দরম ফাইলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তবে মিঃ সেন তাঁর অসুস্থ মাকে দেখতে যাচ্ছেন। তিনি লিখেছেন, শি ইজ ক্যানসার পেশেণ্ট। ইয়ু সুড হ্যাভ কনসিডরড হিজ কেস।'

'স্যার—' সাকসেনা সাহেব মুখে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসি নিয়ে বললেন, 'আয় রিসিভ সো ম্যানি লিভ অ্যাপ্লিকেশনস। কারণ অনেকে অনেক রকম লেখে কিন্তু কোনটা সত্যি— '

ইয়েস্ দ্যাট ইয়ু নো বেটার দ্যান মি অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার।' একটু বিরতি নিয়ে মিঃ সুন্দরম বললেন, 'কিন্তু মিঃ সেনকে কি বিশ্বাস করা যায় না ?'

সাকসেনা সাহেব নিরুত্তর।

মিঃ সুন্দরম চেয়ারে সোজা হয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে বললেন, 'মিঃ সাকসেনা, আমি কিন্তু আপনার অ্যাসিস্টেণ্ট সম্বন্ধে আদার সোর্স থেকে রিপোর্ট অন্য রকম

পাচ্ছি। বিশেষ করে ফ্যাক্টির সব ফোরমেনদের ধারণা, গত চার মাসে যে প্রোডাকশান বেড়েছে, বহু ইরেগুলার ওয়ার্কার রেগুলার হয়েছে, অনেকের মধ্যে কাজের উৎসাহ বেড়েছে, সব নাকি মিঃ সেনের জন্য।'

'স্যার—' সাকসেনা সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, 'সেন যে মেথডে ইরেগুলার ওয়ার্কারদের রেগুলার করছে সেটা আমার মতে স্থায়ী হতে পারে না। দিস ফেস উইল গো ফর দ টাইম বিয়িং। পরে আবার যে কে সেই হতে বাধ্য।'

'মিঃ সাকসেনা —' জেনারেল ম্যানেজার সুন্দরম আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মিঃ সেন আসার আগে আপনি অনেককে বরখাস্ত করেছেন। অনেক মেমো দিয়েছেন, তাতে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি!'

'কোম্পানীর কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আছে, আমি যা করেছি অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট!'

'আয় ডোন্ট বিলিভ, মিঃ সেন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস-এর বাইরে কিছু করছেন। তিনি যে প্রসেসে লেবারদের বেগুলার করেছেন সে খবরও আমার কাছে আছে।' 'মিঃ সুন্দরম এবার কর্তৃত্বের স্বরে বললেন, 'একটা কথা মনে রাখবেন মিঃ সাকসেনা। এটা শিমলা নয় বা দিল্লী নয়। ইট ইজ মোস্ট ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া ইন এভরি রিসপেক্ট এবং ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া বলেই কোম্পানী এখানে কারখানা খোলার লাইসেন্স পেয়েছে। লোকাল পিওপলদের মানসিকতা বুঝে আমাদের চলতে হবে। ডু ইয়ু নো, যে হেড অফিস রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস তৈরী করেছে সেই হেড অফিস থেকে এই চার মাসের প্রোডাকশান লিফটের জন্য আমি কংগ্রেচুলেটিং রিমার্কস পেয়েছি? এবং এটা যার জন্য সম্ভব হয়েছে তার ছুটি আমি মঞ্জুর করবই।'

মিঃ সুন্দরম তারপর মনীশের ছুটির অ্যাপ্লিকেশনের ফাইলটা সই করে সাকসেনা সাহেবের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

সাকসেনা সাহেব থমথমে মুখে ফাইলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার থেকে।

তামিয়া। রাত দশটা।

রাজেশদের কোয়ার্টারে এ মুহূর্তে পরিবেশ খুব গম্ভীর। বাইরের ঘরে সঙ্গীতা ও গুড়িয়া পাথরের মত বসে। দুজনেরই চিন্তিত ও থমথমে মুখ। মনীশ অফিস থেকে বেরিয়ে কারখানায় কোনো এক শ্রমিকের সঙ্গে তার গ্রামে গেছে, এখনো ফেরেনি।

এই পাহাড়ী এলাকায় রাত দশটা গভীর রাত। এত রাতে এখানে পাহাড়ী পথে স্থানীয় বাসিন্দারাও চলাফেরা করে না। পাহাড় বেষ্টন করে এই সব পথ যেমন সরু তেমন দুর্গম। তার ওপর পাশে গভীর খাদ। জঙ্গলের ঘন গাছ-গাছালির জন্য আকাশে চাঁদের আলো থাকলেও বেশীর ভাগ পথ অন্ধকারময়। ওপরে তুষার শৃঙ্গের বরফগলা জল সারাদিনে নীচে গড়িয়ে এই সব পথ বিকেলের পর আরো পিচ্ছিল করে দেয়। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে একবার কেউ পিছলে খাদে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য।

এই সব দুশ্চিন্তায় সঙ্গীতা ও গুড়িয়া দুজনেই তখন বিচলিত। চিন্তার ঘোরে

কারো মুখে কোনো কথা নেই। শুধু গুড়িয়া মাঝে মাঝে সোফা থেকে উঠে সামনের জানলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠায় গেটের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার ফিরে এসে বসছে সঙ্গীতার পাশে। ওর অবস্থা খুবই শোচনীয়। প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখ।

বাইরে গেট খোলার শব্দ হল। দুজনেই সোফা থেকে উঠে ছুটে গেল দরজায়।

রাজেশ কারখানায় খোঁজ-খবর নিতে গিয়েছিল। ফিরছে একা।

'কি হল ?' রাজেশ ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করল সঙ্গীতা।

ক্লান্ত রাজেশ একটু জিরিয়ে নিয়ে বলল, 'ধারান গাঁওয়ে গেছে। এখান থেকে বেশী দূরে নয় মনে হচ্ছে আটকে গেছে।'

'গেল কেন ওখানে ?' সঙ্গীতা আবার জিজ্ঞেস করল।

'ধারানে আজ দুপুরে আগুন লেগে কিছু ঝুপাড় জ্বলে গেছে।' রাজেশ জবাব দিল, 'আমাদের এক ওয়ার্কারের একটি শিশু পুড়েছে তাতে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার কথা।'

'তুমি হাসপাতালে গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ। সেখানেও নেই।' রাজেশ সোফায় বসল।

গুড়িয়া সব একাগ্র মনে শুনে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। শিক ধরে আবার তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

সঙ্গীতা ও রাজেশ ওকে লক্ষ্য করে পরস্পরের দিকে চাইল।

রাজেশ উঠে গুড়িয়াকে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। সঙ্গীতা ইশারায় বাধা দিল ওকে। ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে চোখের ইঙ্গিতে বোঝালো, এখন কিছু বলতে গেলেই গুড়িয়া ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবে।

রাজেশ আবার নিঃশব্দে বসে পড়ল সোফায়। তারপর গুড়িয়াকে শোনানোর জন্যই জোর গলায় সঙ্গীতাকে বলল, 'যে লোকটির সঙ্গে গেছে সে সহজে ছাড়বে না অরবিন্দকে। এত রাতে ওকে নিশ্চয়ই আসতে দেয়নি—'

'আমারও তাই মনে হয়।' সঙ্গীতা বলল, 'অরবিন্দ হয়ত কাল সকালে ফিরবে। সেটা একদিক দিয়ে ভাল।'

তখনই বাইরে আবার শব্দ হল।

সঙ্গীতা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকাল—'ওই তো এসে গেছে !'

গুড়িয়া জানলা দিয়েই দেখেছিল। মনীশ গেট খুলে ভেতরে ঢুকে কোয়ার্টারের দিকে আসছে। জানলা থেকে সরে সে ধীর পায়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

রাজেশ ও সঙ্গীতা দুজনেই তাকাল ওর যাওয়ার দিকে।

মনীশ ক্লান্ত পায়ে ঢুকল ঘরে।

সঙ্গীতা উদগ্রীব কণ্ঠে বলল, 'অরবিন্দ ভাই —'

'ভেরী সরি ভাবী—' মনীশ কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'এত দেরি হবে ভাবতে পারিনি।'

'দেরি হল কেন ?' জিজ্ঞেস করল রাজেশ।

'ধারানে আমাদের এক ওয়ার্কারের একটি বাচ্চা আগুনে পুড়ে গেছে।'

হ্যাঁ শুনেছি।' রাজেশ বলল, 'তাকে আনতেই তো গিয়েছিলে তুমি!'

'এ মুহূর্তে আনার মত অবস্থা নয়।' মনীশ বলল, 'ভাগ্যিস ডক্টর ভাটনাগরের কাছ থেকে কিছু ওষুধ-পত্র নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই দিয়ে ড্রেস করে রেখে এসেছি। কাল ওরা নিয়ে আসবে।'

'তা তো আনবে।' সঙ্গীতা বলল, 'কিন্তু এদিকে তোমার চিন্তায় আমাদের কি অবস্থা, ভেবেছ একবার?'

'ভেবেছি ভাবী।' মনীশ নত স্বরে বলল, 'কিন্তু তখন আমি নিরুপায়। আরো কিছু আহত বাচ্চা ছিল। তাদেরও ফার্স্ট এইড করে এলাম।'

সঙ্গীতা বলল, 'ঠিক আছে। এখন, পাশের ঘরে যাও। একটু কথা বলে এস!'

'পাশের ঘরে!' মনীশ বুঝতে না পেরে তাকাল।

'গুড়িয়া!' সঙ্গীতা বলল, 'এতক্ষণ এ ঘরে বসে তোমার অপেক্ষায় কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছিল। তাকানো যাচ্ছিল না মুখের দিকে। একটু যাও, আশ্বস্ত কর ওকে।'

মনীশ রাজেশের দিকে তাকাল।

রাজেশও গম্ভীর ভাবে ইশারা করে ওকে পাশের ঘরে যেতে বলল।

মনীশ আড়ষ্ট পায়ে এগোলো ভেতরের দরজার দিকে।

ঢুকে দেখল, গুড়িয়া সঙ্গীতাদের বিছানায় এক কোণে নত মুখে বসে আছে। কালো গম্ভীর চেহারা।

মনীশ পাশে গিয়ে দাঁড়াল। 'গুড়িয়া—'

গুড়িয়া সাড়া দিল না। মুখ তুলে তাকালও না।

মনীশ আরো কাছে গিয়ে বলল, 'আমার দেরি কেন হল, তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই

গুড়িয়া কিছু বলল না। বিছানা থেকে উঠে জানলার পাশে গিয়ে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। মনীশ পলকের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল গুড়িয়ার সারা মুখ শ্রাবণের কালো আকাশের মত থমথমে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল মনীশ। তারপর সেখানে দাঁড়িয়েই বলল, 'ধারানের লোকেরাই আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে। তাছাড়া রাস্তাও এমন কিছু বিপজ্জনক নয়—'

হঠাৎ গুড়িয়া ঘুরে তাকাল। তারপর মুখ নামিয়ে অপ্রত্যাশিত অনুযোগের সুরে বলল, 'এখানে আপনি একা বলে, ভেবেছেন চিন্তা করার কেউ নেই আর?'

মনীশ অবাক হয়ে দেখল, গুড়িয়ার চোখ ভর্তি জল। থতমত খেয়ে বলল, 'না তা তো ভাবিনি আমি!'

গুড়িয়ার অভিমান তখনো কাটেনি। মুখ নামিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'যদি বাড়ি হত, এভাবে না বলে এই পাহাড়ী পথে এত রাতে ফিরতে পারতেন?'

গুড়িয়ার চোখের জল চোখের সীমানা পেরিয়ে আসছে। মনীশ এগোলো। গুড়িয়ার

দু' কাঁধে গাঢ় হাত রেখে অবেগমথিত স্বরে বলল, 'না পারতাম না। এখনো আর পারব না। এবার থেকে দেরি হলে তোমাকে বলে যাবো। হল তো ?'

'না !' নত মুখে গুড়িয়া প্রায় নির্দেশের স্বরে বলল, 'প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এত রাতে কোথাও আর যাওয়া হবে না।'

'বেশ, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাব না।' মনীশ হেসে বলল, 'ঝুঁকি না থাকলে যাবো তো ?'

গুড়িয়া মুখ তুলে তাকাল। ওর সিক্ত চোখে শিশির ভেজা ঘাসে ভোরের রোদের মত হাসি।

বাইরে কারখানায় রাত দশটার ডিউটির সাইরেন বেজে উঠল হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেল মনীশ। গুড়িয়ার কাঁধ থেকে হাত দুটো নামিয়ে সরে এল দূরে। ক্ষণিকের আবেগের পরিবেশটা বাস্তবের আঘাতে চুরমার হয়ে গেল। মনীশ আজ বিকেলেই অফিস থেকে ওর ছুটি মঞ্জুরীর চিঠিখানা পেয়েছে। আর পনেরো দিন পর মনীশ বাড়ি ফিরবে। মা ও লীলার মাঝে যাওয়ার জন্য এখন আকুল ওর মন। কিন্তু এ মুহূর্তে গুড়িয়ার জন্যেও কেন যেন ভীষণ বিষণ্ণ লাগছে ওর। একটু আগে সেদিনের স্বপ্নটা মনে পড়ে গিয়েছিল মনীশের। গুড়িয়া যেদিন বেহুঁশ হল, ঘুমের ওষুধের ঘোরে দেখেছিল যেটা মা, লীলা ও গুড়িয়াকে নিয়ে। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই। কোনোদিন এ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে না। মাও লীলার সাথে গুড়িয়ার দেখা হবে না কখনো। কারণ মা মনীশের, লীলা মনীশের বোন। আর গুড়িয়ার পরিচয় অরবিন্দের সঙ্গে। যতটুকু যা সম্পর্ক অরবিন্দ সেনের সাথে হয়েছে তার। মনীশের সাথে নয়। মনীশের জীবনে কোনোদিনই গুড়িয়া আসবে না।

মনীশ সংযত কিন্তু বিমর্ষ পায়ে বাইরের ঘরের দিকে এগোলো।

গুড়িয়া মনীশের আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

শিমলা। দুপুর এগারোটা দশ।

কালকা শিমলা প্রথম ছোটো ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করল সকাল এগারোটায়। জুনের শেষ, টুরিস্টের বেশী ভিড় নেই। যাত্রীদের মধ্যে বেশীর ভাগ স্থানীয় লোক।

একটি সেকেন্ড ক্লাস কামরা থেকে সব যাত্রী নামার পর অরবিন্দ নামল। অরবিন্দের পরনে এখন সাদা চোস্ত পাজামা সাদা কুর্তা। মাথায় খাদির গান্ধী টুপি। বলা বাহুল্য নিজেকে একটু আড়ালে রাখার জনাই এই বেশ ধারণ করেছে সে।

প্ল্যাটফর্মে নেমে চশমার ফাঁক দিয়ে এদিক ওদিক তাকাল অরবিন্দ। তারপর গেল গেটের দিকে। ওর কাঁধে একটা ছোটো ব্যাগ। ব্যাগটা সামলে ভিড়ের মধ্যে মিশে বাইরে বেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে হাঁটা দিল সে।

তামিয়া। দুপুর বারোটা পঞ্চাশ।

মনীশের টেবিলে ফোন বেজে উঠল। মনীশ নোট লিখতে লিখতে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিল কানে।

'অরবিন্দ একবার নীচে আসবে।' ওপারে শর্মাজীর গলা— 'পোস্ট অফিসে। সুখবরটা তাহলে তোমার হাতে হাতে দেব।'

'কিসের সুখবর শর্মাজী?' মনীশ জিজ্ঞেস করল।

'তুমি এস না নীচে। জানতেই পারবে।'

'আসছি।' মনীশ রিসিভার নামিয়ে হাতের কাজটা সেরে উঠে দাঁড়াল।

শর্মাজী মনীশের অপেক্ষাতেই বসে ছিলেন।

মনীশ পোস্ট অফিসে ঢুকতে বাঁ হাতটা তুলে আনন্দের আন্তরিক অভিব্যক্তি নিয়ে বললেন, 'এস, এস অরবিন্দ। তুমি যে কত খুশী হবে আমি জানি।' মনীশ পাশে যেতেই বাঁ হাতে ড্রয়ার খুলে টেলিগ্রামের খামটা এগিয়ে দিলেন ওর দিকে।

মনীশ খামটা উৎসুক দৃষ্টিতে হাতে নিয়ে ভেতরের কাগজখানা খুলে দেখল, প্রবীরের পাঠানো টেলিগ্রাম। লেখা : লীলা হাই ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছে।

উচ্ছ্বাসে প্রায় ফেটে পড়ল মনীশের মুখ। আনন্দে শর্মাজীর বাঁ হাত খানা জড়িয়ে ধরে বলল, 'শর্মাজী, সত্যিই আমার জীবনের মস্ত বড় সুখবর। এ সময় আমি বাড়িতে নেই। মা আর লীলা কত যে আনন্দ করছে—'

'এটাও তোমার বাড়ি অরবিন্দ।' শর্মাজী মৃদু হেসে বললেন, 'আমরাও কি কম আনন্দিত। রাজেশ, সঙ্গীতা আর গুড়িয়া শুনে কত আনন্দ পাবে দেখো। তাছাড়া দুদিন পর মা আর বোনকে তো এখানেই নিয়ে আসতে হবে তোমায়।'

'হ্যাঁ।' শর্মাজীর শেষ কথাটা শুনে মনীশের উচ্ছ্বসিত মুখ একটু নিস্প্রভ হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, 'শর্মাজী, আমি রাজেশভাইয়াকে গিয়ে খবরটা দি—'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!'

রামস্বরূপবাবু কাউন্টার থেকে ঘুরে বললেন, 'সেনসাহেব, মিষ্টি কখন খাব?'

'কিসের মিষ্টি?' টিফিন ক্যারিয়ার হাতে ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল গুড়িয়া।

উধো সিং ঘরের কোণে চিঠির ওপর সীলমোহর মারতে মারতে বলল, 'সাহেবের বোন পাশ করেছে দিদিমণি—'

গুড়িয়া উচ্ছ্বসিত মুখে তাকাল মনীশের দিকে।

শর্মাজী বললেন, 'ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে। হাই ফার্স্ট ডিভিসন।'

গুড়িয়া বাবার ইঙ্গিতে মনীশের হাতে টেলিগ্রামটা দেখে ছুটে এল ভেতরে। টিফিন ক্যারিয়ারটা টেবিলের ওপর রেখে মনীশের কাছে গেল। 'দেখি দেখি—!'

মনীশ একটু এগিয়ে দিতেই গুড়িয়া টেলিগ্রামটা প্রায় ছোঁ মেরে হাত থেকে নিয়ে খুলে পড়ল।

'ইস্, কি দারুণ! কত ভাল বোন আপনার! কি সুন্দর পাশ করেছে। আনন্দের আতিশয্যে গুড়িয়া টেলিগ্রামের কাগজটা হাতের মুঠোয় প্রায় মুচড়ে ফেলল। পর মুহূর্তেই খেয়াল হল ওর। মুঠোটা খুলে অপ্রস্তুত চোখে তাকাল মনীশের দিকে।

'পাপাজী— !' গুড়িয়া কাঁদো কাঁদো মুখে বাবার টেবিলের কাছে এসে দলা করা কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই দেখো কি অবস্থা করেছি কাগজটার।'

শর্মাজী কাগজের গোলাটা দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন। গুড়িয়া আরো অপ্রস্তুত হল।

মনীশ মৃদু হেসে এগিয়ে এল। কাগজের দলাটা তুলে যত্ন করে খুলতে খুলতে বলল, 'কিছু হয়নি। খবর তো পেয়ে গেছি। কাগজের অবস্থা যাই হোক।'

মনীশ কাগজের দলাটা খুলে টেলিগ্রামটা টেবিলের ওপর রেখে টান টান করল।

গুড়িয়ার মুখে হাসি ফুটল আবার। খোলা টেলিগ্রামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লীলাকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। নিয়ে আসুন না এবার।'

মনীশ ম্লান স্বরে বলল, 'মায়ের চিকিৎসা চলছে। এখন আনা যাবে না।'

গুড়িয়া ভাবনার ঘোরে বলল, 'আপনার মাকেও ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে।'

'আমি আসছি শর্মাজী।' এত আনন্দের মধ্যেও কালো থমথমে মুখে মনীশ বেরিয়ে গেল পোস্ট অফিস থেকে। গুড়িয়া একবার তাকাল ওর মুখের দিকে।

উধো সিং এর মধ্যে একটা চেয়ার গুড়িয়ার পেছনে রেখে টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে।

গুড়িয়া চেয়ারে বসে টিফিন ক্যারিয়ার খুলতে খুলতে বলল, 'পাপাজী, আপনার অরবিন্দ মাঝে মাঝে কেমন যেন হয়ে যায়।'

কেমন ?' শর্মাজী তাকালেন।

'হঠাৎ গম্ভীর। হঠাৎ ভাবুক।' গুড়িয়া হাত নেড়ে বলল, 'কেমন যেন বুঝি না।'

'মা ও বোনকে ছেড়ে এত দূরে থাকে, সেজন্যেই।' শর্মাজী বললেন, 'ওদের চিন্তা আসে মনে।'

'তা অবশ্য ঠিক।' শূন্যের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তির স্বরে বলল গুড়িয়া, 'তার ওপর মায়ের অমন অসুখ!'

মনীশের চিন্তায় গুড়িয়ার মুখ মুহূর্তের মধ্যে কাতর হয়ে উঠল। ভাবনা ছেড়ে তারপর বাবাকে খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

শিমলা-মাণ্ডি বাসটা টোঙ্গীতে এসে দাঁড়াল বিকেল চারটে দশে।

তিনজন যাত্রী নামল। অরবিন্দ নামল সব শেষে। দরজা বন্ধ হল বাসের। বাস আবার এগিয়ে চলল গন্তব্য স্থলের দিকে।

অরবিন্দ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে চারপাশটা ঘুরে দেখল একবার। এগিয়ে গেল কোণের একটা পান-সিগারেটের দোকানের দিকে।

এক প্যাকেট উইলস ফিল্টার কিনল অরবিন্দ। প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরিয়ে দোকানীকে জিজ্ঞেস করল, 'এখান থেকে তামিয়া কি করে যাওয়া যায় ?'

'তামিয়া যাবেন বাবু ?' দোকানী সামনে নদীর ব্রিজের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, 'ও দেখুন জীপ ডাড়িয়ে আছে। বিশ টাকা নেবে একজনের।'

'কতক্ষণ লাগবে ?' অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল।

'ঘণ্টা ভর।'

'জীপ পাওয়া যাবে কতক্ষণ ?'

'সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচ পর্যন্ত পাবেন বাবু।'

অরবিন্দ মাথা ঝাঁকিয়ে ব্রিজের উল্টোদিকে পা বাড়াল। যেতে যেতে ব্যাগের ভেতর নতুন সিগারেটের প্যাকেটটা ঢুকিয়ে রাখল সে। ব্যাগে পাসপোর্ট, টুকিটাকি ছাড়া বাড়তি একপ্রস্থ জামা-কাপড় আছে। এক পাইণ্ট রাম আছে। আর আছে সেই স্প্রিং-ছুরিটা। যেটা দিয়ে রঞ্জনাকে সে খুন করেছে।

টোঙ্গীতে সামান্য বসতি। তিন চারটে দোকান। দোকানগুলো একদিকে পাহাড় ঘেঁষে। উল্টোদিকে ধাপে ধাপে গ্রামের কিছু বাড়ি, ক্ষেত-খামার খাদের ঢালে নেমে গেছে। মাঝখানে এই বাস রাস্তা।

অরবিন্দ চায়ের দোকানটায় ঢুকল। চাটাইয়ের ছাউনি, কাঠের বেড়া। ভেতরে তিনটে নড়বড়ে বেঞ্চ। একেবারে ভেতরে ঢুকে আধো অন্ধকারে বসল অরবিন্দ। এখানে কিছুক্ষণ চা-টা খেয়ে, ঘুরে ফিরে অন্তত পাঁচটা অব্দি কাটাতে হবে।

তামিরায় সন্ধ্যের অন্ধকারে পেঁছিতে চায় অরবিন্দ।

তামিরা। বিকেল পাঁচটা।

রাজেশ কোয়ার্টারে ফিরে দেখল সঙ্গীতা ও গুড়িয়া রান্নাঘরে এলাহী খাবার বানাতে ব্যস্ত।

'কি ব্যাপার ? আবার কোনো অনুষ্ঠান আছে নাকি ?' রাজেশ রান্নাঘরে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করল।

'কেন, তুমি শোনোনি রাজেশভাইয়া ?' গুড়িয়া হামালদিস্তায় চিনি পিষতে পিষতে ঘুরে বলল, 'লীলা ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছে। মিষ্টি খেতে চাইছে সবাই। তাই লাড্ডু বানাচ্ছি।'

রাজেশ সঙ্গীতার দিকে চোখের ইশারা করে মুচকি হেসে বলল, 'মিষ্টি কার কাছে চাইছে, তোর কাছে না অরবিন্দর কাছে ?'

'আহা, আমার কাছে চাইবে কেন ?' গুড়িয়া ডান হাতের মুঠোয় কপালের চুল সরাতে সরাতে বলল, 'ও এত মিষ্টি পাবে কোথায় ? বেচারীর কেউ আছে এখানে ? পোস্ট অফিসে খাওয়াতে হবে। অফিসে খাওয়াতে হবে।'

'বেচারীর কেউ নেই এখানে ?' সঙ্গীতা কড়াইয়ের গরম তেলে বোঁদে ছাড়তে ছাড়তে কৌতুকের স্বরে বলল, 'তাহলে এত লাড্ডু হচ্ছে কি করে ?'

রাজেশ মৃদু হেসে বলল, 'তাইতো, কি করে হচ্ছে এত লাড্ডু ?'

সঙ্গীতা বলল, 'আমার মাথায় কিন্তু আসেনি ব্যাপারটা। গুড়িয়াই দুপুরে এসে বলল, লাড্ডু বানাতে হবে। তারপর নিজেই বাজারে ছুটল বেসন আর চিনি আনতে।'

গুড়িয়া রাজেশ ও সঙ্গীতার দিকে তাকিয়ে ওদের সংলাপের ইঙ্গিত বুঝতে পারল। মুখ নামিয়ে আবার পেষাই শুরু করল সঙ্গে সঙ্গে। মুখে সলজ্জ হাসি।

সঙ্গীতা গুড়িয়ার কাছে এসে ওর নত মুখের দিকে ঝুঁকে বলল, 'বেচারীর এখানে আর কেউ না থাকুক একজন আছে যে অরবিন্দর জন্য ওর বাড়ির মতই চিন্তা করে। তাই না রে গুড়িয়া?'

'ভাবী!' গুড়িয়া মুখ তুলে কপট রাগত দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর আরক্ত মুখে সঙ্গীতাকে জড়িয়ে মুখ লুকিয়ে নিল ওর বুকে।

সঙ্গীতা হাসতে হাসতে গুড়িয়ার পিঠে গাঢ় হাত দুটো বেষ্টন করে বলল, 'বড় ভাল মেয়ে! তেমনি ভাল ছেলে আমাদের অরবিন্দ।'

রাজেশও ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। রান্নাঘর থেকে বেরতে বেরতে বলল, 'আমি ক্লাবে যাচ্ছি। তোমরা লাড্ডু বানাও।'

সময় ছ'টা। টোঙ্গী-তামিবা হাইওয়ে।

পথে আধো অন্ধকারে আজকের শেষ জীপ ছুটে চলেছে। পাহাড়ী পথ বেয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে চড়াইয়ে উঠছে এখন।

জীপে যাত্রী মাত্র সাতজন। অন্য সময় পেছনে সামনে ঠেসেঠুসে এগারো বারোজনকেও তোলা হয়। অরবিন্দ ইচ্ছে করেই সামনে বসেনি। বসেছে পেছনে চারজন যাত্রীর সঙ্গে। তার কারণ, প্রথমত নিজের চেহারা এখানে সে বেশী প্রকাশ করতে চায় না। দ্বিতীয় কারণ, পাহাড়ী পথে গভীর খাদের ভয় ওর কাছে মারাত্মক। খাদের দিকে দৃষ্টি পড়লেই অরবিন্দর গা গুলোয় মাথা ঘোরে। পাহাড়, জঙ্গল, খাদ এমনিতেই ওর ভাল লাগে না। তার সাথে এই নির্জন পরিবেশ ওর মনে একটা অদ্ভুত আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

শরীরে ও মনে পাহাড়ের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্যেই অরবিন্দ এদিকে একবার চাকরী করতে এসে ফিরে গিয়েছিল কলকাতায়। সোয়াব কোম্পানীর চাকরী এজন্যে দুমাসের জন্যেও নিতে প্রস্তুত ছিল না সে। পাহাড়কে চিরকালের জন্য নিজের জীবন থেকে বিদায় জানিয়েছে অরবিন্দ। কিন্তু আজ ওকে বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে শুধু নিজেকে বাঁচাতে। রঞ্জনাকে খুন করে যে সঙ্গিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে পরিত্রাণ পাবার আর কোনো উপায় নেই বলে।

তবে এখানে সে এবারও চাকরী করবে না। অরবিন্দ অনেক ভেবে চিন্তে ওর পরিকল্পনা পালটেছে। আজীজকে যে ভাবে বলেছিল, এখন সে ঠিক ওই পথে যাবে না। ওর নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী মনীশের সঙ্গে আজ রাতে সে দেখা করবে। তারপর এই রাতের অন্ধকারেই মনীশকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে কলকাতার উদ্দেশ্যে। যদিও কলকাতায় শেষ পর্যন্ত মনীশ পেঁছিবে, না পেঁছিবে শুধু অরবিন্দ। মনীশ চিরকালের জন্য পড়ে থাকবে এই এলাকার কোনো অতল খাদে। যাওয়ার পথে এখানেই কোথাও ওকে হত্যা করবে অরবিন্দ। কোনো নির্জন জঙ্গলে খাদের পাশে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে, হয় ওকে ঠেলে ফেলে দেবে, না হয় আগে খুন করবে তারপর খাদে ছুঁড়ে দেবে ওর লাশ। খুন করার আগে একটা সাদা কাগজে মনীশকে দিয়ে সই করিয়ে নেবে

শুধু। পরে সেই কাগজে চাকরী ছাড়ার একটা চিঠি লিখে সোয়াব কোম্পানীর নামে কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেবে।

ব্যাস, অরবিন্দ যে গত ছ'মাস যাবৎ তামিয়ায় চাকরী করেছে তার প্রমাণ সোয়াব কোম্পানীর খাতায় পত্রে থেকে যাবে। রঞ্জনার খুনী হিসেবে নিউইয়র্ক থেকে যদি সমন আসে সোয়াব কোম্পানীর রেকর্ড তা নাকচ করে দেবে। নিউইয়র্কে মনীশ অরবিন্দ সেজে গিয়েছিল, তার প্রমাণ মনীশের অরবিন্দ রূপে তোলা ছবি আর থানায় অরবিন্দর পাসপোর্ট হারানোর রিপোর্ট। অরবিন্দ রূপী মনীশের ছবি যথা সময় বেনামী পোস্টে পুলিশের হাতে পেঁছে যাবে। তুরুপের তাস ছাড়বে আজীজ আর জেন্। মনীশের ছবি দেখে ওরা যখন সাক্ষ্য দেবে যে সেই গিয়েছিল নিউইয়র্কে আসল অরবিন্দ নয়।

টোঙ্গীতে কেনা সিগারেটের প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা বের করল অরবিন্দ। জীপের ভেতরে বসেই ধরাল সেটা। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবল, মনীশ এখন ওর কথা মত চলতে বাধ্য। কারণ মনীশ জানে ওর অবাধ্য হলে মনীশ শুধু চাকরী হারাবে না, অন্যের নামে চাকরী করার অপরাধে ওকে হাজতেও যেতে হবে। শাস্তি ভোগ করতে হবে দীর্ঘদিন জেলের অন্ধকারে।

কলকাতা। সন্ধে ছ'টা দশ।

দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনেই লীলা ছুটে এল দরজা খুলতে।

প্রবীর তখন রিকশা থেকে ছোটো বড় অনেক বাক্স, প্যাকেট নামাচ্ছে।

লীলা দরজা খুলে বলল, 'এত দেরি তোমার প্রবীরদা ?'

প্রবীর রিকশওয়ালাকে ভাড়া দিতে দিতে বলল, 'লিস্ট মিলিয়ে সব আনা। তারপর পাইকারী মার্কেটে কোনোদিন যাইনি তো—'

লীলা একে একে প্যাকেটগুলো ঢোকাতে শুরু করল ঘরে। প্রবীর ভাড়া মিটিয়ে সাহায্য করল ওকে।

ঘরের ভেতর সব জমা করা হল। গায়ত্রী বেরিয়ে এল পাশের ঘর থেকে। প্যাকেট বাক্সর স্তূপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এত সব কি রে ?'

প্রবীর বলল, 'অনেক কিছু আছে মাসীমা। পেন, পেনসিল, স্কেল, ইরেজার কালি—'

'তোমাকে সেদিন বললাম না মা।' লীলা বলল, 'প্রবীরদা একটা ব্যবসা শুরু করবে। স্টুডেন্ট হেল্পিং বক্স। আমি তার ম্যানুফ্যাকচারার। প্রবীরদা শুধু মার্কেটিং করবে।'

গায়ত্রী প্রবীরের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'খুব ভালো। করো বাবা। কিছু তো করতেই হবে।'

'প্রবীরদা।' লীলা ঘুরে বলল, 'লেবেল আর কার্টনগুলো কবে আসবে ?'

'কাল।' প্রবীর স্তূপ করা প্যাকেট, বাক্সগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'লীলা সব

পঞ্চাশটা করে আছে। তুই আজ যতটা পারিস ভাগ করে রাখ্। আমাকে এখন টিউশনে যেতে হবে। বাকীটা কাল একসঙ্গে করব।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও না!' লীলা প্যাকেটগুলো ধরে মেজেতে বসে বলল. 'আমি সব করে রাখব।'

'আসছি মাসীমা।' প্রবীর গায়ত্রীকে বলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

গায়ত্রী ঘাড় হেলিয়ে দরজা অব্দি এল। প্রবীর বড় রাস্তার দিকে চলে যেতে কপাট বন্ধ করে ঘুরে বলল. 'ওকে দেখলে শুধু মনীশের কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয় আমার দুই ছেলে। এক ছেলে চাকরী পেয়েছে। আরেক ছেলে এখনো লড়াই করে যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে মা—' লীলা প্যাকেটগুলো খুলতে খুলতে বলল, 'তোমার এক ছেলে চাকরী করবে, আরেক ছেলে করবে ব্যবসা। দেখো প্রবীরদাও দাঁড়িয়ে যাবে।'

অনুরাগ ও আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়ায় লীলার মুখের অপূর্ব আবেশটুকু লক্ষ্য করল গায়ত্রী। নিবিড় আনন্দে গায়ত্রীর চোখেও ফুটে উঠল তার প্রকাশ। লীলার কাছে এসে মেজেতে বসে বলল, 'বার কর্। আমিও একটু সাহায্য করি তোদের।'

লীলা খোলা প্যাকেটগুলো সাজাতে লাগল মায়ের সামনে।

তামিয়া। সন্ধ্যে ছ'টা পনেরো

মনীশ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল অফিস থেকে। আর কয়েকদিন পর ছুটিতে চলে যাচ্ছে বলে ওকে অফিসে বেশীক্ষণ থেকে কিছু ফাইল আগাম করে যেতে হচ্ছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অনেক কাজ। তারপর যা হয়, কারখানা, অফিসের কর্মচারী-ওয়ার্কারদের উন্নতি ও হিতের জন্য মনীশ নিজে থেকেই বেশী ও বাড়তি কিছু কাজ করে।

সারা অফিস এখন খাঁ খাঁ করছে। চারপাশ ফাঁকা নির্জন নিস্তব্ধ।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে অফিস কম্পাউণ্ডের গেটে এল মনীশ। টুলে বসা দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাল ওকে।

'কেমন আছো তারা সিং?' মনীশ ওর স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করল।

'ভালো হুজুর।' তারা সিংয়ের মুখে সরল হাসি। মাথা দুলিয়ে বলল. 'হুজুর, আপনি ছুটিতে যাচ্ছেন?'

'হুঁ্যা তারা সিং।' মনীশ জবাব দিল. 'দু হপ্তার জন্য।'

'আপনার মা বীমার?' তারা সিং স্বরে সমবেদনার রেশ নিয়ে বলল. 'আমি ঈশ্বরের কাছে দুয়া মাঙ্গছি হুজুর। আপনার মা যেন ভাল হয়ে যান।'

মনীশ মনের দুঃখ মুখে আর প্রকাশ করল না। তারা সিংয়ের পিঠে গাঢ় হাত রেখে বলল. 'আচ্ছা আসছি তারা সিং।'

'হুঁ হুজুর।'

মনীশ ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। মায়ের অসুখের কথা কিভাবে যেন চাউর হয়ে গেছে সারা তামিয়ায়। এবং সেটা যে কঠিন অসুখ তাও জেনে গেছে

সবাই। ছুটির দরখাস্তে লিখেছিল বলেই কি? নাকি রটেছে রাজেশভাইয়া সঙ্গীতা ভাবীর মাধ্যমে? কে জানে? সবাই ওকে সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে কারখানার শ্রমিকেরা। অফিসের আলোর পরিধি পেরিয়ে মনীশ কোয়ার্টারের দিকে যাবার আঁকা-বাঁকা পথটা ধরল।

আজ সকাল থেকে নীলাকাশের দেখা নেই। মেঘ থৈ থৈ করছে। দুপুরে বৃষ্টিও হয়েছে কিছুক্ষণ। ঠাণ্ডা ও অন্ধকার, দুটোই এখন চারপাশে জাঁকিয়ে পড়েছে বেশ। কোটের বোতামগুলো লাগিয়ে নিল মনীশ। আরো দ্রুত পায়ে হাঁটা শুরু করল।

আজ সারাদিন ধরে মনীশের অনুভূতিতে আনন্দের একটা ঢেউ বইছে। গতকাল বিকেলে ছুটির মঞ্জুরীর চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে শুরু হয়েছে এই ভাল লাগা। আজ দুপুরে লীলার পাশ করার টেলিগ্রামটা এসে ওকে আরো উথাল-পাথাল করে দিল। মা ও লীলার চিন্তায় এখন বিভোর মনীশ। লীলা এখন কলেজে পড়বে। ওর কতদিনের একান্ত কামনা। কলকাতায় যেতে যেতে লীলা হয়ত ভর্তি হয়ে যাবে কোনো কলেজে। গত ছ'মাস ধরে মায়ের চিকিৎসাও নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে চলছে। প্রবীর লিখেছে মায়ের শরীরের উন্নতি হয়েছে অনেক।

মোদ্দা কথা, ছ'মাস পর বাড়ি গিয়ে সবারই খুশী ভরা উজ্জ্বল মুখ দেখবে মনীশ। তাতে মনীশও ভীষণ খুশী হবে। কত ভাল লাগবে ওর। শুধু মনীশের মনের ভেতর তখন কাঁটা হয়ে বিঁধবে, এই চাকরী আর গুড়িয়া।

মনীশের বুক থেকে একটা ভারী নিশ্বাস বেরিয়ে এল। দেখতে দেখতে ছ'মাস প্রায় কাটতে চলেছে। এ ভাবে আর কত মাস কাটবে কে জানে? নিজের কিছু বিহিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই ওকে কাটাতে হবে। মনীশ এখন নিরুপায়। লীলার মুখের হাসি, মায়ের মনের খুশী ফিরিয়ে এনে আর সে ছিনিয়ে নিতে পারবে না কিন্তু গুড়িয়া? গুড়িয়াকে তো জেনেশুনে ঠকাতে পারবে না মনীশ।

গত ক'দিন ধরে গুড়িয়া ওর মনের অস্বস্তির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুড়িয়ার ভালবাসাকে এখনো প্রত্যাখান করেনি মনীশ, গ্রহণও করেনি। গুড়িয়াকে নতুন করে কোনো দুঃখ দিতে চায়না বলেই মনীশের এই দ্বিধা। কিন্তু খুব শীঘ্রই একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে মনীশকে।

ভাবতে ভাবতে নিজের কোয়ার্টারের রাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছল। বাঁক নিতে যাবে, হঠাৎ ওর মনে হল বাঁদিকে পাইনের জঙ্গলে সাদা পোশাক পরা কে যেন লুকিয়ে পড়ল। মনীশ ঘুরতে গিয়ে আরেকবার তাকাল পাইনের অন্ধকারে। কেউ নয়। চোখের ভ্রম বোধহয়। মনীশ ঘুরে পা বাড়াল ওর কোয়ার্টারের দিকে।

কলকাতা। সন্ধ্যে ছ'টা কুড়ি।

প্রবীর দোতলায় উঠে ইন্দ্রনাথবাবুর ফ্ল্যাটের কলিং বেল বাজাল। দরজা খুলল চাকর বিজয়। প্রবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও! মাস্টার মশাই। দেবাশীষ তো—'

বিজয় বাকীটুকু বলার আগে ভেতর থেকে ইন্দ্রনাথবাবুর গলা ভেসে এল, 'কে রে বিজয়—?'

'বাবু মাস্টার মশাই—' বিজয় পেছন ফিরে জবাব দিল।

'পাঠিয়ে দে!'

বাবুর হুকুম মত বিজয় সামনে থেকে সরে দাঁড়াল।

প্রবীর ভেতরে ঢুকে ইন্দ্রনাথবাবুর অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ইন্দ্রনাথবাবু টেবিলের ওপর খোলা আইনের ভারী বইখানা বন্ধ করে বললেন, 'এস প্রবীর। দেবাশীষ ওর মা'র সঙ্গে মাসীর বাড়ি গেছে। আমার এক শালা এসেছে বম্বে থেকে, তার সঙ্গে দেখা করতে।'

'আচ্ছা।' প্রবীর শুনে বলল, 'ঠিক আছে আমি তাহলে—'

'বসো!' ইন্দ্রনাথবাবু চেয়ারে গা এলিয়ে বললেন, 'ক'দিন ধরে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো করবো ভাবছি। সময়ই পাচ্ছি না।'

প্রবীর ধীর পায়ে টেবিলের কাছে এসে সামনের চেয়ারে বসে সপ্রশ্ন তাকাল।

'মনীশ এখন কোথায়?'

ইন্দ্রনাথবাবুর আকস্মিক প্রশ্নে প্রবীর একটু থতমত খেয়ে গেল। সামলে নিয়ে বলল, 'ও তো কাকাবাবু বিভিন্ন জায়গায় ঘোরা ফেরা করে। এখন ঠিক কোথায় জানিনা?'

'চাকরীটা করছে তো?'

'হ্যাঁ করছে।'

'কি রকম মাইনে-কড়ি জান?' ইন্দ্রনাথবাবু জিজ্ঞেস করেই বললেন, 'মানে, আমি জানতে চাই চাকরীটা ভাল কিনা।'

'হ্যাঁ ভা-লই।' প্রবীর আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'সেরকমই শুনেছি।'

'যাক্, ভাল হলেই আমি নিশ্চিন্ত।' ইন্দ্রনাথবাবু আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'আসলে কি জান, ক'দিন আগে একটা খবর শুনে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'কি খবর কাকাবাবু?' প্রবীর তাকাল।

'তুমি জানো, সোয়াব ইণ্ডিয়া লিমিটেড নামে এক কোম্পানীতে মনীশ ইন্টারভিউ দিয়েছিল?' ইন্দ্রনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ। অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের—'

'যা শুনলাম, ওই পোস্টের জন্য সিলেকটেড হয়েছিল মনীশ। চাকরীটা ওরই পাওয়ার কথা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোনো ভি. আই. পি'র ইন্টারভেনশনে সব পালটে যায়।'

'মনীশ সিলেকটেড হয়েছিল!' প্রবীর বিস্মিত স্বরে বিড়বিড় করে উঠল।

'হ্যাঁ!' ইন্দ্রনাথবাবু দুঃখসূচক ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বললেন, 'সোয়াব কোম্পানীর যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তিনি গত সপ্তাহে বলছিলেন সব। শুনে এতো দুঃখ পেলাম। মনীশ ভীষণ আশা করেছিল চাকরীটা। আর করবেই বা না কেন ওর সিলেকশনেই তো বুঝতে পারছি, ইন্টারভিউ কেমন দিয়েছিল সে।'

প্রবীর বিস্ময়ের আঘাতে মুহূর্তের জন্য নিথর হয়ে গেল। কোনো কথা বেরলো না ওর মুখ থেকে।

ইন্দ্রনাথবাবু একটা ঘন নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'থাক্, মনীশ যে ভাল চাকরী করছে শুনে ভাল লাগছে এখন—।'

কাকাবাবু—' প্রবীর ওর বুকের উত্তেজনা প্রশমিত করে শেষ পর্যন্ত না জিজ্ঞেস করে পারল না—'এরকম হল কেন? সিলেকটেড হল মনীশ, চাকরী পেল আরেকজন?'

'হল কেন?' ইন্দ্রনাথবাবু ম্লান হেসে বললেন, 'কোন্ দেশে জন্মেছ প্রবীর? জানাশোনা, পরিচিতির জন্য একটু ফেভার পাওয়ার রেওয়াজ নিশ্চয়ই সর্বত্র আছে। কিন্তু আমাদের দেশে হয় টাকার জোর, না হয় ক্ষমতার, এই দুটোর একটা পরশমণি কারো কাছে থাকলে তার যে কোনো ইচ্ছা পূরণ হবেই। মনীশের পরিবর্তে যে ওই চাকরীটা পেয়েছে তার কাছে ওই পরশমণি ছিল। বললাম না ভি. আই. পি. ইণ্টারভেনশন ।'

প্রবীরের চোখের সামনে সব কেমন যেন ওলট পালট হয়ে গেল। যে চাকরীটা পেয়েছে সে তো অরবিন্দ! আর যার চাকরীটা প্রাপ্য ছিল সে এখন গোপনে চোরের মত সেই চাকরী করছে! কিন্তু এসব কথা কি ইন্দ্রনাথবাবুকে এখন বলা যায়? বলে লাভ কি? মনীশ তো আর ওই চাকরী ফিরে পাচ্ছে না। অথচ ইন্দ্রনাথবাবু জানলেন, মনীশ একটা ভাল চাকরী করছে। বাস্তব যে কী সেটা মনীশ ছাড়া একমাত্র প্রবীর জানে।

ইন্দ্রনাথবাবু প্রবীরের থমকে যাওয়া মুখে চিন্তার রেশগুলো দেখে বললেন, 'প্রবীর মন খারাপ করে কোনো লাভ নেই। নেপোটিজম, ফেভারিটিজম ও আর কত ইজম এখন আমাদের সমাজের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি চারপাশে প্রতিটি স্তরে দেখো, টাকা আর জানাশোনা থাকলে সহজে কাজ হবে, তা নাহলে সব সেই গড্ডালিকায় ফেঁসে যাবে। এই নিয়ম মেনেই আমাদের চলতে হচ্ছে, চলতে হবে। কি করবে বল?'

'আচ্ছা কাকাবাবু—' প্রবীর বিষণ্ণ মুখে উঠে দাঁড়াল, 'আমি এখন চলি '

'হ্যাঁ এস প্রবীর।' ইন্দ্রনাথবাবু সামনের মোটা বইখানা আবার খুলতে খুলতে বললেন, 'মনীশ কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। বড় ভাল ছেলে মনীশ। তুমিও মনীশের মত। তাই তোমাকে কথাটা বললাম ডেকে।'

প্রবীর বিষাদগ্রস্ত পায়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। নেপোটিজম, ফেভারিটিজম এখন সমাজের একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই নিয়মের বলি হয় যারা, যাদের কাছে পয়সা ও পরিচিতির পরশমণিটি নেই, তারা কি চিরকাল বঞ্চিত হতে থাকবে? মনীশের জন্য বেদনায় ভরে উঠল প্রবীরের বুক।

মনীশ সেই বঞ্চিতদের মধ্যে একজন।

তামিয়া। সন্ধ্যে ছ'টা প'চিশ।

মনীশ কোয়ার্টারের দরজা খুলে চাবি প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে ভেতরে এল। বাতি জ্বালিয়ে বাইরের ঘরের অবস্থা দেখে সন্দেহ হল ওর। গুড়িয়া কি আজ আসেনি? ফ্ল্যাওয়ার ভাসে বাসি ফুল পড়ে। সোফা কোচ টেবিল সব আগোছালো।

দরজা বন্ধ করল মনীশ। বিস্মিত পায়ে পাশের ঘরে ঢুকল।

যা ভেবেছে তাই। গুড়িয়া আজ সত্যি আসেনি। ডাইনিং টেবিলে চায়ের ফ্লাস্ক নেই। নেই খাবারের প্লেট। কি হল তাহলে গুড়িয়ার? মনীশ চিন্তিত হল।

সঙ্গীতাভাবীর কাছে সে শুনেছে, গুড়িয়া রোজ তিনটে নাগাদ এই বাড়িতে আসে। এক ঘণ্টার মধ্যে সব গুছিয়ে চা তৈরী করে মনীশ আসার আগে চলে যায় বাবাকে আনতে। খাবারটা গুড়িয়া নিজের কোয়ার্টারে তৈরী করে সঙ্গে নিয়ে আসে। নতুন কোয়ার্টারে আসার পর থেকে গুড়িয়ার এই আসা-যাওয়া ছকে বাঁধা নিয়মের মত ঘটে চলেছে। আজ হঠাৎ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হল কেন?

চিন্তিত মনীশ চিন্তার ঘোরে ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে পড়ল। চিন্তার সাথে এ মুহূর্তে বিষণ্ণতারও সুর বাজছে ওর মনে। ঘরের ভেতর আজ গুড়িয়ার স্পর্শ, গুড়িয়ার সুবাস না থাকার জন্যই কি এই বিষণ্ণতা?

গুড়িয়াকে নিয়ে সেই অস্বস্তির কাঁটাটা আবার বুকের মধ্যে বিঁধছে এখন।

কলিং বেল বেজে উঠল সজোরে।

চেয়ার ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল মনীশ। নিশ্চয়ই গুড়িয়া। চাপা আনন্দ বুকে নিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে বাইরের ঘরে এসে দরজা খুলল।

কে?

মনীশের চোখ পাথরেব মত স্থির হয়ে গেল। এর চেয়ে নির্মেঘ নীল আকাশ থেকে ওর মাথায় যদি বাজও ভেঙ্গে পড়ত এতটা স্তব্ধ হত না।

'অরবিন্দ তুই!' মনীশ বাকশক্তি না হারিয়ে কোনোমতে যেন বলল কথাটা।

অরবিন্দও তখন মনীশকে দেখে হতবাক। মনীশের মাথায় উইগ, চোখে চশমা তো নেই! এ যে নির্ভেজাল মনীশ!

অরবিন্দ প্রথমে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করল। তারপর ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার মনীশ, তোর চশমা উইগ, গেল কোথায়?'

মনীশ তখন অরবিন্দকে দেখে সম্বিত প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। কোনো জবাব নেই মুখে। কোনো কথা নেই।

'আচ্ছা!' অরবিন্দ সোফার দিকে আসতে আসতে গম্ভীর স্বরে বলল, 'তাহলে, তুই এখন নিজের রূপেই অরবিন্দ হয়ে আছিস?'

মনীশ সম্মোহিতের মত মাথাটা নাড়ল। তারপর চরম বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে জিজ্ঞেস করল, 'অরবিন্দ, তুই কোত্থেকে আসছিস?'

'কলকাতা।' অরবিন্দর সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠ।

'অ্যামেরিকায় যাসনি?'

'না।' অরবিন্দ সোফায় ধপ্ করে বসে পড়ল। বগলের ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে বলল, 'মাম্মি ডিড নট অ্যালাউ মি। যেতে দিল না।'

মনীশের বুকে তখন দামামা বাজতে শুরু করেছে। চোখের সামনে শুধু বইছে অন্ধকারের ঢেউ। কি যে বলবে কিছু বুঝতে পারছে না।

অরবিন্দ ব্যাগের ভেতর থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও দেয়াশলাই বের করে বলল, 'বস্ মনীশ। দাঁড়িয়ে রইলি কেন?'

মনীশ ধীরে ধীরে সামনের কোচে বসল। নির্বাক, নিশ্চল।

অরবিন্দ একটা সিগারেট ধরাল। দেয়াশলাইয়ের কাঠিটা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'তোর এখানে অ্যাস্ট্রে নেই?'

গড়িয়ার আনা ঘর সাজানোর মত একটা অ্যাস্ট্রে ছিল। কাজে লাগে না বলে মনীশ ওটা কেবিনেটে ঢুকিয়ে রেখেছে। চটপট উঠে কেবিনেট থেকে বের করে অরবিন্দর সামনে টেবিলে রাখল।

অরবিন্দ হাতের কাঠিটা অ্যাস্ট্রেতে ফেলে পায়ের ওপর পা তুলে বলল, 'মনীশ, একটা প্রবলেমে পড়ে গেছি।'

অরবিন্দকে দেখে যে আতঙ্কটা মনীশের মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল সেটা এখন ধীরে ধীরে বিস্তার করে মনীশের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। মনীশ কিছু বলল না, শুধু তাকাল। শিকারীর দিকে তার শিকার যেমন তাকায়।

অরবিন্দ বলল, 'মাম্মির চোখ ফাঁকি দিয়ে আমি স্টেটস-এ যেতে পারলাম না। খুব শিঘ্রীও যেতে পারব না। মাম্মী জানে আমি এই চাকরীটা করছি। আমাকে তাই চাকরীটা করতে হবে।'

এরপর আর কি বলবে মনীশ। অরবিন্দরই চাকরী। সে ওকে দয়া করে ভিক্ষা দিয়েছিল। এখন যদি সে ফিরিয়ে নিতে চায়, ফিরিয়ে নেবে। এর ওপর মনীশের তো কোনো অধিকার নেই।

মনীশ অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

'এখন ব্যাপার হল—' অরবিন্দ অ্যাস্ট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল, 'চাকরীটা আমি করতে চাইলেই তো এ মুহূর্তে করা যাবে না। আজ অব্দি তুই অরবিন্দ রইলি কাল থেকে আমি সে চাকরী করব, তা হয় না। সম্ভব নয়। তোকেও আইনের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। আমি বাঁচতে পারি একটা কথা বলে, যে তুই আমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার চুরি করে এখানে এসে চাকরী করছিস।'

'চুরি?' মনীশের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল।

'ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ মনীশ।' অরবিন্দ সিগারেটে জোর টান দিয়ে বলল, 'আয় ওনলি মিন, কোনো কমপ্লিকেসি যদি হয় নিজেকে আমি বাঁচাতে পারব। কিন্তু তুই পারবি না। তুই কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবি না যে এই অ্যাপয়েণ্ট লেটার আমি তোকে দিয়েছি। দিলেও তুই চাকরীটা করতে যাবি কেন? অন্যের নামে চাকরী !'

মনীশের গলা শুকিয়ে এল। কি বলতে চায় অরবিন্দ?

অরবিন্দ বলল, 'অথচ বন্ধু হিসেবে তোকে আমার বাঁচানো উচিত। চাকরীটা যখন আমায় করতেই হবে, তোকে বাঁচাতে আমি একটা প্ল্যান ভেবেছি। তুই এই প্ল্যান মাফিক চলতে রাজি কি?

বুকে হাত দিয়ে কাসল মনীশ। কাশি থামিয়ে বলল, 'কি প্ল্যান বল্?'

'খুব কম কথায় বলছি। এখন হাতে সময়ও নেই বেশী।' অরবিন্দ ঝুঁকে

অ্যাস্‌ট্রেতে ছাই ঝেড়ে বলল, 'আমি যে জীপে করে টোঙ্গী থেকে এসেছি তার ড্রাইভারের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। তুই আর আমি কাল ভোর রাতে এখান থেকে বেরিয়ে যাব। তুই শুধু কোম্পানীর নামে লম্বা ছুটির একটা দরখাস্ত লিখে যাবি। —আমি তোর এই দরখাস্ত অনুযায়ী ছুটির পর এখানে এসে জয়েন করব।'

থামল অরবিন্দ। ঘরের মধ্যে অভিশপ্ত একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল।

মনীশের চোখে এক পলকের জন্য মা ও লীলার মুখ ভেসে উঠল। হাসি ছিল না এই মুখে, খুশীও ছিল না। কাল থেকে মনীশ আবার বেকার। সামনের অন্ধকারে এখন শুধু একটাই আলো, মনীশ ওর অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু এই আলো ওর ভবিষ্যতের অনিশ্চিত অন্ধকারের কলিমা সামান্যতমও দূর করবে না। অপরাধ দহন থেকে পরিত্রাণ পেলেও মাকে আরো কিছুদিনের জন্য বাঁচানোর লড়াই আর নিজেদের বাঁচার লড়াইয়ের পরিণতি যে কি হবে সে জানে না।

'কি রাজি ?' অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল।

এ এক এমন প্রশ্ন, ফাঁসী যার হবে তাকে যেন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে দড়ির ফাঁসে ঝুলবে, না গিলোটিনে মাথা গলাবে ? আসল কথা, চাকরীটা ওকে ছাড়তে হবে।

মনীশ জিজ্ঞেস করল, 'তুই কি কাল ভোরেই আমাকে নিয়ে যেতে চাস ?'

'হ্যাঁ !' অরবিন্দ মাথা ঝাঁকাল, 'আমার এখানে বেশীক্ষণ থাকা তোর পক্ষে রিস্কি হয়ে যাবে। তাছাড়া আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেই এসেছি।'

'বেশ !' মনীশ উঠে দাঁড়াল, 'দরখাস্তটা লিখেনি ?'

'ছুটির কারণ কি লিখবি ?'

'মায়ের ক্যান্সার।' মনীশ মুখ নামিয়ে বলল, 'যে কারণ দিয়ে ছুটি আমি অলরেডি নিয়েছি। তারিখটা শুধু এগিয়ে আনতে হবে।'

গুড, তোর মায়ের ক্যান্সার ? তাহলে তো ভালই হল। লিখে ফ্যাল্ !'

তাকাল মনীশ। কারও মায়ের ক্যান্সার শুনে কেউ এমন উৎফুল্ল হতে পারে ? বুকের পাথরটা নড়ে চড়ে উঠল যেন।

নিজেকে সংযত করে বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেল মনীশ।

অরবিন্দ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পা দুটো তুলে দিল সেন্টার টেবিলের ওপর। টানা তিন রাত চোখে ঘুম নেই। যা ধকল যাচ্ছে শরীরের ওপর। নিউইয়র্ক থেকে জার্মানির ডাসেলডর্ফ। তারপর প্লেন বদলে এথেন্সে এসে বোম্বে হয়ে দিল্লী। রঞ্জনাকে খুন করে পাগলের মত সে-রাতেই নিউইয়র্ক ছাড়ার জন্য উল্টোপাল্টা ঘুরে ওকে ভারতবর্ষে আসতে হয়েছে। দিল্লীতে নেমে আবার কালকার ট্রেন। তারপর তামিয়া। ওফ্, মনীশের সঙ্গে কথা বলে এখন নিশ্চিন্ত।

তবে, মনীশকে দেখে প্রথমে সে সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছিল। এখানে ওর আসল রূপ অরবিন্দর কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত। কিন্তু পরমুহূর্তে মাথায় যখন এল, মনীশের মৃত্যুর পর এখানে সে চাকরী করতে আসছে না, তখন আশ্বস্ত হল মন। মনীশ যে রূপেই থাকুক সে এখানে অরবিন্দ। আপাতত সোয়াব কোম্পানীর রেকর্ড-পত্রে এই নামটাই ভীষণ প্রয়োজন। পরে পরিস্থিতি যদি চায় অরবিন্দ চুল কাটিয়ে চশমা খুলে

বলতে পারবে, এই রূপেই সে চাকরী করেছে এখানে। মনীশের প্রশ্ন কারো মনে আসবে না। কারণ মনীশ তখন পৃথিবীতে থাকবে না। মনীশের রহস্য মনীশের লাশের সাথে চাপা পড়ে থাকবে তামিয়ার কাছাকাছি কোনো গহন খাদে।

মনীশ বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। হাতে লেখা একটা কাগজ।

'দেখি, কি লিখলি ?' অরবিন্দ হাত বাড়াল।

মনীশ দিল দরখাস্তটা। অরবিন্দ পড়ল আগাগোড়া।

'গুড—' অরবিন্দ দরখাস্তটা আবার এগিয়ে দিল মনীশের হাতে, 'কাকে দিবি ?'

'জেনারেল ম্যানেজারের হাতে।'

'কোথায় পাবি তাকে ?'

'ওপরে বাংলোয়।'

'কতক্ষণ লাগবে তোর ফিরতে ?

'বেশীক্ষণ নয়, আধঘণ্টা।'

পা দুটো নামাল অরবিন্দ টেবিল থেকে। দাঁড়িয়ে বলল, 'বাইরে থেকে চাবি দিয়ে যা। আমি আলো নিভিয়ে ভেতরে আছি।'

মনীশ ঘাড় হেলিয়ে দরজা খুলে বেরলো বাইরে। ওর গতিবিধি হাবভাব এখন ফাঁসির মঞ্চে উঠতে যাওয়ার আগে আসামীদের মত।

রাজেশদের কোয়ার্টারে রান্নাঘরে 'সদ্য বানানো লাড্ডুর স্তূপ এদিক ওদিক বিভিন্ন পাত্রে ছড়িয়ে পড়েছে।

গুড়িয়া ও সঙ্গীতা তখনও লাড্ডু পাকিয়ে যাচ্ছে। আরো কিছু বাকী। রাজেশ ক্লাবের দিকে চলে গেছে একটু আগে।

সঙ্গীতা হঠাৎ সামনে স্টোভ-এর ওপর ফ্ল্যাস্কটা দেখে বলল, 'এই যাঃ গুড়িয়া, অরবিন্দকে চা দিয়ে আসতেই ভুলে গেছি!'

গুড়িয়ার হাত লাড্ডু পাকাতে পাকাতে থেমে গেল। মুখ তুলে স্তব্ধ স্বরে বলল, 'দাও নি!'

'না!' সঙ্গীতা লজ্জায় জিভ কাটল, 'তুই বাজারে চলে গেলি, তারপরেই মিসেস চোপড়া বেড়াতে এসেছিলেন। গল্পে গল্পে ভুলে গেছি।'

গুড়িয়ার মুখ ঈষৎ পাংশু হল। আজ লাড্ডু বানানোর জন্য বেসন ও চিনি আনতে বাজারে গিয়েছিল সে। তাই যাওয়ার সময় সঙ্গীতাকে বলে গিয়েছিল, চা আর কিছু খাবার অরবিন্দর কোয়ার্টারে রেখে আসতে।

সঙ্গীতা বলল, 'তুই যা, চট করে ওকে চা করে দিয়ে আয়। সঙ্গে কয়েকটা লাড্ডু নিয়ে যা।'

'এখন যাবো ?' গুড়িয়া তাকাল।

'হ্যাঁ, মাত্র সাতটা বাজে।' সঙ্গীতা তাড়া দিল ওকে, 'ওঠ্ চলে যা। ওর খেতে আসতে আসতে সেই সাড়ে আটটা।'

গুড়িয়া উঠে কলের তলায় হাত ধুতে গেল।

সঙ্গীতা লাড্ডু পাকাতে পাকাতে বলল, 'চাবিটা নিয়ে যাবি, যদি না থাকে—'

'আমি চা করেই নিয়ে যাই ভাবী।' গুড়িয়া ঘুরে বলল, 'ওখানে গিয়ে এখন করতে পারব না।'

'করে নে!'

গুড়িয়া চায়ের কেটলীর দিকে এগিয়ে গেল।

বেতের একটা ঝুড়ি-ব্যাগে চায়ের ফ্ল্যাস্ক ও লাড্ডুর পাত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গুড়িয়া। পেছন দিক দিয়ে মনীশের কোয়ার্টারে যাবার একটা সরু পথ আছে। সেই পথ দিয়ে এগিয়ে গেল। এদিকে কোয়ার্টারের সারি। বিজলী বাতির আলোয় উজ্জ্বল চারপাশ। ঠাণ্ডা আজ তীব্র বলে গুড়িয়া বুকের ওপর আঁচলটা জড়িয়ে নিল ভাল করে।

মনীশের কোয়ার্টারের কাছে এসে হতাশ হল। ভেতরে অন্ধকার। তার মানে মনীশ বোধহয় নেই। পাশে গিয়ে দেখল তাই। দরজায় তালা লাগানো। গুড়িয়ার মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। বেচারী চা-জলখাবার না খেয়ে বেরিয়ে গেছে।

কোমর থেকে চাবি বের করে তালা খুলল গুড়িয়া। তারপর দরজার ল্যাচে চাবি ঘুরিয়ে পাল্লা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল।

বাতি জ্বালানোর আগেই একটা দুর্গন্ধ নাকে এল। সিগারেটের গন্ধের সঙ্গে আরেকটা বিশ্রী গন্ধ কিসের। সুইচ টিপে আলো জ্বালতে অবাক হল। সেন্টার টেবিলে অ্যাসট্রেতে সিগারেটের টুকরো ভর্তি। কিন্তু ও তো সিগারেট খায় না। তাহলে কে এসেছিল? গন্ধটাই বা কিসের? সোফা, কোচ, টেবিল কেমন যেন অগোছালো।

গুড়িয়া বিস্মিত পায়ে খাবার ও ফ্ল্যাস্কটা ডাইনিং টেবিলে রাখার জন্য পাশের ঘরে গেল। বাতি জ্বালিয়ে টেবিলের ওপর রাখল ঝুড়ি ব্যাগটা। সে মুহূর্তে ওর মনে হল কে যেন বেডরুমে আছে। তীব্র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে ভেতর থেকে। গুড়িয়ার কপালে ভাঁজ পড়ল। ফিরে তাকাল বেডরুমের দরজার দিকে। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেল।

দরজার পর্দা তুলে আবছা অন্ধকারে দেখল, কে যেন শুয়ে আছে বিছানায়। বিস্মিত পায়ে ভেতরে ঢুকে বাতি জ্বালল গুড়িয়া।

অরবিন্দ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওর মুখ দরজার দিকেই ঘোরানো ছিল।

গুড়িয়া মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অরবিন্দর মুখের দিকে। ওর মাথাটা হঠাৎ যেন চিড় খেয়ে গেল মাঝখান থেকে। বিদ্যুতের ঝলকানির মত চোখে ভেসে উঠল কিছু। তারপরেই গুড়িয়ার মনে পড়ে গেল ওর স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া কিছু মুহূর্ত।

গুড়িয়ার চোখে ভাসছে এখন দু'বছর আগেকার এক অভিশপ্ত ঘটনা।

শিমলা। সকাল এগারোটা।

নীল-সাদা টুপিস স্কার্ট পরে গুড়িয়া ঢেউ খেলানো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে

নামছে। ওর ডান হাতে কাপড়ের একটা ঝোলা ব্যাগ। ওই ব্যাগে রয়েছে আঁক শেখার রঙ পেনসিল, কাগজ ও বোর্ড।

আকাশে এখন মেঘ থৈ থৈ করছে। এই সকালেও তাই চারপাশে চাপ-চাপ অন্ধকার। বৃষ্টি যে কোনো মুহূর্তে নামতে পারে।

সরু পথ দিয়ে আপন মনে হেঁটে চলেছে গুড়িয়া। একটু উদাস উদাস ওর দৃষ্টি আবছা আঁধারে আজ পথটাকেও মনে হচ্ছে বিষণ্ণ।

হঠাৎ কারো পায়ের শব্দ হল পেছনে। গুড়িয়া হাঁটতে হাঁটতেই ঘুরে দেখল একবার। কেউ নজরে পড়ল না। পড়লে ভাল হত। কোনো সঙ্গী পেলে ভাল লাগে গুড়িয়ার। এই পথ বড় নির্জন। শিমলা শহরতলীর পেছনে বলে এদিকে লোকের তেমন আনাগোনা নেই। অথচ ওদের বাড়ির অবস্থানটা এমন যে আঁকার স্কুলে যেতে হলে এই পথ দিয়েই যেতে হয়। অন্যেরা যায় ম্যালের দিকের রাস্তা দিয়ে।

পেছনে আবার পায়ের শব্দটা হল। এবার খুব কাছ থেকে। দাঁড়িয়ে পড়ল গুড়িয়া। ঘুরে তাকাল।

অরবিন্দ পাশের ঝোপে লুকোতে গিয়ে পারল না। পাতার আড়ালে ওর লাল জার্সি কোটটা ভালই নজরে পড়ছে।

গুড়িয়া বিস্মিত চোখে কোটটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এগোলো না আর।

অরবিন্দ বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে। গুড়িয়ার পাশে এসে বলল, 'হ্যালো, কোথায় যাচ্ছ?'

গুড়িয়ার ভুরু কুঁচকে উঠল। কোত্থেকে এল লোকটা? ওপর থেকে নামলে একটু আগে সে ঘুরে দেখল না কেন? ওর ঘাড়ের ঝাঁকড়া চুল, কালচে চশমা, কথা বলার ঢঙ ভাল লাগল না গুড়িয়ার। বিশেষ করে, ডান চোখের নীচে লম্বা কাটা দাগটা দেখে বুক কেঁপে উঠল। ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি নীচে যাচ্ছি।'

'নীচে কোথায় হনি?' অরবিন্দ কোটের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে আরো কাছে এল।

গুড়িয়া পেছিয়ে এল এক পা। নিঃশব্দে একটা আতঙ্কের নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আঁকার স্কুলে।'

অরবিন্দ মুখে কিছু যেন চিবোতে চিবোতে বলল, 'ওই নীচে তোমার আঁকার স্কুল?—চলো ডার্লিং, আমিও যাচ্ছি ওদিকে।'

গুড়িয়া দুরু দুরু বুকে তাকাল চারপাশে। ওপরে নীচে কোনো দিকেই প্রাণের চিহ্ন নেই। এখন পাহাড়ের ঢালের আড়ালে সব উধাও। এদিকে দুপাশে জঙ্গল। ঘন গাছগাছালি। চিৎকার করলেও শোনার মত লোক নেই ত্রিসীমানায়।

অরবিন্দ দু'পা এগিয়ে বলল, 'হ্যালো, কাম আন!'

গুড়িয়া বাধ্য হয়ে এগোলো। আড়ষ্ট পায়ে। ঢিপ ঢিপ বুকে।

অরবিন্দ ওর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল, 'কি নাম তোমার?'

গুড়িয়ার গলা শুকিয়ে এল। ঢোক গিলে বলল, 'গুড়িয়া।'

'হাউ সুইট!' অরবিন্দ ওর স্নিকার পরা পায়ে যেন দুলতে দুলতে হাঁটছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তোমাকে আমি এভরি সানডে এই পথ দিয়ে যেতে দেখি।'

গুড়িয়ার আড় চোখে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। ভীত বিহঙ্গের মত হাঁটছে সে এক পা এক পা করে।

হঠাৎ অরবিন্দ গুড়িয়ার পথ আগলে দাঁড়াল। হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল, 'গুড়িয়া আয় লভ ইয়ু।'

গুড়িয়া কি করবে বুঝতে পারছে না।

অরবিন্দ ওর ডান হাতটা খপ করে ধরে বলল, 'চলো ডার্লিং, আমরা একটু গল্প করি। ওই গাছের তলায়—'

গুড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে হাতটা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নীচের দিকে দৌড়তে শুরু করল।

ঘুরে দাঁড়াল অরবিন্দ। শিকার ফসকে যাওয়ায় হিংস্র হয়ে উঠল ওর মুখ। আহত কেউটের মত গুড়িয়ার পিছু পিছু ছুটতে শুরু করল।

গুড়িয়া দৌড়চ্ছে। প্রাণপণে। বুকের ওপর ঝোলা ব্যাগটা আঁকড়ে। পেছনে শুনতে পাচ্ছে অরবিন্দর পদশব্দ। পথের ঢালে বাঁক নিতে গিয়ে টাল শামলাতে পারল না। পড়ে গেল পা পিছলে। গড়াতে গড়াতে আবার উঠল। হিংস্র হায়েনার মত ছুটে আসছে অরবিন্দ। বেগতিক দেখে গুড়িয়া পথ ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকল। হাত থেকে ছিটকে পড়ল ওর ঝোলা ব্যাগ। রঙ পেনসিল, কাগজ ছড়িয়ে পড়ল চার পাশে।

গুড়িয়া দৌড়চ্ছে।

ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত অরবিন্দও বাঁক নিল। প্রায় লাফাতে লাফাতে দীর্ঘ পদক্ষেপে প্রবেশ করল জঙ্গলে। আজ গুড়িয়াকে ওর চাই-ই। কামাতুর উত্তেজনায় এখন মত্ত ওর শরীর। লালসার আগুনে জ্বলছে ওর দেহ। এই আগুনে সে গুড়িয়াকে আজ দগ্ধ করবে। এভাবে একাকী, অসহায় মেয়েদের দগ্ধ করতেই ওর সুখ, আনন্দ।

ক্লান্ত বিপর্যস্ত গুড়িয়া রুদ্ধশ্বাসে এক গাছ থেকে আরেক গাছের আড়ালে গিয়ে লুকোচ্ছে নিজেকে। কিন্তু পারছে না আর। হাঁপাচ্ছে ভীষণ। অক্টোপাসের মত দুটো শক্ত হাত প্রসারিত করে অরবিন্দ ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলল ওকে। অসহায় গুড়িয়া শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাতে খাদের দিকে ছুটে গেল। ছুটতে ছুটতে দাঁড়াল একবারে খাদের ধার ঘেঁষে।

অরবিন্দও দাঁড়াল। থমকে। গভীর খাদের দিকে তাকিয়ে গা গুলিয়ে উঠল ওর। মাথা গেল ঘুরে। ভয়ে পিছিয়ে আসছে অরবিন্দ।

সে মুহূর্তে চোরা মাটির ধসে পা পড়ে গুড়িয়া গড়িয়ে পড়ল খাদে।

'পাপাজী—!' গুড়িয়ার আর্ত চিৎকার চারপাশের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল।

গুড়িয়া গড়াতে গড়াতে ধাক্কা খেল পাথরে। খাদে পড়ল না। বড় এক শিলা খণ্ডে আটকে গিয়েছিল ওর দেহ। কিন্তু মাথায় জোর আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে।

জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে গুড়িয়ার কানে বেজে উঠেছিল মেঘের গর্জন। তার সাথে পাহাড়ী বৃষ্টির জোর ঝাপটাও লেগেছিল ওর মুখে।

আজ মনীশের কোয়ার্টারে ওর বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে সেই একই বজ্রনিনাদ যেন শুনতে পেল গুড়িয়া। ওর মুখ থেকে প্রতিধ্বনিময় সেই আর্ত চিৎকার আবার বেরিয়ে এল— 'পাপাজী—!'

চিৎকারটা শুনে অরবিন্দ ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। ঘুম ভাঙ্গা চোখে প্রথমে সে চারপাশের পরিস্থিতি অনুধাবন করার চেষ্টা করল। পরমুহূর্তে দেখল গুড়িয়াকে।

অরবিন্দ হতবাক। নিথর, হতভম্ব।

গুড়িয়া আবার তারস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'পাপাজী—!'

ছুটে গেল বাইরের ঘরের দরজার দিকে। কম্পাউণ্ডে বেরিয়ে সজোরে হাঁক দিল, 'রাজেশভাইয়া! সঙ্গীতাভাবী!'

আশ-পাশের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন।

'কি হল গুড়িয়া?'

'কি হয়েছে?'

উত্তেজিত গুড়িয়া মনীশের কোয়ার্টারের অভ্যন্তর অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাল। সবাইকে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করল সে।

গুড়িয়াকে অনুসরণ করে ওরা প্রবেশ করল ভেতরে।

অরবিন্দ তখন পেছনের দরজা দিয়ে পালাতে গিয়ে ওর ভুলে যাওয়া ঝোলা-ব্যাগটা ফেরত নিতে এসেছে। অকস্মাৎ ছুটে আসা প্রতিবেশীদের ভিড়ে রুদ্ধ হয়ে গেল পথ।

অরবিন্দ ব্যাগ কাঁধে মনীশের বেডরুমে নিথর, নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে।

'কি ব্যাপার? কাকে চাই?' অরবিন্দ সংযত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

প্রতিবেশীর দল অরবিন্দকে দেখে স্তম্ভিত। মুখ চাওয়া চাওয়ি করল ওরা।

একজন বলল, 'কে ইনি?

আরেকজন বলল, 'মিঃ সেন? আবার চুল বাড়িয়েছেন? চশমা পরেছেন?'

'না!' গুড়িয়া প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। অরবিন্দকে দেখিয়ে সে বলতে গেল, 'এই লোকটা। এই লোকটা—'

কিন্তু বাকীটুকু বলতে পারল না। উত্তেজনায় রুদ্ধ হয়ে এল গুড়িয়ার স্বর।

অরবিন্দ চারপাশে তাকাল। অতর্কিতে ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় হতবুদ্ধি ওর অবস্থা। গুড়িয়াকে সে চিনতে পেরেছে। কিন্তু মেয়েটি এখানে এল কি করে? তাও তালাবন্ধ ঘরে?

সেই মুহূর্তে সঙ্গীতা ও রাজেশ প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছল। ভিড় ঠেলে গুড়িয়ার পাশে এসে সঙ্গীতা জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে গুড়িয়া?'

'ভাবী —' গুড়িয়া জড়িয়ে ধরল সঙ্গীতাকে। অরবিন্দর দিকে ইঙ্গিত করে সে বলে উঠল, 'এই যে সেই লোকটা—'

'কে ?' অরবিন্দর দিকে তাকাল সঙ্গীতা।

রাজেশও দেখল। দুজনেই অবাক।

রাজেশ বিস্ময়ে বিড় বিড় করে উঠল, 'কে ইনি ? অনেকটা অরবিন্দর মত দেখতে !'

'না !' গুড়িয়া আবার প্রতিবাদ করে উঠল। আক্রোশের স্বরে বলল, 'এই সেই লোকটা যে আমায় এতদিন কষ্ট দিয়েছে, যন্ত্রণা দিয়েছে। এর জন্য আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। বেহুঁশ হয়ে যেতাম।'

'এই সে লোকটা !' স্তব্ধ সঙ্গীতা অরবিন্দর দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল।

রাজেশও স্তম্ভিত। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল গুড়িয়া ? কি করেছিল এ ?'

গুড়িয়া তপ্ত স্বরে বলে উঠল, 'শিমলায় এই লোকটা···এই লোকটা আমাকে আঁকার স্কুলে যাওয়ার পথে—'

বলতে বলতে ভেঙ্গে পড়ল গুড়িয়া। সঙ্গীতাকে জড়িয়ে ওর বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল।

রাজেশ বুঝল ব্যাপারটা। অরবিন্দকে আরেকবার এক ঝলক নিরীক্ষণ করে সে সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ঘরে ছুটল, ডক্টর ভাটনাগরকে ফোন করতে।

সঙ্গীতা গুড়িয়াকে সামলাতে ব্যস্ত তখন।

প্রতিবেশীদের ভিড়ে মৃদু গুঞ্জন চলছে। কিন্তু যাকে নিয়ে এত আলোড়ন প্রতিক্রিয়া সেই অরবিন্দ নীরবে দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে এইটুকু সে বুঝতে পেরেছে যে ঘটনা এখন ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং এই চোরা ফাঁদ থেকে পালানো অসম্ভব। অতএব নীরব থাকাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ।

মনীশ প্রবেশ করল কোয়ার্টারে। বিপন্ন, উদভ্রান্ত। কোয়ার্টারের ভেতর ভিড়, চাঞ্চল্য দেখে আরো বিভ্রান্ত হয়ে গেল সে। বাইরের ঘরে ফোনের রিসিভার হাতে রাজেশ ডক্টর ভাটনাগরের সঙ্গে কথা বলছে। মনীশ দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকাল একবার। বুঝতে পারছে না, কি ঘটেছে। কেন এত সমাবেশ ওর কোয়ার্টারের ভেতর ? হঠাৎ ভেতর থেকে গুড়িয়ার কান্নার শব্দ ভেসে এল। স্তব্ধ পায়ে সে এগিয়ে গেল বেডরুমের দিকে।

ভিড় ঠেলে মনীশ প্রবেশ করল বেডরুমের ভেতর। থমথমে চোখে অরবিন্দর দিকে তাকাল। তারপর গুড়িয়ার দিকে। গুড়িয়া সঙ্গীতাকে জড়িয়ে ফোঁপাচ্ছে তখনো।

ফোন করে রাজেশ ফিরে এল বেডরুমে। মনীশকে জিজ্ঞেস করল, 'অরবিন্দ, কে এই লোকটা ?'

রাজেশের প্রশ্ন শুনে ভাসা ভাসা চোখে তাকাল মনীশ। কোনো জবাব এল না ওর মুখে।

'অরবিন্দ ভাই—' সঙ্গীতা বলল, 'জানো, এই লোকটাই গুড়িয়ার জীবনে অভিশাপ এনেছে। এর জন্যেই গুড়িয়া অস্বাভাবিক হয়ে যেত—'

চমকে উঠল মনীশ। মুখ তুলে অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কে বলেছে ভাবী ?'

'কে আবার, গুড়িয়া।' সঙ্গীতা বলল, 'গুড়িয়া ওকে দেখে চিনতে পেরেছে।'

মনীশ সপ্রশ্ন তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাল গুড়িয়ার দিকে।

গুড়িয়া অশ্রুপ্লাবিত চোখে মনীশের দিকেই চেয়েছিল। আর্দ্র স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, এই সেই লোক। শিমলায় আমাকে একা পেয়ে হামলা করেছিল আমার ওপর।'

ডক্টর ভাটনাগর তখন রাজেশের ফোন পেয়ে বিদ্যুৎগতিতে এসে গেছেন সেখানে। গুড়িয়ার কথাগুলো শুনতে শুনতে ভিড় পেরিয়ে ভেতরে এলেন।

রাজেশ ইঙ্গিতে অরবিন্দকে দেখিয়ে দিল।

ডক্টর ভাটনাগর তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। তারপর ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'গুড়িয়া, সেদিনের ঘটনা সব মনে পড়ে গেছে তোমার?'

'হ্যাঁ, ডক্টর আঙ্কল—' গুড়িয়া সঙ্গীতাকে জড়িয়ে ধরে উত্তরটা দিল।

'সেই রোববার আঁকার স্কুলে যাওয়ার পথে দেখা হয়েছিল এর সঙ্গে?' ডক্টর ভাটনাগরের দ্বিতীয় গম্ভীর প্রশ্ন।

'হ্যাঁ—'

'কি ঘটেছিল পুরোপুরি বলবে আমায়?'

সঙ্গীতা গুড়িয়ার পিঠে হাত গাঢ় করল। প্রত্যেকে একদৃষ্টে গুড়িয়ার দিকে তাকিয়ে। গুড়িয়া বলতে শুরু করল। ওর অসংলগ্ন স্বর। কিন্তু সেদিন যা ঘটেছিল, পুঙ্খানুপুঙ্খ সব জানাল ডক্টর ভাটনাগরকে।

গুড়িয়ার মর্মান্তিক কাহিনী যখন শেষ হল, সারা ঘর তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ বাইরে একটা জীপ দাঁড়ানোর শব্দ হল। দু-তিন জোড়া বুট নামল জীপ থেকে। মচমচ আওয়াজ করে সব এগিয়ে আসছে এদিকে।

সচকিত হয়ে ঘুরল সবাই। একমাত্র ডক্টর ভাটনাগরের প্রত্যাশিত দৃষ্টি।

ভামিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর বর্ষিয়ান বিক্রম সিং দুজন কনস্টেবলের সাথে ভেতরে ঢুকলেন। চারদিকে একটা তীক্ষ্ম দৃষ্টি বুলিয়ে ডক্টর ভাটনাগরের কাছে এসে বললেন, 'কি ব্যাপার ডাক্তার সাহাব? আমাকে হঠাৎ এত্তেলা! কি হয়েছে?'

ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'মিঃ সারীনের কাছে এক মারাত্মক অপরাধীর খবর পেয়ে আপনাকে ফোন করেছি মিঃ সিং। তাকে আমি আপনার হাতে সোপর্দ করতে চাই।'

'মারাত্মক অপরাধী! কে?' বিক্রম সিং চারপাশের ভিড়ের দিকে আবার দৃষ্টি হানলেন—'কার কথা বলছেন? কিসের অপরাধী?'

'বছর খানেক আগের কথা আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই,' ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'আপনার ছোটো ভাইকে দেখে শর্মাজীর বেটি গুড়িয়া বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল?'

'আলবৎ!' বিক্রম সিং গুড়িয়াকে নিরীক্ষণ করে বললেন, 'তখন এই বেটির জন্য বহুত দৌড়ধূপ করেছি আমি। বড় লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলাম—'

'লজ্জার কোনো কারণ ছিল না—' ডক্টর ভাটনাগর বললেন, 'সে কথা আমি তখনই বলেছিলাম আপনাকে। আপনার ভাইয়ের কোনো দোষ ছিল না তাতে। গুড়িয়ার

এই বেহ‍ুঁশ হওয়ার পেছনে দোষী মাত্র একজন। যে ওর মনে মারাত্মক ভয়ের একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ!' মাথা ঝাঁকালেন বিক্রম সিং। স্মৃতি রোমন্থন করে বললেন, 'আপনি বলেছিলেন বটে। গুড়িয়া বেটির জীবনে ভয়ানক কোনো ঘটনা ঘটে গেছে। যার ভয়টা বহাল আছে ওর মনে কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা আর মনে নেই, তাই তো?'

'একজেক্টলি। সেই ঘটনা এখন মনে পড়ে গেছে গুড়িয়ার।'

'মনে পড়ে গেছে? সত্যি? কি ঘটেছিল?'

'এক মনুষ্যরূপী জানোয়ার গুড়িয়াকে অসহায় একা পেয়ে হামলা করেছিল ওর ওপর। ওর শ্লীলতাহানি করতে—। সে এক ভয়াবহ ঘটনা মিঃ সিং!'

'কোথায় ঘটেছিল? এখানে, তামিয়ায়?'

'না! শিমলায়। দু'বছর আগে।—সেই ভয়ঙ্কর হামলায় গুড়িয়া মারাত্মক জখম হয়। মানসিক, শারীরিক দু'ভাবেই। আপনি তো জানেন, গত দেড় বছর ধরে আমি ওর মানসিক আঘাতের চিকিৎসা করছি। সেই জঘন্যতম হামলাকারী হল এই লোকটা।'

ডক্টর ভাটনাগর ঘৃণিত দৃষ্টির সাথে তার দীর্ঘ হাত অরবিন্দর দিকে প্রসারিত করলেন।

বিক্রম সিং ঘুরে তাকালেন অরবিন্দর দিকে। নির্লিপ্ত ভদ্রবেশী চেহারাটা লক্ষ্য করে কপালে ভাঁজ পড়ল তাঁর।

'মিঃ সিং—' ডক্টর ভাটনাগর আবার বললেন, 'এর বিরুদ্ধে গুড়িয়ার লিখিত অভিযোগ চাইলে এই মুহূর্তে আপনি পেয়ে যাবেন। তার সাথে ওর ডাক্তার হিসেবে আমার রিপোর্টও আমি দাখিল করব।'

বিক্রম সিং অরবিন্দকে আবার নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইনি কে ডাক্তার সাহেব?'

'এর পরিচয় আমি এখনও পাইনি।' ডক্টর ভাটনাগর মনীশের দিকে ঘুরে বললেন, মিঃ সেন, এ আপনার কোয়ার্টারে যখন, নিশ্চয়ই আপনার পরিচিত?'

গুড়িয়ার কাহিনী শোনার পর মনীশের চোখ-মুখও ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে গিয়েছিল। একবার তাকাল অরবিন্দর দিকে। জীবনে প্রথম সে এত বিদ্বেষ, এত ক্রোধ নিয়ে তাকিয়েছে কারো দিকে। ঘুরে বলল, 'হ্যাঁ ডক্টর, একে আমি চিনি। কিন্তু এখন আমার পরিচিত বলতে লজ্জা বোধ হচ্ছে। ঘৃণা হচ্ছে ভীষণ।'

অরবিন্দর চোয়াল শক্ত হল। সামলে নিল নিজেকে।

বিক্রম সিং এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় হয়েছে পরিচয়? এখানে না শিমলায়?'

'না কলকাতায়।' মনীশ সংকুচিত স্বরে জবাব দিল, 'আমরা একসাথে কলেজে পড়েছি।'

'আচ্ছা, তাহলে ইনি আপনার বন্ধু?'

'না! ও কেউ নয় আমার।' মনীশের কঠিন স্বর, 'ও একজন অপরাধী, যে

অপরাধ ও করেছে তার কোনো ক্ষমা নেই মিঃ সিং। আমিও চাই, ওর প্রাপ্য শাস্তি ও যেন পায়।'

অরবিন্দ হিমশীতল দৃষ্টিতে তাকাল মনীশের দিকে। আবার সংযত করল নিজেকে। এই মুহূর্তে উত্তেজনা বশে কিংবা অধৈর্য্য হয়ে বিসদৃশ কিছু সে করতে চায় না। দেখা যাক, ঘটনা কোন দিকে যায়।

বিক্রম সিং কোমরে হাত তুলে অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি নাম জনাবের ?'

অরবিন্দ অদ্ভুত নীরবতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এত অভিযোগ, আক্রোশ ভরা কটুক্তির পরেও ওর চেহারায় কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া এল না। নম্র স্বরে বলল, 'আমার নাম অরবিন্দ সেন।'

'অরবিন্দ সেন !' ভিড়ের কয়েকজন গুঞ্জন করে উঠল।

একজন বিদ্রূপ করে বলে উঠল, 'পুলিশ দেখে বাপের নাম ভুলতে শুনেছি। এ দেখছি নিজের নামও ভুলে গেছে।'

হো হো করে হেসে উঠল অন্যেরা।

বিক্রম সিং কড়কে উঠলেন, 'রগড় হচ্ছে ! আমি আপনার নাম জিজ্ঞেস করছি, অন্য কারো নয় !'

'ইয়েস ইন্সপেক্টর, ইটজ মায় নেম। আমি আমার নামই বলেছি, অন্য কারো নয়।' অরবিন্দ ওর ব্যাগে হাত গলিয়ে পাসপোর্ট বার করে এগিয়ে দিল।

বিক্রম সিং পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে তার ভেতরের ছবি ও লেখা নামটা দেখে অপার বিস্ময়ে তাকালেন অরবিন্দর দিকে। তারপর ঘুরে আরো অবাক দৃষ্টিতে চাইলেন মনীশের দিকে।

'ডাক্তার সাহাব,' বিক্রম সিং বিস্ময়ের ঘোরে পাসপোর্টের দিকে ডক্টর ভাটনাগরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

ডক্টর ভাটনাগর এগিয়ে এসে দেখলেন পাসপোর্টটা। ছবি ও নামের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল তার চোখ। বিস্মিত মুখ তুলে তিনিও একবার অরবিন্দর দিকে আরেকবার মনীশের দিকে তাকালেন। 'মিঃ সেন, আপনাদের কি একই নাম ?'

মনীশ ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে তাকাল। কাঁপা স্বরে বলল, 'না ডক্টর, আমার নাম মনীশ সিন্হা।'

ঘরে বাজ পড়ল যেন। মুহূর্তের জন্য নিথর, নিশ্চল হয়ে গেল সব।

'মনীশ সিন্হা !' ডক্টর ভাটনাগরের স্তম্ভিত স্বগতোক্তির স্বর, 'কিন্তু আমরা যে আপনাকে অরবিন্দ সেন নামে জানি !'

রাজেশও তখন এগিয়ে এসে পাসপোর্টটা দেখছে। সঙ্গীতা ও গুড়িয়ার বিস্ফারিত চোখ' আর সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে মনীশের দিকে।

মনীশ কোনো দিকে চাইল না। শুধু ডক্টর ভাটনাগরের চোখ থেকে চোখ নামিয়ে বলল, 'ওটা আমার মিথ্যে পরিচয়।'

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতাটা আবার ছেয়ে গেল সারা ঘরে। প্রত্যেকেরই স্তব্ধ, স্তম্ভিত দৃষ্টি। কিন্তু তার মধ্যেও যেন অবিশ্বাসের একটা ছায়া বিরাজ করছে।

একমাত্র ইন্সপেক্টর বিক্রম সিং বুঝতে পারলেন। পাসপোর্টটা ডক্টর ভাটনাগরের হাত থেকে নিয়ে দ্রুত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন তিনি। কোমরের বেল্টে হাত ঘষতে ঘষতে অরবিন্দকে বললেন, 'এ ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য মিঃ সেন ? আপনার পরিচয়ে ইনি এখানে……? রহস্যটা কি ?'

অরবিন্দর হাবে-ভাবে ভদ্রতার একটা তুখোর অভিনয় ছিল। মৃদু স্বরে বলল, 'মনীশ আমাকে শুধু সহপাঠী বলল, কিন্তু আমি ওকে বন্ধু মনে করি। আমি চেয়েছিলাম যে-ভুলটা ও করেছে তার থেকে ওকে নিঃশব্দে মুক্তি দিতে। সেজন্যই আমি এখানে এসেছি। ভাবিনি, ঘটনা এ ভাবে ঘটে যাবে—'

'মিঃ সেন —' বিক্রম সিং-এর পুলিশ সুলভ গম্ভীর স্বর— 'আমার প্রশ্নের উত্তর-এটা হল না। আমি জানতে চাই, ইনি আপনার পরিচয়ে সোয়াব কোম্পানীর চাকরী পেলেন কি করে ?'

'ইট ইজ অবভিয়স ইন্সপেক্টর —' অরবিন্দ বলল, 'আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার-এর সাহায্যে।

'আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এর হাতে এল কি করে ?'

মুখ নামাল অরবিন্দ। চোখে-মুখে দুঃখ, বেদনার ভাব ফুটিয়ে বলল, 'মনীশ আমার বন্ধু। আমার বাড়িতে ওর আসা-যাওয়া আছে। প্লিজ ইন্সপেক্টর, এর বেশী আমাকে দিয়ে বলাবেন না।'

বিক্রম সিং এবার গটগট করে এগিয়ে গেলেন মনীশের দিকে। 'মিঃ সিন্হা— আপনি তাহলে ফল্স্ আইডেন্টিটি দাখিল করে সোয়াব কোম্পানীতে চাকরী করছিলেন ?'

'হ্যাঁ—' মনীশ জবাব দিল।

'তোফা!' কাঁধ ঝাঁকালেন বিক্রম সিং। ব্যাঙ্গপূর্ণ স্বরে বললেন, 'তাহলে আপনিও এক জন অপরাধী! এতদিন স্রেফ ভূয়ো নামে চালিয়ে গেলেন! কেউ টের পেলো না!'

মনীশ নীরবে নত মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

'ডাক্তার সাহাব—' বিক্রম সিং ঘুরে বললেন, 'এ যে দেখছি বুমেরাং হয়ে গেল—'

ডক্টর ভাটনাগর বিমূঢ়-বিহ্বল। ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এখনো কিছুই ঢুকছে না তাঁর মাথায়।

সারা ঘর তখন স্তব্ধ। রাজেশ একপাশে নিথর, নিশ্চল। সঙ্গীতার অবিশ্বাসের চোখ। এমন যে হতে পারে, হওয়া সম্ভব ওর মন কিছুতেই তা মানছে না। গুড়িয়া সঙ্গীতাকে জড়িয়ে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে। অবোধ শিশুর মত ওর দৃষ্টি। পৃথিবীর আশ্চর্যতম ঘটনা যেন চোখের সামনে ঘটছে, এমনই তার হাব-ভাব।

'মিঃ সিন্হা, আপনার বন্ধুর নাম পরিচয় চুরি করার অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি!'

বিক্রম সিং-এর ইশারায় কনস্টেবল দুজন দ্রুত এগিয়ে মনীশের দু পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বিক্রম সিং ওদের হুকুম দিলেন, 'যাও! একে নিয়ে জীপে ওঠো!'

কনস্টেবল দুজন মনীশের দিকে ঘুরে ওকে এগোতে ইঙ্গিত করল।

মনীশ ম্লান দৃষ্টিতে এক নিমেষ চারপাশে তাকিয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে।

ঘরের নিথর মানুষগুলো থমকে নড়ে উঠল একবার। কিন্তু কারো মুখে একটিও কথা এল না। ভাষা সবাই তখন হারিয়ে ফেলেছে।

শুধু সঙ্গীতা গুড়িয়ার হাত ছাড়িয়ে উদভ্রান্তের মত ছুটে এল মনীশের কাছে। ওর মুখ থেকে সেই একই সম্বোধন অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল—'অরবিন্দভাই!'

দাঁড়িয়ে পড়ল মনীশ। মুখ তুলে অতি কষ্টে বলল, 'আমি তোমার ভাই হওয়ার যোগ্য নই ভাবী। ও নামে আমায় ডেকো না।'

সঙ্গীতার ঠোঁট কেঁপে উঠল। স্তব্ধ স্বরে বলল, 'তাহলে সব সত্যি? তুমি মিথ্যে পরিচয় নিয়ে এসেছিলে এখানে? তোমার নাম অরবিন্দ নয়?'

'না!' মনীশ দৃষ্টি সরিয়ে বলল, 'আমার নাম মনীশ সিন্হা।'

সঙ্গীতার চোখ সজল হয়ে উঠল। কিন্তু মুখ হয়ে উঠল কঠিন। তীক্ষ্ণ অনুযোগের স্বরে বলল, 'কেন, কেন নিয়েছিলে তুমি এই মিথ্যে পরিচয়?'

মনীশের দৃষ্টিতে বেদনা। সঙ্গীতার সিক্ত চোখে আলতো চোখ বুলিয়ে বলল, 'সে অনেক কাহিনী ভাবী—। তবে, আমার মত কাহিনী আজ এদেশের ঘরে ঘরে। যদিও তারা আমার মত অপরাধী হয়নি। সেখানেই আমার পরাজয়।'

'তুমি শুধু অপরাধী নও, পাপী! নিষ্ঠুর পাপী!' সঙ্গীতা উন্মাদিনীর মত চিৎকার করে উঠল, 'তোমার বিবেক, আবেগ কিছুই নেই। তাই ফুলের মত মেয়ে গুড়িয়ার সঙ্গেও প্রতারণা করেছ, প্রবঞ্চনা করেছ—'

'গুড়িয়ার সাথে!' মনীশের চোখে-মুখে যন্ত্রণার ঢেউ। অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'না ভাবী, ওর সাথে আমি প্রতারণা করিনি!'

'তাহলে, ভালবেসেছ ওকে?'

মনীশ দৃষ্টি নামাল। আনত স্বরে বলল, 'ওকে সুস্থ করতে যতটুকু যা করেছি, ডক্টর ভাটনাগরের নির্দেশে—'

'অভিনয়?' সঙ্গীতার ঠোঁটে তির্যক হাসি। বিদ্রূপ পূর্ণ কঠোর স্বরে বলল, 'যে অভিনয় তুমি সবার সাথে করে এসেছ এতদিন? অরবিন্দ সেনের মুখোশ পরে? যার আরেক নাম ছলনা, কপটতা—?'

মনীশ বেদনা-বিধুর দৃষ্টিতে তাকাল আবার। ওর কণ্ঠনালী দপদপ করে কেঁপে উঠল। যন্ত্রণাকাতর মুখ নামিয়ে বলল, 'আমায় ক্ষমা করে দিও ভাবী। গুড়িয়াকেও বলো আমায় ক্ষমা করে দিতে, ভুলে যেতে—'

'না!' তীব্র বিদ্বেষ ভরা স্বরে আবার চিৎকার করে বলে উঠল সঙ্গীতা, 'তোমাকে ভোলা যায় না। তোমার মত বিশ্বাসঘাতক, প্রতারককে সারা জীবন আমরা মনে রাখব। আমাদের স্মৃতিতে তুমি যে ক্ষত সৃষ্টি করে গেলে তা মুছবে না কোনো দিন। এত ভালবাসা, এত বিশ্বাসের পরিবর্তে তুমি যা দিয়ে গেলে ওই ফুলের মত মেয়েটিকে, তার ক্ষমা নেই, কোনো মার্জনা নেই। তুমি ক্ষমার অযোগ্য—!'

সঙ্গীতার বুকফাটা প্রলাপ শেষ হতেই মনীশ নত মুখে এগিয়ে গেল কনস্টেবল দুজনের সঙ্গে।

আবার একটা অসহ্যকর নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। প্রত্যেকে বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনীশের যাওয়ার দিকে।

গুড়িয়া এক পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে অবশের মত দাঁড়িয়ে। ওর দৃষ্টি প্রথম থেকেই ঘন নিবন্ধ মনীশের দিকে। ঘটনার এই অকস্মাৎ আঘাতে প্রায় রক্তশূন্য হয়ে উঠেছে ওর মুখ। দৃষ্টিতে ভেসে উঠেছে নিঃসাড় এক শূন্যতা।

ইন্সপেক্টর বিক্রম সিং ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, 'ডাক্তার সাহাব, তাহলে গুড়িয়া বেটির অভিযোগের কি হবে?'

প্রশ্নটা শুনে সবাই তাকাল একবার পরস্পরের দিকে। কিন্তু মনীশের পরিচয়ের ধাক্কাটা এত তীব্র ছিল যে তার আঘাত তখনো কেউ কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

তার মধ্যেই অরবিন্দ বলল, 'এ রহস্য পরিষ্কার হতে এখনো কি কিছু বাকী আছে, ইন্সপেক্টর?'

বিক্রম সিং সপ্রশ্ন তাকালেন ওর দিকে।

অরবিন্দ চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলল, 'একটু আগে এখানে আমি শুনলাম, আমাকে নাকি মনীশের মত দেখতে। তার মানে, মনীশ কি এখানে আমার চেহারা নিয়ে এসেছিল?'

জবাবটা একজন প্রতিবেশী দিলেন, 'হ্যাঁ, মাস তিনেক আগেও ওর মাথায় আপনার মত চুল ছিল। চশমাও পরত আপনার মত।'

'সেই একই ছদ্মবেশ দু বছর আগেও সে নিতে পারে।'

অরবিন্দর এই মন্তব্য শুনে সারা ঘর দ্বিতীয়বারের জন্য স্তব্ধ হল।

মনীশ তখন ঘরে নেই। তাই অরবিন্দর বলতে কোনো অসুবিধে হল না। সাবলীল ভঙ্গীতে সে বলল, 'ইন্সপেক্টর, মনীশ গত দু'বছর ধরে আমার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে খবর পেয়েই আমি ছুটে এসেছি এখানে—।'

রাজেশ, সঙ্গীতা ও ডক্টর ভাটনাগরের চেহারায় বিস্ময়ের পর বিস্ময়। ওরা ঘুরে তাকাল গুড়িয়ার দিকে।

ডক্টর ভাটনাগর গুড়িয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গুড়িয়া, তুমি কি চিনতে ভুল করেছ?'

গুড়িয়া তখন আর নিজের মধ্যে নেই। কিছুক্ষণ আগের চরম ঘটনা ওর শরীরের সব গ্রন্থিগুলো ওলট-পালট করে দিয়েছে। অরবিন্দর কোনো উক্তি, কোনো কথাই ওর কানে প্রবেশ করেনি। ডক্টর ভাটনাগরের প্রশ্ন শুনে সে শুধু শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল।

ওর ভাবলেশহীন মুখ দেখে আর কেউ কোনো প্রশ্ন করল না। প্রত্যেকের ধারণা হল, গুড়িয়া চিনতে ভুল করেছে। শিমলার ঘটনায় মনীশই দায়ী? অরবিন্দ সম্পূর্ণ নির্দোষ।

'মিঃ সেন—' বিক্রম সিং অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে একবার যাবেন? আপনার বন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনাকেই দায়ের করতে হবে। পাসপোর্টটা আমি থানায় আপনাকে ফেরত দেবো।'

অরবিন্দ তাই চাইছিল। এই ফাঁদ থেকে নির্বিঘ্নে মুক্তি পাবার সুযোগ এভাবেই সে হাসিল করতে চায়। বিক্রম সিং-এর সঙ্গে বেরনোর আগে ডক্টর ভাটনাগর ও রাজেশের দিকে ঘুরে হাত জোড় করে বিনীত স্বরে বলল, 'তাহলে আমি চলি? —যদি কিছু অন্যায় করে থাকি আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন।'

ডক্টর ভাটনাগর অরবিন্দর দু হাত জড়িয়ে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ এভাবে লজ্জা দেবেন না। বরং আমরাই না বুঝে আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি—'

রাজেশ বলল, 'মিঃ সেন, ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আসলে…আপনার বন্ধু যে এত বড় অভিনেতা, এত বড় প্রতারক আমরা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।…এ ধাক্কা আমাদের সামলাতে বেশ সময় লাগবে…অদ্ভুত, গুড়িয়াকে অসুস্থ করে আবার নিজেই ওকে সুস্থ করার ভার নিয়েছিল!'

ডক্টর ভাটনাগর আতঙ্কের দৃষ্টিতে তাকালেন রাজেশের দিকে।

বিক্রম সিং-এর সাথে অরবিন্দ পা বাড়াল। ডক্টর ভাটনাগর ও রাজেশ অনুসরণ করল ওদের। পেছনে আর সবাই।

বিক্রম সিং যেতে যেতে বললেন, 'ডাক্তার সাহাব, ওর বিরুদ্ধে দুটো চার্জ ফ্রেমড হবে। একটা মিঃ সেনের অভিযোগে, দু নম্বর গুড়িয়া বেটির। আপনি দয়া করে গুড়িয়া বেটির কমপ্লেন আপনার রিপোর্টের সাথে তাড়াতাড়ি জমা দেবেন থানায়।'

ডক্টর ভাটনাগর ভাবনার ঘোরে মাথা নাড়লেন।

সঙ্গীতার ঘোর তখনো কাটেনি। গুড়িয়াও দেয়াল আঁকড়ে নিঃসাড়, নিস্পন্দ প্রায়।

ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে যাবার পর সঙ্গীতা সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকাল গুড়িয়ার দিকে। গুড়িয়ার নিথর দেহ, স্থির দৃষ্টি দেখে আকুল চোখে ছুটে এল কাছে।

'গুড়িয়া!' ওর দু কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল সঙ্গীতা।

চমক ভাঙল গুড়িয়ার। সঙ্গীতার দিকে তাকিয়ে চারপাশে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ও চলে গেছে ভাবী?'

'কে?'

গুড়িয়া মুখ নামাল—'না কেউ না?'

গুড়িয়ার হাব-ভাব তাকানোর ভঙ্গী একেবারে স্বাভাবিক ঠেকছে না। সঙ্গীতা ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'গুড়িয়া কষ্ট হচ্ছে তোর, কান্না পাচ্ছে? তাহলে কেঁদে ফেল্। তোকে দেখে আমার ভাল লাগছে না। কেঁদে ভাসিয়ে দে তোর সব দুঃখ।'

'না ভাবী, আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি তো ভাল হয়ে গেছি। আমি বেহুঁশও হব না আর। চলো।'

গুড়িয়া দরজার দিকে এগোলো। ওর দৃঢ় পদক্ষেপ। সঙ্গীতা ওর দিকে গাঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছেড়ে দিল ওর হাত।

বাইরে তখন জীপ স্টার্ট নিয়েছে। সঙ্গীতা ঘুরে জানলা দিয়ে দেখল। আবছা অন্ধকারে মনীশকে নিয়ে জীপটা চলে যাচ্ছে অন্ধকার থেকে আরো গভীর অন্ধকারে।

দরজার কাছে গিয়ে গুড়িয়া ঘুরে তাকাল। আবার যেন হুঁশ ফিরে পেল সে।

ছুটে গেল জানলার কাছে। দূরে স্তিমিত প্রায় জীপের শব্দের দিকে কান পেতে আর্তস্বরে বলে উঠল, 'ভাবী ও চলে গেল ?'

'হ্যাঁ।' সঙ্গীতা এবার বলল, 'ওরা নিয়ে গেল ওকে ?'

'আমাকে বলে গেল না একবার!' জানলার শিক ধরে গুড়িয়ার ঠোঁট কেঁপে উঠল থরথর করে।

ছুটে গেল সঙ্গীতা। কিন্তু তার আগেই গুড়িয়া প্রায় আছড়ে পড়েছে জানলায়। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'আমাকে বলে গেল না কেন ? কেন বলে গেল না ভাবী ?—ও ভুল করতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি না। ও নিরপরাধ ও নির্দোষ—'

সঙ্গীতা একটু আগে যা বলেছিল, এখন তাই করছে গুড়িয়া। কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে পৃথিবী। সঙ্গীতা শক্ত হাতে ধরেও ওকে সামলাতে পারছে না।

কলকাতা। তেসরা জুলাই। রাত দশটা।

ইন্দ্রনাথবাবু তার অফিস-ঘরের দরজায় এই অসময়ে প্রবীরকে দেখে অবাক। '—প্রবীর! কি ব্যাপার ?'

প্রবীর প্রায় টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল। 'কাকাবাবু!'

'কি হয়েছে ? তোমায় এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন ?'

'কাকাবাবু, মনীশের একটা চিঠি পেয়ে আপনার কাছে ছুটে আসছি।'

'বসো আগে— !' ইন্দ্রনাথবাবু প্রবীরের ঝোড়ো ঘর্মাক্ত মুখ দেখে বুঝলেন, ব্যাপার খুব গুরুতর। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে মনীশের ?'

প্রবীর সামনের চেয়ারে বসে কাঁপা স্বরে বলল, 'মনীশকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।'

'মনীশকে!' ইন্দ্রনাথবাবুর অবিশ্বাসের দৃষ্টি। 'কেন কি করেছে মনীশ ?'

'কাকাবাবু, আপনাকে আমার অনেক আগেই বলা উচিত ছিল···অনেক আগেই—'

উত্তেজিত প্রবীর তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে শুরু করল। আগাগোড়া সব, মনীশের কাহিনী। সোয়াব কোম্পানীর অফিসে ইন্টারভিউর দিন থেকে যা ঘটেছে।

সোয়াব কোম্পানীর অফিস।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুধীন চক্রবর্তী ভিজিটিং কার্ডটা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন তার চেম্বারে। ইন্দ্রনাথবাবু ব্রিফকেস নিয়ে প্রবেশ করলেন দরজা ঠেলে।

সুধীন চক্রবর্তী তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, 'মিঃ হালদার, তিনটে থেকে আমার বোর্ড মিটিং।—কাইন্ডলি একটু সংক্ষেপে বলবেন।'

'নিশ্চয়ই, খুব সংক্ষেপে বলব।' ইন্দ্রনাথবাবু চেয়ারে বসে হাতের ব্রিফকেস কার্পেটের ওপর দাঁড় করিয়ে বললেন, 'আপনাদের আজকের মিটিং-এ অ্যাজেন্ডা যা সে বিষয়েই আমি কথা বলতে এসেছি।'

সুধীন চক্রবর্তী তাকালেন, 'ইয়ু মিন, আমাদের তামিল্লার কারখানার ধর্মঘটের ব্যাপারে ?'

'ইয়েস মিঃ চক্রবর্তী—' ইন্দ্রনাথবাবু চেয়ারে গা এলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক'দিন ধরে চলছে এই ধর্মঘট ?'

তা প্রায় একমাস হয়ে গেল।'

'এক মাস !—এখনো কারখানা খুলতে পারলেন না ?'

'কি করে খুলব ? শ্রমিকেরা চার পাশ থেকে ঘিরে আছে কারখানা। পালা করে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে।'

'দাবি কি ওদের ?'

'দাবি নয়, বলুন অন্যায় আবদার।' সুধীন চক্রবর্তী তিক্ত স্বরে বললেন, 'আমাদের সম্প্রতি বরখাস্ত করা একজন অফিসারকে রি-ইনস্টেট করতে হবে। যাকে আমরা পুলিশ রিপোর্টের ওপর রং ইম্পার্সোনেশনের অপরাধে ডিসমিস করেছি।'

'আই সি—'

'একেবারে বেআইনী দাবি। একজন মিথ্যে পরিচয়ের অপরাধীকে আবার আমায় চাকরীতে নিতে হবে। এটা কি সম্ভব ? উচিত ?'

'কক্ষনো নয়!' ইন্দ্রনাথবাবু সজোরে মাথা নাড়লেন, 'আইন মেনে চলতে আপনারা বাধ্য। কিন্তু ঘটনাটা শ্রমিকদের বোঝাতে পারছেন না কেন ?'

'বহু চেষ্টা হয়েছে। আমাদের তরফ থেকে, সরকারের তরফ থেকে, পুলিশের তরফ থেকেও। কিছু হয়নি।' সুধীন চক্রবর্তী বিরক্তি ভরা স্বরে বললেন, 'ওরা ওদের দাবি থেকে নড়বে না। মনীশ সিংহকে ছাড়া কারখানা ওরা খুলতে দেবে না।'

'সত্যি, অন্যায় আবদার। পুরোপুরি বেআইনী দাবি।' ইন্দ্রনাথবাবু সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে স্বর পরিবর্তন করে হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে অভিযোগের কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু মিঃ চক্রবর্তী, মাস সাতেক আগে, আপনি এরকমই এক অন্যায় আবদার মেনে ওই মনীশ সিংহকে নাকচ করে অরবিন্দ সেনকে ওই পদে নিযুক্ত করেছিলেন। মনে আছে ?'

'আমি !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই অফিসারের পদের জন্য মনীশ সিংহ নির্বাচিত হয়েছিল। দেশের আইন, দেশের নিয়ম মেনে আপনারা তাকে নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু কোনো এক বিশেষ লোকের অন্যায় আবদার মানতে গিয়ে আপনি সেই নির্বাচন বাতিল করে দিয়েছিলেন। সেটা কি বে-আইনী নয়, অন্যায় নয় ?'

সুধীন চক্রবর্তী থমকে তাকালেন ইন্দ্রনাথবাবুর দিকে। তার চোখ দেখে বোঝা গেল ঘটনাটা তিনি মনে করতে পারছেন না।

ইন্দ্রনাথবাবু এবার স্বর নামিয়ে বললেন, 'মিঃ চক্রবর্তী, আপনি খুবই ব্যস্ত মানুষ। এই ঘটনা আপনার পক্ষে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। এবং আজ যিনি আপনাকে সব মনে করিয়ে দিতে পারতেন, দুর্ভাগ্যবশত তিনি কোম্পানীতে নেই—'

'কে ?' তাকালেন সুধীন চক্রবর্তী।

—'কার কথা বলছেন ?'

'আপনাদের এক্স চীফ পার্সোনেল অফিসার, মিঃ গোস্বামী। চার মাস আগে আপনাদের কোম্পানী থেকে রিটায়ার করেছেন। আপনি যদি প্রয়োজন মনে করেন তাঁকে এখুনি ফোন করে জেনে নিতে পারেন ঘটনাটা—,'

'দাঁড়ান দাঁড়ান—' সুধীন চক্রবর্তী চিবুকে হাত ঘষতে ঘষতে বললেন, 'হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে, তামিয়ার সিলেকশন, তাই তো।'

'মিঃ চক্রবর্তী—,' ইন্দ্রনাথবাবু টেবিলের ওপর ঝুঁকে বললেন, 'আপনি মানুষটা কেমন না জেনে আমি আসিনি এখানে। এসেছি ন্যায়ের জন্য, মানবিকতার জন্য। মনীশ সিংহের বিচার হবে। কিন্তু সেই বিচারের আগে আমাদের দেখতে হবে, অন্যের অন্যায় কৃতকর্মের দরুণ ওর ওপর কোনো অবিচার হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে মনীশের সঙ্গে সেও অপরাধী যে সেই অন্যায় করেছে।'

সুধীন চক্রবর্তী এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন ইন্দ্রনাথবাবুর দিকে। তার চোখে পরিতাপের ছোঁয়া, অনুতাপের আভাস।

ইন্দ্রনাথবাবু আরো বললেন, 'মিঃ চক্রবর্তী, মনীশ সিংহের ওপর আর যাতে অন্যায় না হয় তার জন্য আপনার তরফ থেকে আমি কিছু সহযোগিতা আশা করছি। অবশ্য তার পরিবর্তে আমিও আপনাদের একটি গুরুতর সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করব।'

'তামিয়ার কারখানা খোলার ব্যাপারে ?' সুধীন চক্রবর্তী আন্দাজ করে বললেন কথাটা।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ইন্দ্রনাথবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, 'ওই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে মনীশ সিংহের প্রতি যে ভালবাসার খবর পেলাম, সেটা সহজে কাটানো মুশকিল। আমি আপনার কাছে এমন এক সূত্র নিয়ে এসেছি যাতে কারখানাটা নির্বিঘ্নে খোলা যায় এবং তারই সাথে মনীশ সিংহের ওপর যেন অবিচার না হয়।'

সুধীন চক্রবর্তী ঝুঁকে টেবিলের ওপর খোলা ফাইলটা বন্ধ করে বললেন, 'বলুন মিঃ হালদার, কি আপনার সূত্র ?'

তামিয়া। দুপুর একটা।

গুড়িয়া হাতে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে নামছে সেই আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে। ওর পায়ে কোনো ছন্দ নেই আজ। দৃষ্টিতে কোনো উচ্ছলতা নেই। বিষণ্ণ, বিমর্ষ পদক্ষেপে হাঁটছে পথ হারা বিহ্বল হরিণীর মত।

প্রবীর দূর থেকে দেখেই চিনতে পারল। যদিও এর আগে ওদের দেখা কখনো হয়নি। গুড়িয়াকে এই প্রথম দেখল প্রবীর। অফিসে রাজেশ সাহানীর খোঁজ নিয়ে এখন সে যাচ্ছে তার কোয়ার্টারে।

গুড়িয়ার কথা মনীশের কাছেই শুনেছে প্রবীর। শিমলা পুলিস-হাজতে বসে। মনীশের মুখে গুড়িয়ার সামান্য কাহিনী শুনে প্রবীর বুঝতে পেরেছে, মনীশের প্রতি গুড়িয়ার ভালবাসা যে কত গভীর। মনীশও যে গুড়িয়াকে ভালবাসে সে

কথা মনীশ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে স্বীকার না করলেও ওর হাব-ভাব ইঙ্গিতে তাও এখন প্রবীরের কাছে গোপন নেই।

প্রবীর তারপর নানা কৌশলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গুড়িয়ার অনেক খবর জেনেছে মনীশের কাছে। তার মধ্যে একটি তথ্য ছিল, এই সময় গুড়িয়া রোজ বাবার খাবার দিতে আসে অফিসে।

ওরা কাছাকাছি এসে পড়ল।

পরস্পরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে গুড়িয়ার প্রায় মুখোমুখি এসে প্রবীর মন্থর করল ওর গতি। বন্ধু-প্রিয়াকে সে নিরীক্ষণ করল অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে।

গুড়িয়ার কোনো হুঁশ নেই। সে হেঁটে চলেছে উদভ্রান্তের মত। প্রবীরের পাশ কাটিয়ে উদাস দৃষ্টির সাথে এগিয়ে গেল ওর গন্তব্য স্থলের দিকে।

প্রবীর দাঁড়াল এক মুহূর্ত। ঘুরে দেখল গুড়িয়াকে। গুড়িয়ার চোখে যে বেদনার আভাস সে লক্ষ করল, সেই ব্যাথাতে মুচড়ে উঠল ওর বুক।

গুড়িয়ার দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রবীর আবার হাঁটা শুরু করল।

কলিং বেলের শব্দ শুনে সঙ্গীতা দরজা খুলে প্রবীরকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই ?'

'আপনি নিশ্চয়ই সঙ্গীতা ভাবী!' প্রবীরের সপ্রশংস দৃষ্টি।

কপালে ভাঁজ পড়ল সঙ্গীতার। দরজার পাল্লা পুরোপুরি খুলে বলল, 'আপনি ?'

প্রবীর ভেতরের সোফা কোচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু বসতে পারি ?'

অপ্রস্তুত সঙ্গীতা পথ ছেড়ে বলল, 'নিশ্চয়ই! আসুন।'

প্রবীর ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকে, বসল কোচে। কাঁধের ঝোলা এক পাশে রেখে ম্লান হেসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না ভাবী, আগে বসে পরিচয়টা দিচ্ছি। আমার নাম প্রবীর রায়। আমি মনীশের বন্ধু।'

'মনীশ!' তাকাল সঙ্গীতা।

'মনীশ। যাকে আপনি অরবিন্দভাই বলতেন—'

সঙ্গীতার চেহারা নিমেষে পালটে গেল। শক্ত হয়ে উঠল ওর মুখের শিরা-উপশিরা। কঠিন স্বরে বলল, 'আপনি এখানে কেন ?'

'অফিসেই গিয়েছিলাম।' প্রবীর বলল, 'শুনলাম, রাজেশভাইয়া টোঙ্গীতে গেছেন। তাই আপনার কাছে এসেছি।'

'কেন ? কিসের জন্য ?'

'আপনারা মনীশকে ভালবাসতেন, সে জন্য।'

'না।' সঙ্গীতা থমথমে স্বরে বলল, 'মনীশ নামে কাউকে আমরা চিনি না। তাকে আমরা ভালবাসিনি কখনো।'

'অরবিন্দ নামে কাউকে ভালবেসেছেন তো ?'

'বেসেছিলাম।' সঙ্গীতার কণ্ঠনালী বেদনায় কেঁপে উঠল। কঠিন স্বরেই বলল, 'সেটা মিথ্যে পরিচয় জানার পর এখন তাকে ঘৃণা করি।'

'ভাবী—' প্রবীর একটু থেমে বলল, 'ওর নামটাই শুধু মিথ্যে ছিল। আর সব কিন্তু সত্যি। ওর মন, মানসিকতা। ওর ভালবাসা। ওর সহানুভূতি, সমবেদনা। মনীশের এই সব গুণ সূর্যের আলোর মত সত্যি। সোনার মত খাঁটি।'

'আমি বিশ্বাস করি না। যার নাম, পরিচয় মিথ্যে তার সবই মিথ্যে।'

'ভাবী, আর সবই হয়ত মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু কারো সমবেদনা, সহানুভূতি মিথ্যে হতে পারে না। মনিশ গুড়িয়াকে সুস্থ করেছে সেই অন্তরের অনুভূতি থেকে।'

'কি মূল্য এই অনুভূতির?' সঙ্গীতা তির্যক স্বরে বলল, সুস্থ করে গুড়িয়াকে আবার সে অসুস্থ করে গেছে। ওর মনের একটা ক্ষত ভাল করে আরেকটা ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে। কেন হল এমন? কিসের জন্য হল? সে প্রতারক, প্রবঞ্চক সেজন্যই। এই সহানুভূতি, সমবেদনা ওর নিছক লোক দেখানো ছিল। ভাল সেজে থাকার মুখোশ।'

প্রবীরের মুখ এবার থমথমে হয়ে উঠল। বন্ধুর জন্য বেদনায় কাতর।

একটা ব্যথাতুর ঘন নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ভাবী, মুখোশে মুখ ঢাকা যায়। মন ঢাকা যায় না। কারো মনের ভেতর যদি পোকা থাকে কখনো না কখনো প্রকাশ পাবেই। আপনি মনের গভীর থেকে বলুন, দীর্ঘ ছ'মাস ধরে দেখেছেন আমার বন্ধুকে, কখনো পলকের জন্যও মনে হয়েছে—সে প্রতারক, প্রবঞ্চক? ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ওর মুখের ভাবে, সামান্য আকারে ইঙ্গিতে কখনো মনে হয়েছে সে আপনার-জন নয়, একজন অপরাধী?'

সঙ্গীতার দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠল ভাবনা মিশ্রিত এক অস্বস্তি। তবে পরমুহূর্তে কঠিন অভিমানের স্বরে বলল, 'মনে হয়নি বলেই যখন জানলাম সে অপরাধী দুঃখটা আমরা পেয়েছি মর্মান্তিক। মনের অনেক গভীরে।'

'ভাবি, আপনাদের দুঃখই আমাকে টেনে এনেছে এখানে।' প্রবীর আবেগমথিত স্বরে বলল, 'আমি শুধু চাই, আমার বন্ধু যার সমব্যথী মনের কোমল ছোঁয়া আমি ছোটোবেলা থেকে পেয়ে এসেছি, যার মন যে কত সৎ আমি ছেলেবেলা থেকে জানি তাকে অন্তত আপনারা যেন ভুল না বোঝেন। যদি তাকে ভুল বোঝেন সেটা আমার পক্ষে আপনাদের পাওয়া দুঃখের চেয়েও মর্মান্তিক হবে।—শুধু কয়েকটা কথা আমি বলতে চাই আমার বন্ধু সম্বন্ধে। দয়া করে বসবেন দশ মিনিটের জন্য—?'

সঙ্গীতা প্রবীরের আকুল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বসল ওর সামনে।

শিমলা। সময় সকাল এগারোটা পাঁচ।

জেলা জজের এজলাসে আজ কোনো চাঞ্চল্য নেই, ভীড়ও নেই। অথচ বাদী সোরাব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের অভিযোগে মনীশ সিংহের বিরুদ্ধে শুনানী আর খানিকক্ষণ পরেই শুরু হবে এখানে।

বেঞ্চ ক্লার্ক ও স্টেনোগ্রাফার প্রয়োজনীয় ফাইল-পত্র টেবিলে বার করে প্রস্তুত।

পাবলিক প্রসিকিউটর মধ্যবয়সী লালজী তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে পড়েছেন। এখন অপেক্ষা শুধু সোয়াব ইণ্ডিয়ার তরফে অ্যাডভোকেট মিরচান্দানী সাহেবের জন্য।

দর্শকদের আসনে আজ মাত্র কয়েকজন বসে। যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে মনে হয় এই কেসের কোনো সম্পর্ক নেই। অতি উৎসুক দর্শক তারা। কোর্টে বিচার দেখতে এসে বসে পড়েছে এজলাসে।

বেঞ্চ ক্লার্ক গুলাব সিং লালজীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার সাহায্যকারী কোথায়? কোম্পানীর উকিল?'

লালজী কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে বললেন, 'বার লাইব্রেরীতে। কলকাতা থেকে কোম্পানীর বড় সাহেবেরা এসেছেন। পরামর্শ চলছে—।'

'এই কেসের আবার পরামর্শ ?' স্টেনোগ্রাফার কানাইয়া প্রসাদ ভুরু কুঁচকে তাকাল—'আসামী লিখিত স্বীকারোক্তি দাখিল করেছে। কেস লড়বে কে ?'

'কেউ না। ফাঁকা ময়দান।' লালজী বললেন, 'আজকের কেস গিনিজ বুক অফ রেকর্ডে উঠবে, বুঝলে ? সবচেয়ে কম সময়ের বিচার। জজ সাহেব আসবেন, বক্তব্য শুনবেন, স্বীকারোক্তি দেখবেন, রায় দিয়ে চলে যাবেন।'

পেছনে জুতোর মচমচ শব্দ হল। ঘুরে দেখল ওরা। বাঁ দিকের দরজা দিয়ে দুজন কনস্টেবল মনীশকে সঙ্গে নিয়ে আসামীদের ঘেরা জায়গায় প্রবেশ করছে। উপস্থিত সবার দৃষ্টি মনীশের দিকে। মনীশের রুগ্ন, বিবর্ণ চেহারা। ভাসা-ভাসা দৃষ্টি। নত মুখে কনস্টেবল দুজনের ইশারায় বসে পড়ল একটা টুলে।

কনস্টেবল দুজন মনীশকে বসিয়ে দেয়ালেব দিকে সরে দাঁড়াল।

ডান দিকের দরজা দিয়ে সোয়াব ইণ্ডিয়ার বয়স্ক অ্যাডভোকেট বাসুদেব মিরচান্দানি প্রবেশ করলেন। তিনি সোজা বিচারক মঞ্চের কাছে এসে লালজীর পাশে একটা ছেড়ে তৃতীয় চেয়ারটায় বসলেন।

এগারোটা কুড়িতে মাননীয় বিচারক দেবেন্দ্রলাল চৌহান প্রবেশ করলেন এজলাসে। সঙ্গে সঙ্গে আসন থেকে উঠে দাঁড়াল সবাই। তিনি আসন গ্রহণ করার পর ধীরে ধীরে প্রত্যেকে বসল আবার।

লালজী কাগজপত্র হাতে নিয়ে প্রস্তুত হলেন। তার ইশারায় কনস্টেবল দুজন দ্রুত মনীশকে টুল থেকে উঠিয়ে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল।

সেই মুহূর্তে বারান্দার দরজা দিয়ে প্রবেশ করল প্রবীর। তারপর একে একে রাজেশ, সঙ্গীতা ও ডক্টর ভাটনাগর। সব শেষে গুড়িয়ার হাত ধরে লীলা।

মনীশ থমকে তাকাল। প্রবীর আসবে জানা কথা। কিন্তু ওর সঙ্গী আর সবাই ওর কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। বিশেষ করে লীলাকে দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল ওর চোখ।

লীলা ছলছল চোখে তাকাল দাদার দিকে। গুড়িয়ারও সজল আঁখি। রাজেশ সঙ্গীতা ও ডক্টর ভাটনাগরের আহত দৃষ্টি। মনীশ উদাস চোখে সবার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ফিরিয়ে নিল ওর দৃষ্টি।

ওরা ধীর পায়ে দর্শকাসনের দিকে এগিয়ে গেল।

লালজী ইতিমধ্যে বিচারকের আসনের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেছেন, 'মি লর্ড—ভারতীয় দণ্ডবিধির চারশো ষোলো ধারা অনুযায়ী আজকের কেসের অভিযুক্ত আসামী হলেন, মনীশ সিন্‌হা। যাঁর পিতার নাম পরিতোষ সিন্‌হা, সাকিন একশো বিয়াল্লিশের দুই বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা, বেলেঘাটা থানার অধীনে।—এই মনীশ সিন্‌হা দীর্ঘ ছ'মাস যাবৎ জ্ঞানতঃ তাঁর নিজের আসল পরিচয় গোপন করে মিথ্যে পরিচয় ধারণ করে কলকাতার নামী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সোয়াব ইণ্ডিয়া লিমিটেডকে প্রতারণা করেছেন। প্রতারণা করেছেন বহু মানুষের সাথে। তার মধ্যে আছে তাঁর অজস্র সহকর্মী, প্রতিবেশী, তামিয়ার আরো বহু বাসিন্দা।—কি ভাবে নিলেন তিনি এই মিথ্যে পরিচয়? তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হল এই—মনীশ সিন্‌হার বন্ধু হলেন অরবিন্দ সেন যার পিতার নাম সঞ্জয় সেন, সাকিন দুশো চৌত্রিশের বি যোধপুর পার্ক, কলকাতা, ঢাকুরিয়া থানার অধীনে। অরবিন্দ সেন গত জানুয়ারী মাসে একটি ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে সোয়াব ইণ্ডিয়ার তামিয়া কারখানায় অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের পদটি লাভ করেন। বন্ধুত্বের সূত্রে অরবিন্দ সেনের বাড়িতে মনীশ সিন্‌হার যাতায়াত ছিল। অরবিন্দ সেন সোয়াব ইণ্ডিয়ার নিয়োগ-পত্র পাওয়ার পর কোনো ব্যক্তিগত কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যে চাকরীটি তিনি করবেন না। বন্ধু মনীশ সিন্‌হার কাছে এই ইচ্ছা একদিন তিনি প্রকাশ করেছিলেন। সোয়াব ইণ্ডিয়ার এই চাকরীটি সব দিক দিয়ে আকর্ষণীয়। যেমন তার লোভনীয় বেতন তেমনি চমৎকার অন্যান্য সুযোগ সুবিধে। মনীশ সিন্‌হা এর লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি তখন বেকার। অরবিন্দ সেনের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে একদিন তাঁর টেবিলের ড্রয়ার থেকে সোয়াব ইণ্ডিয়ার নিয়োগ-পত্রটি তিনি আত্মসাৎ করলেন—'

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মনীশের চোখ-মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। বিচারকের দিকে তাকিয়ে যন্ত্রণা-কাতর স্বরে সে বলে উঠল, 'না!'

লালজী থেমে গেলেন। বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকালেন মনীশের দিকে।

বিচারক মনীশের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আপনি কিছু বলবেন?'

মনীশ নম্র স্বরে বলল, 'মহানুভব বিচারপতি, আমি নিয়োগপত্র আত্মসাৎ করিনি।'

'আত্মসাৎ করেন নি?' লালজী মনীশের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বিচারকের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গপূর্ণ স্বরে বললেন, 'মি লর্ড', তাহলে কি উনি বলতে চান, চোর সিঁধ কেটে বাড়িতে ঢোকার পর গৃহস্থ নিজেই জিনিষপত্র চোরের হাতে তুলে দিয়েছেন?'

বিচারক মনীশের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'আপনি কি বলতে চান, স্পষ্ট করে বলুন। আদালত আপনার কথাও শুনবে।'

'মহানুভব বিচারপতি—' মনীশ অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমি নিয়োগপত্র চুরি করিনি, শুধু এইটুকুই আমার বক্তব্য। যা ঘটেছে, যা সত্যি আমি তাই বলতে চাই।'

লালজী তীব্র বিদ্রূপের ঝাঁঝ, নিয়ে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন 'মি লর্ড', একজন প্রতারকের কাছ থেকে আমাকে জানতে হবে কোন্‌টা সত্যি কোন্‌ট মিথ্যে ?'

বিচারক মনীশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার বক্তব্যও লিপিবদ্ধ হয়ে রইল—'

লালজী তারপর বিচারকের নির্দেশে আবার বলতে শুরু করলেন—'মি লর্ড', মনীশ সিন্‌হা নিয়োগ-পত্রটি চুরি করেছেন কি করেন নি, এই প্রশ্নের উত্তরের এখন কোনো মূল্যই নেই। কারণ তিনি নিজে এই নিয়োগ-পত্র সোয়াব কোম্পানীর তামিয় অবস্থিত অফিসে দাখিল করে চাকরীটি হাসিল করেছেন। এই চাকরী মনীশ সিন্‌হার কাছে একটি কোষাগারের সমতুল্য। এই কোষাগার থেকে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে পেয়েছেন প্রভূত অর্থ বেতন স্বরূপ, পেয়েছেন সম্মান, আরো বহু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়োগ-পত্রটি এই কোষাগারের একটি চাবি মাত্র। চাবিটি তিনি কি করে পেলেন আত্মসাৎ করে, না ভয় দেখিয়ে, না ব্ল্যাক মেল করে সেটা এখানে গৌণ। আসল কথা অন্যের কোষাগার তিনি লুঠ করেছেন। তাতে অনধিকার প্রবেশ করে তার অর্থ সুযোগ-সুবিধে ভোগ করেছেন। তিনি দীর্ঘ ছ'মাস যাবৎ অরবিন্দ সেনের পরিচয় নিয়ে সোয়াব ইণ্ডিয়ার তামিয়ার কারখানায় অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে নিজেকে বহাল রেখেছেন। তার সাক্ষ্য, প্রমাণ সোয়াব কোম্পানীর ফাইলে ফাইলে নথিবদ্ধ আছে। সাক্ষী তামিয়ার প্রতিটি মানুষ। এবং সোয়াব কোম্পানী তাদের অভিযোগের সাথে এ বিষয়ে বহু দলিল দস্তাবেজ আদালতে দাখিল করেছে। যেহেতু অভিযুক্ত আসামী নিজেই অপরাধ স্বীকার করে তার হলফনামা আদালতে জমা দিয়েছেন আমি মহামান্য বিচারকের সামনে কোনো সাক্ষী উপস্থিত করার ব্যবস্থা করিনি। তবে যদি মাননীয় বিচারক মহাশয় প্রয়োজন বোধ করেন, সাক্ষী ও অনান্য সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে হাজির করতে আমি প্রস্তুত আছি। এই প্রসঙ্গে আমি কেস অ্যাপলিকেশন সংলগ্ন অভিযুক্ত আসামীর স্বীকারোক্তি অ্যানেকসার ওয়ানের প্রতি মহামান্য বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং মহামান্য বিচারককে অনুরোধ করছি, এই স্বীকারোক্তিটি এগজিবিট 'এ' হিসেবে চিহ্নিত করা হোক।'

লালজী থামলেন।

বিচারপতি তাঁর সামনের কাগজ উলটে মনীশের স্বীকারোক্তিটি দেখলেন। তারপর বেঞ্চ ক্লার্ককে নির্দেশ দিলেন স্বীকারোক্তিটিকে এগজিবিট 'এ' হিসেবে চিহ্নিত করতে।

লালজী বিচারকের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন—'মহামান্য বিচারককে এখন আমি অনুরোধ করব, সোয়াব কোম্পানীর প্রবক্তা আমার সহযোগী অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত মিরচান্দানীর বক্তব্য শুনতে— ।'

বাসুদেব মিরচান্দানী এতক্ষণ স্থাণুর মত নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন তাঁর চেয়ারে। নড়ে চড়ে তাকালেন একবার। তারপর এক গুচ্ছ কাগজ হাতে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার থেকে।

লালজী বসলেন তার আসনে। বিচারক মিঃ মিরচান্দানিকে নির্দেশ দিলেন বক্তব্য শুরু করতে।

মিঃ মিরচান্দানি চেয়ার থেকে উঠে সেখানে দাঁড়িয়েই ধীর কণ্ঠে বললেন, 'মাননীয় বিচারপতি, মনীশ সিন্‌হা নামে যাকে আজ ভারতীয় আইনের চারশো ষোলো ধারা অনুযায়ী নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে ভিন্ন পরিচয় ধারণ করার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে, সোয়াব ইণ্ডিয়া লিমিটেড তার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে।'

আকস্মিক এই ঘোষণায় আদালতে যেন একটা বজ্রপাত হল। উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত চোখে তাকাল মিরচান্দানি সাহেবের দিকে। বিচারপতির চোখেও বিস্ময়।

সবচেয়ে বেশী বিস্মিত হলেন লালজী। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অবাক স্বরে বলে উঠলেন, 'মিঃ মিরচান্দানি, এ কি বলছেন আপনি!'

মিরচান্দানি সাহেব তাঁর দিকে ঘুরে বললেন, 'ক্ষমা করবেন লালজী, সিদ্ধান্ত এই মাত্র নিতে হল। তাই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ পাইনি।' তারপর হাতের একটি কাগজ বেঞ্চ-ক্লার্কের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি সোয়াব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের তরফ থেকে এই অভিযোগ প্রত্যাহার করার দরখাস্ত মাননীয় বিচারপতির কাছে উপস্থিত করছি—'

বেঞ্চ-ক্লার্ক উঠে দাঁড়িয়ে দরখাস্তটা নিয়ে বিচারপতির হাতে তুলে দিলেন।

মিরচান্দানি সাহেব আরেকটি কাগজে লালজীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার প্রতিলিপি।'

লালজী অসন্তুষ্ট মুখে ভুরু কুঁচকে পড়লেন প্রতিলিপিটা। তারপর বিচারপতির দিকে তাকালেন। বিচারপতিও দরখাস্তটা পড়ে চাইলেন লালজীর দিকে।

লালজী স্বরে তিক্ততা নিয়ে বললেন, 'মি লর্ড এ অদ্ভুত দরখাস্ত! আসামী কোম্পানীর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। কোম্পানীর অভিযোগে তামিয়া থানা আসামীর বিরুদ্ধে কেস প্রস্তুত করেছে, আর আজ কোম্পানী তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে! তার অর্থ কি এই, কোম্পানী বলতে চায় আসামী নির্দোষ?'

মিরচান্দানি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'না, মি লর্ড, দরখাস্তে এ কথার উল্লেখ একবারও করা হয়নি যে মনীশ সিন্‌হা নির্দোষ।'

বিচারক চৌহান গম্ভীর স্বরে বললেন, 'তাহলে, আপনারা অভিযোগ তুলে নিচ্ছেন কেন?'

মিরচান্দানি সাহেব বিনীত স্বরে বললেন, 'মি লর্ড, আইনের কোনো জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, সোয়াব ইণ্ডিয়া লিমিটেড তার বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর নির্দেশ অনুযায়ী এই কেস থেকে সরে দাঁড়াতে চায়। কোম্পানীর আর ইচ্ছে নেই এই কেস পরিচালনা করার।'

'অদ্ভুত—!' লালজী তীক্ষ্ম স্বরে বললেন, 'এ যেন পুলিশকে ডেকে গৃহস্থ নিজেই চোরকে লুকোচ্ছে! কিন্তু মনে রাখবেন মিঃ মিরচান্দানি, পুলিশ পুলিশের

কাজ করবে। আদালতও তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে না।' লালজী বিচারকের দিকে ঘুরে গম্ভীর স্বরে বললেন, মি লর্ড, আমার মনে হয় এই কেস থেকে কোম্পানীর বিরত হওয়ার দোষীর বিচারে কোনো বাধা আসবে না। উপরন্তু বিচার আরো ত্বরান্বিত হবে। আসামী নির্দোষ না দোষী তা কোম্পানীর বয়ানের অপেক্ষা রাখে না। মাননীয় বিচারকের সম্মুখে কোম্পানীরই দাখিল করা বহু দলিল-দস্তাবেজ হাজির আছে। সর্বোপরি আছে অভিযুক্ত আসামীর স্বীকারোক্তি। যদিও আমি মনে করি, এই স্বীকারোক্তি আসামীর তরফে বিনয়ের একটি ভান মাত্র। এবং তিনি এটি দাখিল করেছেন মাননীয় বিচারককে প্রভাবিত করতে নিজের মারাত্মক অপরাধের জন্য সাজা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে। আমি মাননীয় বিচারককে অনুরোধ করব ভারতীয় দণ্ডবিধির চারশো ষোলো ধারায় ধার্য্য সর্বাধিক সাজা তাকে প্রদান করতে।'

উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ লালজী তার আসনে এসে বসে পড়লেন এবার।

বিচারক কেসের কাগজ-পত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে স্বীকারোক্তিটি হাতে তুলে মনীশের দিকে ঘুরলেন।

বিচারক—'এই স্বীকারোক্তি আপনার নিজের হাতে লেখা?'

মনীশ—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বিচারক—'এর সম্পূর্ণ বক্তব্য আপনার নিজস্ব?'

মনীশ—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বিচারক—'এই স্বীকারোক্তি লিখতে আপনার ওপর কেউ কি কোনো প্রভাব বিস্তার করেছে কিংবা কারো চাপে পড়ে কি আপনি এটি লিখেছেন?'

মনীশ—'আজ্ঞে না।'

বিচারক—'আপনি অবগত আছেন যে এর জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী আপনাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

মনীশ—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বিচারক—'এ বিষয়ে আপনার আর কোনো বক্তব্য আছে?'

মনীশ—'আজ্ঞে না।'

সেই মুহূর্তে আইনজ্ঞের পোশাক পরা ইন্দ্রনাথ বাবু হাতে একটা ফাইল নিয়ে আদালত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলেন। দ্রুত পায়ে বিচারকের আসনের সামনে এসে তিনি বললেন, 'মি লর্ড, মনীশ সিন্‌হার তরফে আদালতকে আমি কিছু বলতে চাই।'

মনীশের অবাক দৃষ্টি। আপন মনে বিড় বিড় করে উঠল, 'কাকাবাবু!'

প্রবীর, রাজেশ সঙ্গীতা, ডক্টর ভাটনাগর ও হাত ধরাধরি করে গুড়িয়া-লীলা চোখে-মুখে আতঙ্ক নিয়ে এতক্ষণ শুনছিল সব। রুদ্ধশ্বাসে শক্ত, পাথর হয়ে গিয়েছিল ওদের দেহ। ইন্দ্রনাথবাবুকে দেখে সবার শুকনো মুখে প্রাণের বান ফিরে এল যেন। গুড়িয়া ও লীলা ছলছল চোখে আশার দীপ্তি নিয়ে তাকাল তাঁর দিকে।

লালজী ইন্দ্রনাথ বাবুর দিকে ঘুরে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আপনি?'

ইন্দ্রনাথবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'পোশাকে পেশাটা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। আমার নাম ইন্দ্রনাথ হালদার। কলকাতা হাইকোর্টে আমি ওকালতি করি। আর কিছু জানতে চান?'

'আলবৎ।' লালজী উগ্র গলায় বললেন, 'হঠাৎ উল্কার মত কেসের মাঝখানে আবির্ভূত হয়ে কিছু বলতে চাইলেই কি বলা যায় মিঃ হালদার? আপনার পেশা যখন ওকালতি, এইটুকু আইন জানেন নিশ্চয়ই।'

—'জানি।' ইন্দ্রনাথ বাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, 'আমি অধিকার বলেই এসেছি।'

'অধিকার? লালজী ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

'মি লর্ড,' ইন্দ্রনাথ বাবু বিচারককে সম্বোধন করে বললেন, 'মনীশ সিন্‌হার মা শ্রীমতি গায়ত্রী সিন্‌হা আমাকে তাঁর পুত্রের তরফে কৌসুলী নিযুক্ত করেছেন—এই তাঁর নিয়োগ-পত্র—'

ইন্দ্রনাথ বাবু কোটের পকেট থেকে নিয়োগ-পত্রটা বার করে বেঞ্চ-ক্লার্ক মার্ফত বিচরকের সামনে পেশ করলেন।

বিচারক নিয়োগ-পত্রের সম্পূর্ণ বয়ান পড়ে বললেন, 'মিঃ হালদার, আপনি কি অভিযুক্ত আসামীকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইছেন?'

'না মি লর্ড', মনীশ সিন্‌হা দোষী সে নিজেই স্বীকার করেছে। আমি শুধু কিছু তথ্য পেশ করতে চাই। মনীশ সিন্‌হার অপরাধের পশ্চাত-পট। আমার মনে হয়, মহামান্য বিচারক এই পশ্চাত কাহিনী অবগত হয়ে যদি মনীশ সিন্‌হার বিচার করেন তাহলেই তার ওপর সুবিচার হবে অবিচার নয়।'

বিচারক নিয়োগ-পত্রটা বেঞ্চ-ক্লার্কের হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হল। এর সাথে আদালত আজ মুলতুবী হোক।'

বিচারক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

শিমলা জেলা জজের এজলাসে তারপরের শুনানির দিন থেকে শুরু হল সরকারী উকিল লালজীর সাথে ইন্দ্রনাথবাবুর লড়াই। ইন্দ্রনাথবাবু সাক্ষীর কাঠগড়ায় প্রথম দিনই হাজির করলেন সোয়াব কোম্পানীর প্রাক্তন চীফ পার্সোনেল অফিসার মিঃ গোস্বামীকে। তিনি সাক্ষ্য দিলেন যে গত জানুয়ারী মাসে কোম্পানীর তামিয়া কারখানার জন্য অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ইন্টারভিউ ও অবজেকটিভ টেস্টে মনীশ প্রথম হয়েছিল আর অরবিন্দ সেই ইন্টারভিউ ও পরীক্ষায় নিম্নতম মানও সংগ্রহ করতে পারেনি। এর প্রমাণ স্বরূপ কোম্পানীর বিভিন্ন কাগজ-পত্র, পরীক্ষার খাতাও দাখিল করা হল আদালতে।

সোয়াব কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ চক্রবর্তী তার সাক্ষ্যতে স্বীকার করলেন যে কোম্পানীর ইন্টারভিউ বোর্ড কোম্পানীর নির্ধারিত বিধি-নিয়ম অনুযায়ী তামিয়ার অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে মনীশকে নির্বাচিত করেছিল। কিন্তু কোনো এক বিশেষ 'জন-প্রতিনিধির' চাপে পড়ে তিনি এই নির্বাচন বাতিল করে

অরবিন্দ সেনকে ওই পদে নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মিঃ চক্রবর্তী অবশ্য তাঁর বয়ানে বললেন, এই জন-প্রতিনিধির নাম আদালতে পেশ করতে তিনি অক্ষম, কারণ এই যোগাযোগের কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ তার কাছে নেই।

ইন্দ্রনাথবাবু তারপর আদালতে একে একে হাজির করলেন মনীশের স্কুলের এক অধ্যাপককে, ওর ছোটোবেলার বন্ধু প্রবীরকে, কলকাতার প্রতিবেশী গৌতমকে ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সেই বর্ষীয়ান নার্স ভদ্রমহিলাকে। হাজির করা হল তামিয়ার বহু শ্রমিকের সাথে মহাবীর সিংকে, ক্যাপ্টিন বয় নয়ন সুখকে এবং সব শেষে ডক্টর ভাটনাগরকে। প্রত্যেকের সাক্ষ্য থেকে বিচারক মনীশের ভিন্ন একটি সত্তার পরিচয় পেলেন। জানতে পারলেন, মনীশ আসলে মানুষটা কেমন। মনীশকে বাইরে রেখে তামিয়ার শ্রমিকের দল যে কারখানায় যোগ দিতে ইচ্ছুক নয় সেটাও তিনি গুরুত্ব দিয়ে শুনলেন। শুনলেন ডক্টর ভাটনাগরের সাক্ষ্যে গুড়িয়ার সুস্থ হওয়ার আবেগময় কাহিনী।

অবশেষে কাঠগড়ায় হাজির করা হল হাতকড়া পরা অরবিন্দকে। কয়েকদিন আগে নিউ ইয়র্ক পুলিশ, ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাকে বোম্বাই থেকে গ্রেপ্তার করেছে। আপাতত তাকে শিমলা ও তামিয়া পুলিশ আটক করে রেখেছে এই কেসের সাক্ষী হিসেবে এবং দু'বছর আগে গুড়িয়ার ওপর শ্লীলতাহানির আক্রমণের অভিযুক্ত আসামী হিসেবে।

ধীরে ধীরে মনীশের কেসের শেষ বিচারের দিন এগিয়ে এল। মনীশের তরফে ইন্দ্রনাথবাবু বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণাদি আদালতে উপস্থিত করে আজ তার চূড়ান্ত বক্তব্য বিচারকের সামনে পেশ করবেন। এ ক'দিন রাজেশ ও ডক্টর ভাটনাগর তাঁদের কাজের জন্য নিয়মিত আদালতে আসতে না পারলেও গুড়িয়া, লীলা ও সঙ্গীতা প্রবীরের সঙ্গে প্রতি শুনানির দিন দর্শকাসনে হাজির থাকত। কিন্তু আজ ওদের সাথে রাজেশ ও ডক্টর ভাটনাগরও উপস্থিত।

ওদিকে আসামীর একটি কাঠগড়ায় মনীশ দাঁড়িয়ে। আরেকটিতে অরবিন্দ। অরবিন্দর ডান হাতে আজও হাতকড়া লাগানো। একজন কনস্টেবল সেই হাত কড়ার দড়ি ধরে পাশে দাঁড়িয়ে।

বিচারকের আসনের সামনে লালজী ও মিরচান্দানি সাহেবও উপস্থিত। যথা সময় মাননীয় বিচারক এজলাসে এলেন। তাঁর নির্দেশ পেয়ে ইন্দ্রনাথবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর শুরু করলেন তাঁর শেষ বক্তব্য।

'মাননীয় বিচারক মহোদয়—

আমি দীর্ঘদিন ধরে আপনার সামনে মনীশ সিন্‌হার অরবিন্দ সেন হওয়ার পশ্চাত পট কাহিনীটি উপস্থিত করলাম। আমার আশা ও বিশ্বাস, এই মর্মান্তিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের, আমাদের এই সমাজের একটি রূঢ় বাস্তব চিত্র আজ এই আদালতের সামনে উপস্থিত করতে পেরেছি। এই কাহিনী শুধু মনীশ সিন্‌হার কাহিনী নয়—এই দেশের আরো অনেক অনেক সৎ, সরল মানুষের কাহিনী। যারা সৎ পথে সামাজিক,

মানবিক বিধি-নিয়ম মেনে আপ্রাণ জীবন-যুদ্ধ করে চলেছে—করে চলেছে আর পাঁচজনের মত রুটি-রোজগারের জন্য। একটু মানুষের মত বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে জীবন নির্বাহের জন্য।

—কি চায় এরা? শুধু একটি চাকরী। কোনো ধন-দৌলত নয়। জাঁক-জমক পূর্ণ জীবন নয়। ভোগ বিলাসও নয়। নিজের পরিশ্রমের পরিবর্তে এরা চায় রুটি রোজগার করতে। সহজ সরল পথে। মনীশ সিন্‌হাও তাই চেয়েছিলেন। একটি চাকরী। কারণ এই চাকরীটি ছিল তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায়। মণীশ সিন্‌হা ছোটোবেলায় তাঁর পিতাকে হারিয়েছেন। তাঁর মা মরণোন্মুখ রোগে শয্যাশায়ী। তাঁর একটি ছোটো বোন আছে। এবং তিনিই তাঁর পরিবারের একমাত্র সদস্য যাঁর একটি চাকরী পাওয়ার যোগ্যতা আছে। এই যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছেন বহু কষ্টে, বহু অভাবের মধ্যে থেকে। তাঁর অসুস্থ মা যথাসম্ভব সামান্য রোজগার করে পুত্রকে শিক্ষিত হতে সাহায্য করেছেন। কেন? কিসের জন্য? শুধু একটি চাকরীর জন্য। মনীশ সিন্‌হা চাকরী করে চরম অভাবগ্রস্ত এই সংসারের হাল ধরবেন, এই আশায়। কিন্তু তিনি পেলেন কি চাকরী? না। মনীশ সিন্‌হা একজন কৃতি অনার্স গ্র্যাজুয়েট হওয়া সত্বেও, পরিশ্রমী-অধ্যবসায়ী হওয়া সত্বেও দীর্ঘ দু'বছর হন্যে হয়ে একের পর এক ইন্টারভিউ দিয়েও একটিও চাকরী তিনি জোগাড় করতে পারলেন না।'

বলতে বলতে থামলেন ইন্দ্রনাথবাবু। সামনে এগিয়ে টেবিলের ওপর থেকে জলের গ্লাস তুলে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে তারপর আবার বলতে শুরু করলেন—'মাননীয় বিচারপতি, দেশে আজ চাকরীর কি অবস্থা তা সবার কাছেই সুস্পষ্ট। ভয়াবহ বেকারী আজ সর্বত্র। লক্ষ লক্ষ বেকার আমাদের চতুর্দিকে—ঘরে ঘরে। এই নিদারুণ অবস্থায় একটি চাকরীর জন্য নির্বাচিত হওয়া, যে কোনো বেকার যুবকের পক্ষে কত বড় যে আশীর্ব্বাদ তা বলা বাহুল্য। বিশেষ করে, মনীশ সিন্‌হার মত দরিদ্র, অভাবী যুবক যদি এই তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে কোনো চাকরীর জন্য নির্বাচিত হন তাহলে সেটা তার পক্ষে, তার পরিবারের পক্ষে শুধু আশীর্ব্বাদ নয় মৃত সঞ্জীবনীর সমতুল্য একটি সাধন। কিন্তু কত বড় দুঃখের কথা, লজ্জার কথা, সোয়াব ইণ্ডিয়ার চাকরীতে নির্বাচিত হয়েও সেই চাকরী তিনি হারালেন এক মহানুভব 'জন-প্রতিনিধির' অদৃশ্য নির্দেশে। মনীশ সিন্‌হার পরিবর্তে সেই নির্দেশে চাকরীটি হাসিল করলেন কে? এই অরবিন্দ সেন।'

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অরবিন্দ সেন মুখ সরিয়ে নিল অন্যদিকে।

'—কে এই অরবিন্দ সেন? কি তার পরিচয়?' অরবিন্দর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে ইন্দ্রনাথবাবু বললেন, 'তিনি এক স্বনামধন্যা তথাকথিত সমাজ সেবিকার পুত্র।—অরবিন্দ সেনের জীবন ধারণের আদব-কায়দা ভিন্ন ধরণের। এই জীবন পদ্ধতির অবধারিত পরিণতিতে আজ অরবিন্দ সেন শুধু এক নাবালিকার শ্লীলতাহানির জঘন্য প্রচেষ্টার জন্য অভিযুক্ত নন, তিনি আমেরিকায় এক বারবণিতাকে হত্যার দায়েও অভিযুক্ত আসামী।—মহামান্য বিচারপতি, কত লজ্জার কথা, এই অরবিন্দ সেনকে শুধু সোয়াব ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে নয় আরো দুটি প্রতিষ্ঠানেও দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত

করা হয়েছিল। শিমলায় ও দিল্লীতে। অথচ মনীশ সিনহা ও অরবিন্দ সেন একই সাথে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট ও মার্কশীট অনুযায়ী মনীশ সিনহা অরবিন্দ সেনের চেয়ে অনেক অনেক বেশী মেধাবী। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, গ্র্যাজুয়েট হওয়া মাত্র অরবিন্দ সেন তিন-তিনটি চাকরী পেয়ে পুরস্কৃত হলেন, অন্যদিকে মনীশ সিনহা একটিও সংগ্রহ করতে পারলেন না। ভাগ্যের কি পরিহাস, যে একটি চাকরীতে মনীশ সিনহা নিজ গুণে, নিজ যোগ্যতায় নির্বাচিত হলেন, সেইটিও গ্রাস করলেন অরবিন্দ সেন। এ কিসের সঙ্কেত? কি ছবি ফুটে উঠছে এই মর্মান্তিক ঘটনার মধ্য থেকে? আজ আমাদের দেশে দুর্নীতি, নৈতিক অবনতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। আজ আমাদের চারপাশে অরবিন্দ সেনের মত মানুষেরাই সফল, কৃতকার্য, ভাগ্যবান। আর মনীশ সিনহার মত সৎ, বিবেকবান মানুষেরা বঞ্চিত, পরাজিত এবং অবশেষে অপরাধী।—চরম দুঃখের কথা, আতঙ্কের কথা, এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন দেশের তথাকথিত কিছু জন নেতা। যারা নিজেদের নীতিবান, কর্তব্যপরায়ণ, দেশ হিতৈষী বলে জাহির করেন।—মহামান্য বিচারপতি, এই ঘটনায় এখন সুস্পষ্ট যে আমাদের দেশের কিছু উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তি, কিছু জন-প্রতিনিধি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তায় এমন কিছু কাজ প্রায়শই করে থাকেন এবং এমন কিছু অন্যায় সুযোগ সুবিধে গ্রহণ ও ভোগ করে থাকেন যা শুধু দেশের আইন-বিরুদ্ধ নয় মানবিকতারও পরিপন্থী। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা, প্রতিপত্তির প্রভাব এমন যে এই সব দুষ্কর্ম তাঁরা করেন, অতি চতুরতার সঙ্গে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণাদি না রেখে। আইনের আওতায় বে-আইনী কাজ-কর্ম করার প্রবণতা এই সব মহানুভব ব্যক্তিদের নিত্য কর্ম পদ্ধতির মধ্যে চলে আসছে। তাই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে এঁদের বিচার হয় না, বিচার হয় মনীশ সিন্‌হার মত সৎ বিবেকবান যুবকদের যাঁরা তাঁদের সামাজিক অপরাধের বলি, তাঁদের সৃষ্ট পরিস্থিতির শিকার।

মহামান্য বিচারপতি, আমি আর বেশী কিছু না বলে এই কেসের দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের এখানেই ইতি করতে চাই। অবশেষে, আদালতের কাছে আমার কয়েকটা প্রশ্ন—মনীশ সিন্‌হা যেভাবে তাঁর ন্যায্য সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, সেটা কি সামাজিক বিধির লঙ্ঘন নয়? আমাদের সমাজে মানবিক বিধি আর সামাজিক বিধি কি হাত ধরাধরি করে চলে? আমাদের দেশেই কি এমন দৃষ্টান্ত নেই, যেখানে মনুষ্যত্বের বিধানকে রক্ষা করতে সামাজিক আইনকে অমান্য করা হয়েছে? যদিও আইন অমান্যকারী সেদিনও মনে করেছেন, প্রচলিত দণ্ডনীতি তিনি মাথা নীচু করে মেনে নিতে প্রস্তুত। মি লর্ড, আমায় ভুল বুঝবেন না, আমার শুধু বক্তব্য, বিচার কি একটু থমকে দাঁড়িয়ে ভাববে না যে মানুষ বিনম্রভাবে কখনো আইনেরও ওপরে উঠতে পারে? অতএব আমার শুধু এইটুকু আবেদন, মনীশ সিন্‌হার অপরাধের ইতিবৃত্ত, পরিস্থিতি, মনীশ সিন্‌হার অতীত কাহিনী, তাঁর চরিত্র, প্রকৃত মানসিকতার বিচার করে তাকে যেন ভারতীয় দণ্ডবিধির চারশো ষোলো ধারা অনুযায়ী ন্যূনতম শাস্তি প্রদান করা হয়।—ধন্যবাদ

ইন্দ্রনাথবাবুর শেষ বক্তব্যে সারা বিচার কক্ষ যেন কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে মনীশের প্রতি সামাজিক অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মৌনতা পালন করল।

মহামান্য বিচারক আজকের মত আদালত মুলতুবি করলেন।

তার তিনদিন পর পরিপূর্ণ এজলাসে রায় দিলেন বিচারক দেবেন্দ্রলাল চৌহান। তাঁর রায়ের সংক্ষিপ্তসার হল—

—'অভিযুক্ত আসামী মনীশ সিন্হার স্বীকারোক্তি. এই সংক্রান্ত আদালতে পেশ করা অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ ও এই পরিপ্রেক্ষিতে এ যাবৎ আমার সম্মুখে উপস্থিত করা বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণাদি বিচার ও বিশ্লেষণ করে আমার ধারণা যে অভিযুক্ত মনীশ সিন্হা অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সাংসারিক চাপের সম্মুখীন হয়ে পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। তবে খুবই দুঃখের কথা, এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সোয়াব ইণ্ডিয়ায় সেই একই চাকরীতে তার নির্বাচন বাতিল হওয়ার দরুণ. ভাগ্যের পরিহাসে কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে যে চাকরী তিনি মিথ্যে পরিচয় দিয়ে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে ছিলেন। এই নির্বাচন বাতিল হওয়ার পশ্চাত কাহিনী অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এই কেস পরিচালনা করতে গিয়ে আমি লক্ষ করছি, আজ নিরপেক্ষতা. ন্যায়, সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র প্রভৃতি শ্লোগান কিছু লোকের বক্তৃতা-ভাষণেরই শুধু শোভা বৃদ্ধি করে। প্রকৃত জীবনে তার কোনো প্রতিফলন নেই। আরো দুঃখের কথা, যারা এই সব ন্যায় নীতির বাণী বিভিন্ন প্রবন্ধে, বক্তৃতায় প্রচার করেন তাঁরাই নিজেদের স্বার্থের সময় দুর্নীতির আশ্রয় নেন। আইনের রক্ষক, জনগণের প্রতিনিধি, উচ্চ পদাধিকারী দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যদি এই ভাবে দুর্নীতি-পরায়ণ হন তাহলে সত্যি তা এই দেশ, এই সমাজের পক্ষে সমূহ বিপদের সংকেত বহন করে। আমাদের সংবিধানে লেখা আছে, আমাদের সমাজ হবে জনগণের স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। কিন্তু আমার মনে হয় প্রকৃত অবস্থায় আমরা কিছু মুষ্টিময় মানুষ জনগণের নামে জনগণের দৌলতে, জনগণের স্বার্থের অজুহাতে শুধু নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে চলেছি। এই কেসের অভিযুক্ত আসামী মনীশ সিনহা সেই বিশেষ ক্ষমতাশালী গোষ্ঠির স্বার্থ সিদ্ধি, স্বজনপোষণ নীতির শিকার। মনীশ সিনহার মত এমন শত শত আরো কত নিরীহ জীবন যে এই নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর দুর্নীতির বলি হচ্ছে তার কোনো হিসেব নেই। সবচেয়ে আতঙ্কের কথা, এই দুর্নীতি আজ আমাদের মূল্যবোধ, মানবতাকেও কোণঠাসা করে দিচ্ছে। এর কবলে পড়ে আমরা হারিয়ে ফেলছি পরস্পরের প্রতি সমবেদনা, সহানুভূতি। এই নৈতিক অবনতিরই প্রোডাক্ট হচ্ছে অরবিন্দ সেন। তবে, এর মধ্যেও আশার আলো দেখিয়েছেন সোয়াব ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রী চক্রবর্তী. তামিয়া কারখানার শ্রমিকবৃন্দ, শিমলার ডক্টর মোহন তামিয়ার ডক্টর ভাটনাগর, শ্রী রাজেশ সাহানী ও শ্রীমতী সঙ্গীতা সাহানী। শ্রী চক্রবর্তী একজন প্রভাবশালী উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তি হয়েও চাপে পড়ে যে ভুল করেছেন—মূল্যবোধ, সমবেদনার তাগিদে সেই ভুল শোধরাতে মনীশ সিন্হার বিরুদ্ধে কেস প্রত্যাহার করে আজ এসে দাঁড়িয়েছেন তার পাশে। এ এক নজিরবিহীন

ঘটনা। তেমনি তামিয়া কারখানার শ্রমিকেরা মনীশ সিনহাকে নামে নয়, প্রকৃত মানুষ রূপে চিনতে পেরে তাকে নিজেদের মধ্যে আঁকড়ে রাখার যে লড়াই করেছেন, আমি মনে করি তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার অদম্য প্রয়াস। এই মানসিকতা থেকেই ডক্টর মোহন ও ডক্টর ভাটনাগর আজকের নৈতিক অবনতির শিকার গুড়িয়া শর্মাকে দীর্ঘ দু'বছর ধরে অত্যান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, ধৈর্য্যের সঙ্গে শ্রী রাজেশ সাহানী ও শ্রীমতী সঙ্গীতা সাহানীর সাহায্যে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলেছেন। আমি আশা করব, এইভাবে সমাজের প্রতি স্তর থেকে সৎ বিবেকবান মানুষেরা আজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের মূল্যবোধ ও মানবতা রক্ষার্থে আরো বেশী করে এগিয়ে আসবেন। তা নাহলে দুর্নীতির যে ক্ষত আজ আমাদের সমাজে সৃষ্টি হয়েছে তা একদিন গ্যাংগ্রিন হয়ে আমাদের সম্পূর্ণ জাতিকে, রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবে। আমি বিচারকের আসনে বসেও মনে করি, ডক্টর মোহন, ডক্টর ভাটনাগর, শ্রীরাজেশ সাহানী, শ্রীমতী সঙ্গীতা সাহানী ও শ্রী মনীশ সিন্‌হা তাদের একত্র প্রচেষ্টায় যে ভাবে গুড়িয়া শর্মার মনের ক্ষত নির্মূল করেছেন, সেভাবেই আমাদের সমাজকে, রাষ্ট্রকে সুস্থ করতে হবে, নিরোগ করতে হবে দুর্নীতি, নৈতিক অবনতির ভয়ংকর সন্ত্রাস থেকে।'

বিচারক চৌহান বিরতি নিয়ে এবার তাকালেন নিস্তব্ধ, নিথর পরিপূর্ণ এজলাসের দিকে। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রুমালে মুখ মুছে তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'কিন্তু...এতদসত্বেও বিচারালয়ের চার দেয়ালের মাঝে বসে আমি মনীশ সিন্‌হার প্রতি সদয় হতে পারিনা। কারণ ভাগ্যের পরিহাসেই হোক, অবস্থার চাপে পড়েই হোক আইনের চোখে তিনি অপরাধী। সব বিচার ও বিশ্লেষণ করে আমি ভারতীয় দণ্ডবিধির চারশো ষোল ধারায় অভিযুক্ত মনীশ সিনহার ওপর তাঁর অরবিন্দ সেন রূপে সোয়াব ইণ্ডিয়া থেকে গ্রহণ করা ছ'মাসের বেতন দশ হাজার আটশ টাকা জরিমানা হিসাবে ধার্য্য করলাম। এই জরিমানা অনাদায়ে তিনি ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করবেন। জরিমানার টাকা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে জমা দিতে হবে। এবং আমার নির্দেশ অনুযায়ী এই টাকা জমা পড়া মাত্র তাকে পুলিশ হাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।'

রায়দান শেষ হওয়া মাত্র সারা এজলাস যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল। উত্তেজিত গুড়িয়া ও লীলা জড়িয়ে ধরল পরস্পরকে। ডক্টর ভাটনাগর, রাজেশ, সঙ্গীতা নিশ্চিন্তর হাসি নিয়ে প্রবীরের সঙ্গে এগিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ হালদারের সাথে করমর্দন করতে।

ওদিকে সোয়াব ইণ্ডিয়ার একজন প্রতিনিধি দ্রুত পায়ে মিরচান্দানি সাহেবের কাছে এসে দশ হাজার আটশ টাকার চেকটি প্রদান করলেন আদালতে জমা দেবার উদ্দেশ্যে।

মনীশ ধীরপায়ে বেরিয়ে এল কাঠগড়া থেকে।

কলকাতা। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গাইনি ডিপার্টমেন্ট।

সাদা ড্রেস পরা স্থূলদেহী মাঝবয়সী নার্স ভদ্রমহিলা গটগট করে ভেতর থেকে

বেরিয়ে বারান্দায় এলেন। হাঁক দিলেন সজোরে—'গায়ত্রী সিনহাকে কে নিতে এসেছেন ?'

সামনের বেঞ্চ থেকে উঠে এগিয়ে এল ওরা। গুড়িয়া ও মনীশ আর লীলা ও প্রবীর।

নার্স ভদ্রমহিলা চারজনকে দেখে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন। মনীশকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে অনেকদিন পর দেখছি !—'

'হ্যাঁ, বাইরে ছিলাম।' মনীশ মৃদু হেসে বলল, 'দিদি, মা কেমন আছেন ?'

'এখন ভাল। ক'দিন আগে অবস্থা সত্যি খুব খারাপ হয়েছিল।' লীলার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ভেতরে যাও, নিয়ে এস মাকে।'

লীলা গুড়িয়াকে নিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকল।

মনীশ ও প্রবীর দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

কিছুক্ষণ পরেই গুড়িয়া ও লীলার কাঁধে হাত জড়িয়ে গায়ত্রী ওয়ার্ডের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

এগিয়ে গেল মনীশ। প্রবীর পেছনে।

দীর্ঘ আটমাস পর মনীশের সঙ্গে গায়ত্রীর দেখা। ছেলের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গায়ত্রী।

মনীশ কাছে গিয়ে বলল, 'মা—'

গায়ত্রীর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল।

অভিমানে কি ? মনীশ জীবনে কোনোদিন মাকে মিথ্যে বলেনি। শুধু এই একটিবার ছাড়া। চাকরী না পেয়েও চাকরী পাওয়ার কথা বলে সে এতদিন বাইরে ছিল। আজ মা'র কাছে কিছুই অজানা নেই।

মনীশের চোখ ছলছলিয়ে উঠল। মা'র সামনে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'মা তোমাকে মিথ্যে বলে তার জ্বালা আমি ছ'মাস কুরে কুরে ভোগ করেছি। তার শাস্তিও পেয়ে গেছি। এখন আমায় ক্ষমা করে দাও মা !'

লীলা ও গুড়িয়ার কাঁধ থেকে হাত ছাড়িয়ে গায়ত্রী ছেলেকে জড়িয়ে ধরল। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলল, 'জানি বাবা, তুই এই মিথ্যে তোর নিজের জন্য তো বলিসনি ! বলেছিলি আমার জন্য, লীলার জন্য। তোর ভাগ্য যদি তোকে দিয়ে এভাবে মিথ্যে বলায়, তুই কি করবি ?'

'মা ! চাকরীটা এবার আমি সত্যি পেয়ে গেছি। এই দ্যাখো—!' মনীশ পকেট থেকে সোয়াব কোম্পানীর নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা বার করে মেলে ধরল মা'র সামনে।

গায়ত্রী খুশীর দৃষ্টিতে দেখলেন। দামী কাগজের ওপর সুন্দর অক্ষরে মনীশের নাম ছাপা।

মনীশ বলল, 'মা, কুড়ি তারিখ থেকে জয়েনিং—'

'কুড়ি তারিখ !' গায়ত্রী ভুরু কুঁচকে তাকাল, 'সে তো চারদিন পরেই—'

'হ্যাঁ মা। আমাকে জয়েন করতেই হবে। তা না হলে তামিয়ার কারখানা খুলবে না। ওরা অপেক্ষা করছে আমার জন্য—'

গুড়িয়া গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওরা সবার জন্য অপেক্ষা করছে মা। তোমার জন্য, লীলার জন্যেও।'

গায়ত্রী গুড়িয়াকে চেনে না। তাই ওর মা ডাকে অপ্রস্তুত বোধ করল।

মনীশ বলল, 'হ্যাঁ মা, এবার আমরা সবাই এক সঙ্গে যাব।'

'সত্যি!' লীলা বলেই প্রবীরের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে নত করে নিল ওর মুখ।

গুড়িয়া লীলার কাছে গিয়ে ওর চিবুক ধরে নিজের চোখের দিকে তুলে বলল, 'মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই, প্রবীর ভাইয়াও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে।'

'আমি!—কেন?' প্রবীর হতবাক।

'সব কেনর উত্তর হয় না প্রবীর ভাইয়া, তবে তুমি আপাতত যাচ্ছ। কলকাতায় কিছু যখন হচ্ছে না তোমার। ওখানে গিয়ে চেষ্টা করবে। নতুন জায়গায় নতুন করে। এখন তোমাকে আমরা ছাড়ছি না।'

মনীশ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, 'ঠিক বলেছে গুড়িয়া—'

গায়ত্রী এতক্ষণ শুধু গুড়িয়ার দিকেই তাকিয়ে ছিল। গুড়িয়ার হাসি, গুড়িয়ার কথা বলার ভঙ্গী গুড়িয়ার ছেলেমানুষী ভাব লক্ষ করছিল তৃপ্তির দৃষ্টিতে। ঘুরে বলল, 'মনীশ, ওর নাম গুড়িয়া? কই, আমার সঙ্গে তো ওর পরিচয় করিয়ে দিলি না?'

মনীশ আচমকা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কাসতে কাসতে বলল, 'ইয়ে—'

'থাক থাক, তোকে আর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না।' গায়ত্রী গুড়িয়াকে দু'হাতে জড়িয়ে নিজের কাছে টেনে বলল, 'ও আমার জন্মে জন্মের পরিচিত। দেখা হতেই কেমন আপন করে নিয়েছে!'

গায়ত্রীর চোখে-মুখে ফুটে উঠল নতুন এক খুশীর আভাস। যেন সামনে সে দেখতে পাচ্ছে অপূর্ব এক আলোকোজ্জ্বল পথ। গুড়িয়া ও লীলাকে জড়িয়ে এগোলো সেই পথের দিকে। পেছন পেছন এগিয়ে চলল মনীশ ও প্রবীর।